জীবন এক কাহিনি

কিন্নর রায়

এ ১২৫, কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা-৭০০০০৭

প্রথম প্রকাশ · জানুয়ারি ১৯৫৯
প্রজ্ঞা প্রকাশনের পক্ষে অরূপ চট্টোপাধ্যায়, শৈবাল সরকার ও অতনু পাল কর্তৃক এ-১২৫ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা-৭০০০০৭ থেকে প্রকাশিত ও নিউ রামকৃষ্ণ প্রেস, ৬৩এ/২ হরি ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত।

অধ্যাপিকা শ্রীমতী মনাবী মিত্র

কল্যাণীযাসু

সূচিপত্র

সুখের সংসারে আগুন।

ব্যাপারটা প্রায় তেমনি ঘটল। লম্বা গোছের একটা খামের চিঠি। সেও হাতে লেখা কোনো পত্র নয়। লেফাফার ভেতর রংচঙে সুন্দব একটি কার্ড। তাতে ইংরোজি নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়েছে প্রেরক। শুধু কার্ডের এক কোনে ছোট্ট তিনটি অক্ষর,—কালির আঁচড়ে লেখা। সুমন।

লেটাব বক্সের ভেতর থেকে সুব্রতই চিঠিটা বের করে এনেছিল। সাদা খামের ওপর কালো টাইপে তার স্ত্রীর নাম। সুতপা সান্যাল। নীচে ঠিকানা। বাড়ির লোকের চিঠি হলেও যাকে সেটি লেখা হয়েছে সে ভিন্ন অন্য কেউ লেফাফা খুলে ভেতরে কী রয়েছে তা জানবার চেষ্টা করবে, সুব্রত সেটা আদৌ পছন্দ করে না। আর সেজন্যই খামের মুখ ছিঁড়ে ভেতরের লেখাটা বের করে আনার চেষ্টা সে করেনি। খাবার টেবিলের এক কোনে বন্ধ লেফাফাটা সন্তর্পণে রেখে সে শুধু উচ্চকণ্ঠে স্ত্রীর উদ্দেশে জানাল, 'ওগো, তোমার একটা চিঠি এসেছে।'

সুতপা অফিসে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিল। ব্যাংকের চাকরি। কাঁটায় কাঁটায় দশটায় না পৌঁছলে গ্রাহক-পরিসেবা বিঘ্নিত হয়। অথচ কাউন্টারে চেক রিসিভ করবার দায়িত্ব তার। এ ছাড়া অ্যাকাউন্ট বুকগুলি আপডেটিং করবার কাজও ম্যানেজার তার ওপর চাপিয়েছে। অফিসে ঢুকতে বড় জোর পাঁচ মিনিট দেরি গ্রাহকেরা সহ্য করে। তার বেশি হলেই কাউন্টারের সামনে অপেক্ষমাণ গ্রাহকেরা শুরুতে গুঞ্জন, তারপর হই-চই চ্যাঁচামেচি শুরু করে দেয়।

সে তুলনায় সুব্রতর কাজটা হাল্কা না হলেও দৌড়ঝাঁপ কম। নেই বললেও চলে। সাউথ ক্যালকাটায় একটা বেসরকারি কলেজে বাংলার অধ্যাপক সুব্রত। বয়স প্রায় আটত্রিশ হতে চলল। কলেজের ক্লাস ছাড়াও একটা কোচিং সেন্টারে বাংলা পড়ায় সে। সপ্তাহে দু'দিন এই নিয়ে ব্যস্ত থাকে। বাকি পাঁচটা দিন মোটামুটি তার নিজস্ব, একান্ত আপনও বলা চলে। ইদানীং অবশ্য কলেজে হাজিরা নিয়ে নানারকম কড়াকড়ি শুরু হয়েছে। এগারোটায় কলেজে পৌঁছে ক্লাস থাকলে সোজা লেকচার রুমে ঢুকে পড়তে হয়। আর অফ-পিরিয়ডে কমন রুমে বসে ছাত্রদের টিউটোরিয়াল ক্লাসের খাতা দেখা। নইলে বই নিয়ে পড়াশুনো। আজকাল আবার ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপকদের জন্য একটা রিফ্রেসারস কোর্স চালু হয়েছে। সেখানে হাজিরা মানে কলেজে পড়া ছাত্রদের মতো সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হয়। তবু সুতপার মতো অফিসের কাজ তার ঘাড়ে চেপে বসেনি। বেচারি সুতপা। নাকে-মুখে ভাত গুঁজে সেই যে বাসস্টপে গিয়ে দাঁড়ায়, ছ'টার আগে কোনোদিন বাড়ি ফিরেছে

বলে তার মনে হয় না।

চিঠিখানা খুলে পড়ার সময় ছিল না বলেই সুতপা সেটা ব্যাগে ভরে অফিসে নিয়ে গিয়েছিল। টিফিনের সময় খামের মুখটা ছিঁড়ে সে কার্ডখানা বের করল। ভারি সুন্দর গ্রিটিংস কার্ড। ওপরের দিকে খানিকটা সবুজ আর নীচের দিকটা হলুদ। ইংরেজিতে সোনালি অক্ষরে ছাপা ক'টি কথা,—টু এ বিলাভেড্। গুড্ উইশেস ফর এ হ্যাপি নিউ ইয়ার। তার নীচে তিনটি অক্ষর—সুমন।

গ্রিটিংস কার্ডটায় চোখ বুলিয়ে সুতপা শুধু আশ্চর্য হয়নি, রীতিমতো হতবাক। সুদীর্ঘ পাঁচ বছর বাদে এমন একটা চিঠির জন্য সে আদৌ প্রস্তুত ছিল না। সুমন যে তাকে আবার কোনোদিন চিঠি লিখবে, গ্রিটিংস কার্ড পাঠাবে এটাই তার চিন্তায় আসেনি। শেষ পর্যন্ত বাস্তবে তাই ঘটেছে। কিন্তু সুমন হঠাৎ তাকে গ্রিটিংস কার্ড পাঠাতে গেল কেন? পাঁচ বছর আগেই তো তার সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকেবুকে গেছে। ছি-ছি! সুতপাকে কার্ডটা পোস্ট করবার সময় তার হাত কাঁপেনি? লজ্জায় মাথা হেঁট হয়নি? এমন একটা বিশ্রী কেলেঙ্কারিতে সে জড়িয়ে পড়ছিল। আর কয়েকটা দিন দেরি হলেই নাকি সর্বনাশের আর কিছু বাকি থাকত না।

ঘটনাটা পাঁচ বছর আগের হলেও এর সূত্রপাত তারও কিছুদিন আগে। ভাবলে সুতপার এখন অবাক লাগে। একদিন এই মানুষটার প্রেমে সে রীতিমতো অস্থির, হাবুডুবু খেয়েছে। সুমনের সঙ্গে তার আলাপ হয়েছিল এক বন্ধুর বিয়েবাড়ি থেকে ফেরার সময়। সঙ্গে আর কেউ ছিল না। তাই নিমন্ত্রণ রক্ষা করেই সুতপা তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবে বলে স্থির করে নিয়েছিল। তবু বিয়েবাড়িতে গিয়ে নিজের ইচ্ছেমতো কি সব কিছু হয়? উৎসবের বাড়ি বলে কথা। শেষ পর্যন্ত বাড়ি ফেরার জন্য যখন সে বেরিয়ে এল তখন ঘড়ির কাঁটায় দশটা বাজে।

খাওয়া সেরে বিয়ে বাড়ি থেকে তার মতো আরও অনেকে বেরিয়ে এসেছে। হঠাৎ সুতপা লক্ষ্য করল তার ঠিক পিছনেই এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে। তাকে বাসের জন্য অপেক্ষা করতে দেখে, স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বলল, 'আপনি কোন দিকে যাবেন?'

সুতপা একটু অবাক হয়েছিল। চেনা নেই, জানা নেই। হঠাৎ এক ভদ্রলোক তার গন্তব্যস্থলের খোঁজ নেবে এটা কেমন যেন লাগল তার। কিন্তু ব্যাপারটা তখুনি কেমন সহজ হয়ে গিয়েছিল। কী প্রয়োজনে তার সেই বন্ধুর এক ভাই হঠাৎ বিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে তাকে দেখে বলল, 'সুতপাদি, আপনি নিশ্চয় বাসের জন্য দাঁড়িয়ে? কিন্তু তার প্রয়োজন নেই, এই তো সুমনদা গোলপার্কে যাবেন। সুরেন ঠাকুর রোডের মুখে আপনাকে নামিয়ে দিতে ওঁর নিশ্চয় কোনো অসুবিধে হবে না।'

সুমন মানে সেই ভদ্রলোক বলল, 'উনি বাসের জন্য দাঁড়িয়ে আছেন দেখেই তো আমি জিগ্যেস করেছি। আপনি যাবেন কোথায়?' তারপর সে হেসে যোগ করল, 'ভালোই হল। সমস্ত রাস্তাটা মুখ বুজে যেতে হবে না।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও সুতপাকে গাড়িতে উঠতে হল। ড্রাইভার নেই দেখেই সে বুঝল, ভদ্রলোক সেলফ্ ড্রাইভ করেন। অর্থাৎ গাড়িতে তারা দুজন। একা-একা বিয়ে

বাড়িতে এসে তাকে যে এমন একটা পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে সুতপা তা চিন্তা করতে পারেনি।

সূর্য সেন স্ট্রিট থেকে গড়িয়াহাট অনেকখানি পথ। তবু রাত্তিরে পথঘাট ফাঁকা। গাড়ি শেয়ালদা ছেড়ে মৌলালির কাছে চলে এল। অ্যাকসিলেটরে চাপ দিয়ে সুমন শুধোল, 'আপনিও কি অণিমার মতো স্কুলের টিচার?'

যার বিয়েতে সুতপা নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসেছিল তার নামই অণিমা। সুতপার বন্ধু। এক সময় কলেজের সহপাঠী। এখন নিউ অ্যাকাডেমি গার্লস স্কুলের টিচার। কিন্তু সুমন তাকেও যে মাস্টারনী ধরে নিয়েছে সেটাও কোনো ভুল হয়নি। অণিমা যখন তার বন্ধু তখন সেও হয়তো স্কুলে টিচারি করে।

সলজ্জ হেসে সুতপা জবাব দিল, 'আমি স্কুলে পড়াই না। ব্যাংকে কাজ করি।'

'ও তাই নাকি?' হর্ন দিয়ে দু-চারজন ব্যস্ত পথচারীকে সতর্ক করে সে শুধোল, 'কোন ব্যাংক? আর অফিসটা কোথায়?'

সুতপা হেসে জানাল, 'এটা ইউকো ব্যাঙ্ক। তবে কোন ব্রাঞ্চে আছি সেটা জেনে আপনার কী লাভ?'

সুমন দার্শনিকের মতো বলল, 'সব প্রশ্নই কি লাভ-লোকসানের চিন্তা করে মাথায় আসে? ধরুন এটা নিছক কৌতূহল।'

নিছক কৌতূহল শুনে সুতপা আর কথা বাড়াল না। ঈষৎ হেসে বলল, 'আমি আছি ইউকো ব্যাংকের পার্ক স্ট্রিট ব্রাঞ্চে।'

'তাই নাকি?' সুমন সহর্ষে উত্তর দিল, 'ওটা তো আমার অফিসের খুব কাছে।'

'আপনার অফিস?' সুতপা জিজ্ঞাসু হল।

'লিটল রাসেল স্ট্রিটে। কেনউড কনস্ট্রাকশনস প্রাইভেট লিমিটেড।'

'আপনি বুঝি কনস্ট্রাকশনসের কাজে আছেন?'

'হ্যাঁ। সিভিল ইঞ্জিনিয়র কিনা। বাড়ি বানাই, রাস্তা তৈরি করি আবার নদীর ওপর ব্রিজ তৈরি করতে হলেও আমাদের ডাক পড়ে।'

সুরেন ঠাকুর রোড কখন এসে পড়েছে সুতপা খেয়াল করেনি। ব্রেকে পা রেখে গাড়িটা থামাতেই সে বুঝতে পারল এবার নামতে হবে।

ড্রাইভারের আসন থেকে নেমে সুমন পিছনের দরজাটা খুলে দিল। বলল, 'আসি তাহলে। আবার হয়তো কোনো বিয়ে বাড়িতে গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা হতে পারে।'

'হ্যাঁ।' সুতপা মজা করে বলল, 'দেখা হলে তো ভালোই হয় বাড়ি ফেরার সময় আবার লিফট দেবেন।'

সুমন বলল, 'আর যদি তার আগেই আবার কোথাও দেখা হয়ে যায়?'

সুতপা হাসতে হাসতে বলল, 'তাহলে অবশ্য আর লিফট দিতে পারবেন না। কিন্তু—'

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সুমন জানাল, 'কিন্তু তখন শুধু কথা হবে।'

তা সেই কথার জন্যই হয়তো সুমন একদিন ব্যাংকের দরজায় এসে উপস্থিত হল। বেলা প্রায় দুটো। কাউন্টার বন্ধ করে সুতপা টিফিন করবার কথা ভাবছিল। হঠাৎ কোলাপসিবল গেটের দরজা পেরিয়ে সুমনকে ঢুকতে দেখে সে অবাক। কে জানে হয়তো বা ব্যাংকে কোনো কাজেকর্মে এসেছে।

কিন্তু কাজটা যে শুধু তারই সঙ্গে সেটা বুঝতে সুতপার একটুও দেরি হল না। তার সামনে এসে সুমন মিষ্টি হেসে শুধোল, 'কি? চিনতে পারছেন না?'

'চিনতে পারব না কেন?' সুতপা ঢোঁক গিলে জিভটাকে সচল করে নিয়ে বলল, 'ভাবলাম, এই ব্যাংকে বুঝি কোনো দরকারে—'

'দরকার তো আপনার সঙ্গে।' সুমন আরও স্পষ্ট হল। বলল, 'আপনি তো নিজেই জানিয়েছেন। কোনো বিয়ে বাড়িতে হঠাৎ মিট করার আগে আবার যদি কোথাও দেখা হয় তাহলে শুধু কথা হবে।'

শেষ পর্যন্ত সেই কথা বলতেই ইউকো ব্যাংকের পার্কস্ট্রিট শাখায় সুমন প্রায়ই আসছিল। ব্যাপারটা অনেকেরই নজর এড়ায়নি। বিশেষ করে ব্যাংকের অন্য মেয়েদের। সুমন এলেই একটা গুঞ্জন শুরু হত। মেয়েদের ঠোঁটের ডগায় একটা চাপা হাসি। টিফিন আওয়ার্স হলে তারা ইচ্ছে করেই দূরে সরে গিয়ে নিজেদের মধ্যে জটলা করত।

অস্বস্তি কাটাতে সুতপা একদিন নিজেই বলল, 'মাঝে মাঝেই তো ব্যাংকে এসে আমার সঙ্গে দেখা করছ। মেয়েরা কিন্তু আড়ালে হাসাহাসি করে।'

সুমন জবাব দিল, 'তোমাকে তো কতদিন বলেছি ছুটির পর আমার সঙ্গে দেখা করো। দুজনে কোথাও বসে চা-টা খেয়ে গল্প করব। তারপর তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে পারি।'

'ধুর! তাই কখনও হয়? তাছাড়া মাঝে মাঝেই রাত্তির করে বাড়ি ফিরলে মা কী মনে করবে? ব্যাংকের ছুটি ক'টায় সে কথা বাড়িসুদ্ধ লোক জানে।'

'আর লুকোচুরি করে কোনো লাভ আছে? তোমাকে যখন বিয়ে করছি তখন এই নিয়ে এত দুর্ভাবনা কীসের?'

পাত্র হিসেবে সুমন অবশ্য ফেলনা ছিল না। সুপুরুষ, সুন্দর দেখতে। ইঞ্জিনিয়র। আঠারো হাজার টাকা নাকি মাইনে পায়। ভাগলপুরে বাড়ি। দেশে জমি-জিরেত আছে। বাবা নেই। বাড়িতে ওর মা আর এক ভাই থাকে।

একদিন টিফিন আওয়ার্সের একটু আগে সুমন তাকে টেলিফোন করল। বলল, 'টিফিনের পর বেরিয়ে আসতে পারবে?'

'কোথায়?' সুতপা শুধোল।

'সেটা আমার ওপর ছেড়ে দাও।'

'কিন্তু ম্যানেজারকে কী বলব?'

'যা ইচ্ছে তোমার। পেটে ব্যথা কিংবা প্রচণ্ড মাথার যন্ত্রণা। হয়তো এখুনি ধুম জ্বর আসবে।'

সুতপা হেসে ফেলল। কিন্তু প্রস্তাবে রাজিও হল।

তার কথা শুনে প্রৌঢ় ম্যানেজার বায়সের মতো সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল শুধু। বলল, 'ঠিক আছে। একটা হাফ-ডে ছুটির দরখাস্ত দিয়ে যাবেন।'

পিটার ক্যাট রেস্তোরাঁর সামনে পার্কিং-এর জায়গায় সুমন তার জন্য অপেক্ষা করছিল। দেখা হতেই সুতপা বলল, 'আমি কিন্তু এরকম আর আসতে পারব না।'

'কী যে বলো! এই তো কলির সন্ধে। তবে হ্যাঁ, এরপর আর হাফ-ডে নয়। পুরো দিনটাই ব্যাংক থেকে ডুব দেবে।'

'বাঃ! ভারি মজা, তাই না? তোমার পাল্লায় পড়ে এইভাবে যদি ছুটি নিতে হয় তাহলে এরপর তো আমার উইদাউট পে হবে।'

সুমন মুচকি হাসল। কথার কোনো জবাবই দিল না। অনেকক্ষণ পরে বলল, 'আজকের প্রোগ্রাম তোমাকে জানিয়ে রাখি। পিটার ক্যাটে লাঞ্চ। তারপর বিকেল চারটেয় আইনক্সে সিনেমা।'

সুতপা বলল, 'কিন্তু আমি তো খেয়ে বেরিয়েছি।'

'ও কিছু নয়। কখন হজম হয়ে গেছে।'

'লাঞ্চ তারপর সিনেমা।' সুতপা বিড়বিড় করল। বলল, 'তাহলে আমি বাড়ি ফিরব কখন?'

'এই ধরো সাতটা নাগাদ।'

'ছটার মধ্যে বাড়ি না ফিরলে মা কিন্তু খুব চিন্তা করবে।'

'ঠিক আছে।' সুমন অনায়াসে বলল, 'পিটার ক্যাট থেকে ওঠার সময় মাকে একটা টেলিফোন করে দিও।'

তার হাতের মোবাইলটা তুলে বলল, 'এটা থেকে।'

'কিন্তু কী বলব?'

'বলবে ব্যাংকে এক ঘণ্টা ওভারটাইম হচ্ছে। ফিরতে একটু দেরি হবে।'

'আমাদের ব্যাংকে ওভারটাইম নেই। মানে আগে কোনোদিন হয়নি।'

'তাহলে বানিয়ে বানিয়ে যাহোক কিছু বলে দিও।'

পিটার ক্যাট থেকে সোজা আইনক্স। বইটা ছোট বলেই সাড়ে ছটার মধ্যে শো ভাঙল। সুমন বলল, 'তোমাকে বাড়ির দরজায় ড্রপ করব তো?'

'পাগল!' সুতপা আঁতকে উঠল। বলল, 'পাশের বাড়ির বৌদি, পাড়াসুদ্ধ লোক দেখতে পাবে না? আমি গাড়ি থেকে নামছি আর তুমি হাত নেড়ে আমাকে গুডনাইট বলছ।'

অগত্যা সুতপাকে রাস্তার মোড়ে ছেড়ে দিতে হল। সুমন বলল, 'নির্ভাবনায় চলে যাও। এখানে তোমাকে কেউ দেখতে পায়নি।'

দিন সাত না যেতেই ফের সুমনের ফোন। বলল, 'আজ একটা অজুহাত দেখিয়ে কেটে পড়তে পারো না?'

সুতপা গম্ভীর গলায় জানাল, 'তুমি কিন্তু একটু বাড়াবাড়ি করছ। এই তো ক'দিন আগেই গেলাম তোমার সঙ্গে। আবার সাত দিন না যেতেই ম্যানেজারকে কী বলে ছুটি চাইব?'

সুমন অনুনয় করল, 'প্লিজ। এই শেষবার। এরপর আর তোমাকে ব্যাংক থেকে কেটে পড়তে বলছি না।'

'প্রমিস করছ?' সুতপা ছদ্ম গাম্ভীর্যের সঙ্গে কথা কইল।

'ও ইয়েস। প্রমিস।'

'তাহলে দশ মিনিট বাদে আমাকে আর একবার টেলিফোন কোরো।' সুতপা প্রায় ফিসফিস করল।

যথারীতি দশ মিনিট বাদেই ফোন! রিসিভার ধরে সুতপা মুখখানা করুণ করে বলল, 'কখন শরীর খারাপ হল মায়ের? বারোটার পর? ডাক্তারকে কল দিয়েছিলে? সাবধানে রেখো। নার্সিংহোমে ট্রান্সফার করতে বলেছে বুঝি? তাহলে আর দেরি করা উচিত হবে না। ঠিক আছে আমি এক্ষুনি আসছি।'

ব্যাংকের দু-একজন মহিলা সহকর্মী তাকে বোঝাল, 'চিন্তার কারণ নেই। হয়তো সিরিয়াস কিছু নয়। বয়স হয়েছে। তাই হঠাৎ এমন শরীর খারাপ হতেই পারে।'

কাছে যেতেই ম্যানেজার বলল, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ। আপনি বাড়ি চলে যান। আপনার মা কেমন আছেন আগামী কাল শুনব।'

সেদিনকার মতো পিটার ক্যাটের সামনে দাঁড়িয়েছিল সুমন। দেখা হতেই সুতপা বলল, 'ছি-ছি! এমন একটা কাণ্ড করে আজ আসতে হল। এরপর মায়ের শরীর কেমন রইল কতদিন ধরে যে তার ফিরিস্তি দিতে হবে তা একমাত্র ঈশ্বর জানেন।'

'আজ কিন্তু পিটার ক্যাটে লাঞ্চ নয়।' সুমন রহস্য করে তাকাল।

'তবে? কোথায়?'

'একটা বিউটিফুল রেসর্টে।'

'রেসর্টে? সে কতদূর?'

'কাছেই। ভারি বিউটিফুল আর চার্মিং। দেখলেই পছন্দ হবে।'

টানা পঁয়তাল্লিশ মিনিট ড্রাইভের পর গাড়ি এসে রেসর্টের দরজায় থামল। 'হলিডে ফর অল' না কী যেন নাম রেসর্টটার। সুমন মিথ্যে বলেনি। সত্যি, সবুজ গাছগাছালিতে ঢাকা সুন্দর একটা স্পট। বেশ বাহারি গেট। একটা ফুলন্ত লতা গেটের মাথায় তার শাখাপ্রশাখা ছড়িয়ে দিয়েছে। দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন রমণীর গলায় এক সুদৃশ্য অলঙ্কার শোভা পাচ্ছে। গেট পেরোবার জন্য কুড়ি টাকা দক্ষিণা লাগল। ভেতরে চমৎকার ছোট ছোট কটেজ। মাঝখানে একটা চতুর্ভুজ আকৃতির ট্যাংক। বড় বড় পদ্মপাতা জলে। চারপাশে গাছ। পাখি ডাকছে। ঘন সন্নিবদ্ধ গাছের পত্রসজ্জার ফাঁকে হালকা রোদ্দুর।

রিসেপশনে ঢুকে একটা খাতায় সম্ভবত নাম-ঠিকানা লিখল সুমন। ম্যানেজার

একজন বেয়ারাকে ডেকে নির্দেশ দিতেই সে চাবি নিয়ে তাদের দুজনকে একটা কটেজের সামনে নিয়ে এল। দরজা খুলে দিয়ে শুধোল, 'আগে ঠান্ডা দিই? তারপর লাঞ্চ করবেন তো?'

'হ্যাঁ। সেই সঙ্গে একটা বিয়ার।' সুমন কাঁধ ঝাঁকিয়ে একটা বিলিতি ঢঙ করল। শুধোল, 'লাঞ্চ দিতে কত দেরি হবে?'

'বেশি না স্যার। ওনলি হাফ অ্যান আওয়ার।'

বেয়ারাটা বেরিয়ে যেতেই সুতপা রাগ করে বলল, 'এতদূরে আসবার কী দরকার ছিল? কাছেপিঠে কোনো রেস্তোরাঁয় গেলেই তো পারতে।'

'নাহ্।' সুমন চোখ নাচিয়ে রহস্য করল। বলল, 'কলকাতার রেস্তোরাঁয় বসে সব কিছু হয় নাকি?'

'তার মানে?' সুতপা ভুরু তুলে তাকাল।

সুমন আরও কাছে সরে এল তার। বলল, 'শোনো, একটা চুমু দেবে? প্লিজ—'

'না-না। এসব এখন নয়।' সুতপা বাধা দিল। বলল, 'তুমি বুঝি এই ধান্দায় আমাকে এতদূরে টেনে নিয়ে এসেছ।'

কিন্তু সুমন নাছোড়বান্দা। গলা জড়িয়ে ধরে তাকে চুম্বন করল। প্রথমে আলতো একবার, তারপর একটানা অনেকক্ষণ।

হঠাৎ সুতপাকে ছেড়ে দিয়ে সুমন বলল, 'আশ্চর্য! তুমি কী? এমন আড়ষ্ট হয়ে আছ কেন? আচ্ছা, দু'দিন বাদেই তো আমরা হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ, আই মিন বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হচ্ছি। তার আগে তোমাকে একটু আদর ইয়ে মানে চুমু খাওয়া কি নিতান্ত দোষের?'

ঠান্ডা পানীয়ের পর বেয়ারা লাঞ্চ সার্ভ করল।

চিকেন বিরিয়ানি, ফিশ ফ্রাই আর একটা কাশ্মীরি আলুর দম। সেই সঙ্গে এক বোতল বিয়ার। দুটো গ্লাসে ভাগাভাগি করে পানীয় ঢালল সে। বলল, 'কিছু দরকার হলে পুশবেল টিপে ডাকবেন।'

সুতপা বলল, 'এর আগে কিন্তু আমি কখনও মদ খাইনি।'

'এটা মদ নয়, বিয়ার। আর মদ হলেই বা কী যায় আসে? আরে হার্ড ড্রিংকস একটু-আধটু না খেলে পার্টিতে কিংবা তোমার বন্ধুদের কাছে মান থাকবে?'

সুমন বেয়ারাকে ডেকে আর এক বোতল বিয়ার নিল। খানিকটা পানীয় সুতপার গ্লাসে ঢেলে দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু সুতপা তার বিয়ার-গ্লাসটা সরিয়ে নিয়ে বলল, 'আমি আর খাব না। বড্ড তেতো।'

লাঞ্চ-পর্ব শেষ হতেই বেয়ারা এসে প্লেট, ডিশ, জলের গ্লাস, বিয়ারের বোতল, উচ্ছিষ্ট আহার্য সব তুলে নিয়ে গেল। সুমন উঠে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিল। তারপর ধবধবে চাদর পাতা বিছানায় গড়িয়ে পড়ল। শোবার আগে সুতপার কোমরটা পেঁচিয়ে ধরে তাকে শয্যায় অংশ নিতে আকর্ষণ করল।

সুমন কেন দরজায় ছিটকিনি তুলে দিল, সুতপা এতক্ষণে তার মতলবটা বুঝতে

পারল। আর এজন্যই তো তাকে কলকাতা থেকে এতদূরে নিয়ে এসেছে। সুতপা সামান্য বাধা দেবার চেষ্টা করল। কিন্তু ততক্ষণে সুমনং তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরেছে। তারপর ধীরে ধীরে সুমনের উষ্ণ আলিঙ্গনে সুতপার দেহটা এক অনাস্বাদিত আনন্দের স্পর্শসুখ পেতে শুরু করল। সম্পূর্ণ সায় না থাকলেও তাকে বাধা দেবার মতো সামান্যতম শক্তিও আর অবশিষ্ট ছিল না। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরের বাতাসটা অনেকক্ষণ ধরে উলটিপালটি মার খেল। শেষ পর্যন্ত বিছানা ছেড়ে সুমন যখন উঠে গেল তার আগেই সুতপা কুমারীত্ব হারিয়ে ফেলেছে।

ফেরার পথে সুতপা অনেকক্ষণ একটি কথাও বলেনি। এক সময় সুমন জিগ্যেস করল, 'কী ব্যাপার? মনে হচ্ছে খুব রাগ করেছ।'

সুতপা বলল, 'রাগ করব কেন? তবে—'

'তবে কী?'

'ভাবছি বিয়ের পর যা হয় সেটা তুমি আজই আদায় করে নিলে।' তার কণ্ঠস্বরে যেন প্রচ্ছন্ন খোঁচা ছিল।

'না মানে—' আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য কী বলবে সুমন তাই ভাবছিল।

সুতপা বলল, 'আমার মনে হয় এবার মায়ের সঙ্গে তোমার দেখা করা উচিত।'

'ও হ্যাঁ। তা তো নিশ্চয়। তবে একটা কথা ভাবছিলাম।'

'কী কথা?'

'কোম্পানি বলছিল আমাকে দুবাই পাঠাতে পারে।'

'দুবাই?' সুতপা ভুরু তুলে তাকাল।

'হ্যাঁ।' সুমন সহাস্যে জানাল। 'দুবাইয়ে আমাদের কোম্পানি একটা বড়সড় কন্ট্র্যাক্ট পেয়েছে। শুনেছি কলকাতা থেকে আমি ছাড়া আরও দুজনের নাম গেছে। তারপর দেখা যাক কার ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে।'

'তুমি তাহলে দুবাই যাচ্ছ?'

'ধুর! এ তো সেই গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল। কাকে পাঠাবে তারই ঠিক নেই। আর সেই প্রজেক্ট শুরু হতে এখনও ঢের দেরি। তুমি মিছিমিছি অন্যরকম ভাবছ।'

তার ভাবনা যাই হোক সুমন যে আগে থেকেই অন্যরকম ভেবে রেখেছিল, সুতপা সেটা অনেক পরে বুঝল। ছি-ছি! একটা মানুষ যে এত নীচে নামতে পারে সুতপা তা কল্পনাও করেনি। কিন্তু পরের মাসেই হঠাৎ একটা বেনিয়ম ধরা পড়ল। ভাগ্যিস মা তিন দিন ছিল না। কী একটা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ভাইয়ের কাছে গিয়েছিল। তাই ব্যাপারটা সকলের চোখ এড়িয়ে গেছে।

কিন্তু শরীরের হঠাৎ এই পরিবর্তনটা সুতপার মনে কাঁটার মতো বিঁধে রইল। এমন একটা ব্যাপার বন্ধুবান্ধব কাউকেই ঠিক বিশ্বাস করে বলা যায় না। শেষ পর্যন্ত লজ্জার মাথা খেয়ে সুমনকেই সব খুলে বলতে হল। ঘটনাটা আদ্যন্ত শুনে তার কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ল। বলল, 'ঠিক আছে। আমার এক বন্ধু গাইনি।

চলো, তাকে একবার কনসাল্ট করি।'

সুতপা ভয় পেয়ে বলল, 'ডাক্তারের কাছে যেতে হবে?'

'হ্যাঁ। মানে তাই তো যাওয়া উচিত।' সুমন স্বচ্ছন্দে কথা কইল।

দু'দিন বাদেই তাকে ডাক্তারের চেম্বারে নিয়ে গেল সুমন। ভদ্রলোক ঠিক সুমনের বয়সি নয়। চেহারাটা গোলগাল বলেই বোধহয় একটু ভারিক্কি দেখায়।

পরীক্ষা—তাকে জিজ্ঞাসাবাদের পর চেম্বার থেকে বেরিয়ে ডাক্তার বলল, 'মনে হচ্ছে বাধিয়ে বসে আছিস্।'

সুমন শুধোল, 'আর ইউ সিওর?'

'আমার এক্সপিরিয়েন্স তাই বলে। তবু একটা টেস্ট করা উচিত। খুবই সাধারণ ব্যাপার। সকালের ফার্স্ট ইউরিনটা দিয়ে যাস। কালার টেস্টে যদি পজিটিভ বলে তাহলে কনফার্মড। আর কোনো সন্দেহ রইল না।'

সুতপা বোকার মতো শুধোল, 'আমার কী হয়েছে ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার হেসে জবাব দিল, 'ও কিছু নয়। চিন্তার কোনো কারণ নেই। দু'দিনেই সেরে উঠবেন।'

বেরবার সময় সুতপা শুনতে পেল, ডাক্তার বলছে, 'এই তোর লেটেস্ট ক্যাচ?'

'আঃ চুপ কর না।' সুমন তাকে থামিয়ে দিল। ফিসফিস করে বলল, 'শুনতে পাবে যে।'

চেম্বার থেকে বেরিযে সুমন বলল, 'আচ্ছা বোকা তুমি। ডাক্তারকে কী জিগ্যেস করছিলে?'

'বারে! আমার কী হয়েছে তা জানতে চাইব না? এতে দোষের কী হল?'

'কী হয়েছে বুঝতে পারছ না?' সুমন গম্ভীরমুখে বলল, 'তুমি Conceive করেছ সুতপা। তোমার পেটে সন্তান এসেছে।'

'কী?' সুতপা প্রায় টাল খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল। সুমন হাত বাড়িয়ে না ধরে ফেললে তাই হত।

সুমন বলল, 'এতে নার্ভাস হবার কী আছে? এ তো একটা মামুলি ব্যাপার। সাকশন করে Foetus-টা টেনে বের করে দিলেই ল্যাঠা চুকে যায়।'

'তার মানে অপারেশন?'

'ধুর। অপারেশন হতে যাবে কেন? এ কি ছুরি-কাঁচির ব্যাপার!'

'তাহলে?'

'ও কিছু নয়, বেলা দশটা নাগাদ নার্সিংহোমে ভর্তি হয়ে যাবে। আর বিকেল চারটেয় ছুটি। তার পরদিন যেমন অফিসে যাও তেমনি যাবে। কাকপক্ষীতেও টের পাবে না।'

সুমন যেমন বলেছিল সব ঠিক-ঠিক তাই ঘটল। কালার টেস্টে পজিটিভ ধরা পড়তেই সুতপাকে নার্সিংহোমে আসতে হল। আধঘণ্টার মধ্যেই অবশ্য অপারেশান

শেষ। তবু বিকেল পর্যন্ত ডাক্তার তাকে বেডে শুয়ে থাকতে বলল। চারটের পর সুতপাকে নিয়ে গাড়ি ফের কলকাতার দিকে চলল।

যেতে যেতে সুতপা জিগ্যেস করল, 'তুমি বলছ আমি কালই অফিস যেতে পারব?'

'কেন পারবে না? সকালে ঘুম থেকে উঠলেই দেখবে কী রকম ফ্রেশ ফিল করছ।'

'সে না হয় বুঝলাম।' সুতপা অপাঙ্গে সুমনকে দেখল। শেষে বলল, 'কিন্তু মায়ের সঙ্গে তুমি দেখা করছ কবে? মানে এই ঘটনার পর আর কি দেরি করা ঠিক?'

সুমন তাকে আশ্বাস দিল, 'মিথ্যে চিন্তা করছ তুমি। আমাদের বিয়ের কথা বলতে খুব শিগগিরই তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা করছি।'

কিন্তু ওটা যে সত্যি নয়, নিতান্তই স্তোকবাক্য, দিন পনেরো বাদেই সুতপা সেটা টের পেল। সাত-আট দিন সুমনের পাত্তা নেই। আর টেলিফোনও করেনি। সুতপার খুব ভাবনা হচ্ছিল। হঠাৎ কোনো অসুখ-বিসুখ করল না তো? কিন্তু সুমনের ঠিকানাও সে জানে না। তবে অফিসের ফোন নম্বরটা তার লেখা আছে। শেষ পর্যন্ত একদিন বেলা আড়াইটে নাগাদ সুমনের অফিসে সে ফোন করল। সুমন দত্তর নাম বলতেই টেলিফোন অপারেটর তাকে এক্সটেনশনে লাইনটা দিয়ে বলল, 'আপনি এইখানে কথা বলুন।'

অপরপ্রান্ত থেকে সাড়া এলো, 'হ্যালো।'

সুতপা সঙ্কোচের সঙ্গে শুধোল, 'আচ্ছা, সুমন দত্ত, আপনাদের কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ার। তাকে একটু ডেকে দেবেন?'

ভদ্রলোক হেসে জবাব দিলেন, 'ডাকলেও তো সে আসতে পারবে না।'

'কেন?'

'সে তো এখন দুবাইতে। কোম্পানির সঙ্গে পাঁচ বছরের কনট্র্যাক্ট সই করে দুবাই চলে গেছে।'

'দুবাই চলে গেছে?' সুতপা অস্ফুটে শুধোল, 'কত দিন আগে?'

'বেশি দিন নয়, এই তো সাত-আট দিন হল।' ভদ্রলোক কপট উৎকণ্ঠার সঙ্গে শুধোলেন, 'আপনার কোনো আত্মীয়?'

'নাহ্।' বলেই সুতপা লাইনটা ছেড়ে দিল।

বাড়ি ফিরে বিছানায় শুয়ে রইল সুতপা। সে ভাবছিল ওই অমানুষটার কথা। কী সাঙ্ঘাতিক লোক। একটি মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে তার সর্বস্ব লুণ্ঠনের পর দিব্যি দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছে। পাঁচ বছর পরে হয়তো আর কলকাতাতেই ফিরবে না। দিল্লি, বাঙ্গালোর কিংবা মুম্বাই কত জায়গা তো আছে। তবু প্রথমে

সুতপার মনে হত দুবাই থেকে সুমন হয়তো তাকে একটা চিঠি লিখবে। কলকাতায় সুতপার ব্যাংকের ঠিকানাটা তো ওর অজানা নয়। কত দিন ব্যাংকের কাউন্টারে চিঠি দিতে আসা পিওনের দিকে সে সতৃষ্ণনয়নে তাকিয়ে থেকেছে। কিন্তু তার নাম লেখা মধ্য-এশিয়ার কোনো একটি দেশের সিলমোহর মারা খামের চিঠি তার দিকে এগিয়ে দেয়নি।

ধীরে ধীরে দুটো বছর কাটল। পার্ক স্ট্রিটের অফিস থেকে সুতপা বদলি হয়ে এল সল্টলেকের ব্রাঞ্চে। সুমনের কথা এখন আর তার নিয়মিত মনে পড়ে না। শুধু মাঝে মাঝে গভীর রাতে হঠাৎ ঘুম ভাঙলে দুই সবল শক্ত হাতের বেষ্টনীর স্পর্শ সে অকস্মাৎ অনুভব করে।

ইতিমধ্যে মা বেশ কয়েকবার মেয়ের বিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সুতপা রাজি হয়নি।

শেষ পর্যন্ত তার এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে সুব্রতর সঙ্গে পরিচয় হল। দূরসম্পর্কের দাদা রমলার। কলেজের অধ্যাপক। সৌম্য শান্ত চেহারা। সেন্ট্রাল ক্যালকাটায় একটা ফ্ল্যাট নিয়ে থাকে। বাড়িতে আর দ্বিতীয় প্রাণী নেই। সর্বক্ষণের এক কাজের লোক ছাড়া।

রমলা একফাঁকে তার কানের কাছে ফিসফিস করল, 'হ্যাঁরে, সুব্রতদাকে তোর কেমন লাগল?'

'কেন? বেশ ভদ্রলোক বলেই তো মনে হল।'

'এখনও বিয়ে-থা করেনি। মানে দাঁড়িয়ে থেকে কেউ বিয়ে দেবার নেই বলে।'

'ওমা! সেজন্যই বিয়ে হবে না। বলিস্ কী?'

'তোর যদি পছন্দ হয়ে থাকে, তাহলে আমি সম্বন্ধ করি?'

'চুপ কর্। ফাজিল কোথাকার!' সুতপা তাকে একটা ছোট্ট ধমক দিল। বলল, 'শোন্, মাকে আমি সাফ জানিয়ে দিয়েছি বিয়ে কোনোদিন করব না।'

'বলিস্ কী? বাকি জীবনটা যোগিনী হয়ে থাকবি?'

'হ্যাঁ তাই।' সুতপা সোজাসুজি উত্তর দিল।

'সুব্রতদাকে দেখে মত বদলাতেও তো পারিস্।'

সুতপা চুপ করে রইল। এবার কোনো জবাব দিল না।

কিন্তু পরদিন রমলা তাকে আবার ফোন করল। বলল, 'এই শোন্। মনে হচ্ছে সুব্রতদার তোকে খুব পছন্দ হয়েছে। মানে তোর সম্বন্ধে বেশ interested।'

সুতপা মুচকি হেসে শুধোল, 'সেটা কেমন করে বুঝলি? হাত গুনে?'

'ধুর। এই সামান্য ব্যাপারটুকু বুঝতে আবার হাত গুনতে হয় নাকি?' রমলা ফিক করে হাসল। বলল, 'জানিস্, তুই চলে যাবার পর তোর সম্বন্ধে অনেক খোঁজখবর নিচ্ছিল।'

'কী রকম।'

'এই যেমন ধর্, তুই কতদূর পড়াশুনো করেছিস্, চাকরি-বাকরি করিস্ কি না, কোথায় বাড়ি, মাথার ওপর কে আছেন ইত্যাদি।'

'বললেই পারতিস্, মেয়েটা আকাট মুখ্যু। একটা চিঠি পর্যন্ত লিখতে পারে না।'

'হুঁ।' রমলা তাচ্ছিল্যভরে জানাল। 'বললেই বিশ্বাস করত ভেবেছিস্? আমাকে কী বলেছে জানিস্?'

'কী?'

'বলল, ভদ্রমহিলাকে দেখলেই মনে হয় বেশ accomplished।'

শেষ পর্যন্ত বিয়েটা হয়ে গেল। সুব্রতর সঙ্গে সুতপার। ছোটখাটো একটা অনুষ্ঠান। সুব্রত এবং সুতপা দুজনেরই এতে সায় ছিল।

তবু বিয়ের আগে সুমনকে অনেকবার মনে হয়েছে সুতপার। কেবলি ভেবেছে কত পার্থক্য এই দুজন মানুষের মধ্যে। যার সঙ্গে তার বিয়ের ঠিক, সেই মানুষটা তার জীবনের দ্বিতীয় পুরুষ। শান্ত ভদ্র এবং মার্জিত। আর সুমন? সে ছিল একটা ঝোড়ো হাওয়া। ক'টা দিনেরই বা পরিচয় তার সঙ্গে? কিন্তু সেই সময়টুকুর মধ্যে ঝড়ের দাপটে সুতপাকে লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গেছে। সুমন তার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছে তা ক্ষমারও অযোগ্য। কিন্তু তবু যে কোনো কারণেই হোক সেই মানুষটাকে আজও সে মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি।

সুতপা প্রথমে ভেবেছিল বিয়ের আগেই ব্যাপারটা সে হবু স্বামীকে খুলে বলবে। সুমনের সঙ্গে তার একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়েছিল সেটা নিশ্চয় স্বীকাব করা উচিত। আর এ তো শুধু পবিচয় কিংবা বন্ধুত্ব নয়। রীতিমতো দৈহিক সম্পর্ক। শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত রেসর্টের ঘরে একবারের জন্য হলেও তার সহবাস, যার ফলে সুতপা গর্ভবতী হয়ে পড়ে। তাবপর নার্সিংহোমের ডাক্তার ছোটখাটো অপারেশানের সাহায্যে তাকে সেই অবাঞ্ছিত মাতৃত্বের দায় থেকে মুক্তি দেয়। এই ঘটনা সবিস্তারে না জানালে একে দ্বিচারিতা ছাড়া আর কি বলে?

কিন্তু বিয়ের আগে কিংবা বিয়ের পরেও সুতপা ঘটনাটা সুব্রতকে বলতে পারেনি। এক-পা, দু-পা করে প্রতি বাত্রে এগিয়েও সে আবার ভয়ে পিছিয়ে এসেছে। এই বৃত্তান্ত শোনার পর সুব্রতর মন যদি বিষিয়ে ওঠে? বিয়ের আগে যে স্ত্রীর আর একজন পুরুষের সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক হয়েছিল এবং যার ফলে সে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে, সেই বউকে যদি গ্রহণ করতে সুব্রত রাজি না হয়? তাকে পরিত্যাগ করবার সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে? তাহলে কি সুব্রতকে দোষ দেওয়া চলে?

একবার তার মনে হল সুব্রতর জীবনেও তো এরকম একটা ঘটনা থাকতে পারে। ইউনিভার্সিটির পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ক্লাসে তো ছেলে-মেয়ে একসঙ্গে পড়ে। এদের কারো সঙ্গে ভাব-ভালোবাসা হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। আর সুব্রত যে বত্রিশ বছর পর্যন্ত বিয়ে করেনি, সে তো একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন।

কিছুদিন বাদেই কথাটা সে শুধোল। শুনে সুব্রত শুধু হাসল, বলল, 'তোমার কি মনে হয় কোনো কাঁকন-পরা হাতের ধাক্কা খেয়ে আমার বিবাহে বিরাগ এসেছিল?'

'হ্যাঁ, সেটাই তো সম্ভব।'

সুব্রত বলল, 'তুমি নিশ্চিন্ত থেকো। তোমার আগে অন্য কোনো নারীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়নি।'

তেমন পুরুষ হলে হয়তো পাল্টা প্রশ্ন করত, 'তোমারও তো পঁচিশ বছর পর্যন্ত বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত ছিল। তাহলে তুমিও কাউকে ভালোবাসতে? নইলে বিয়ে করবে না এমন ধনুকভাঙা পণ করেই বা কেন বসেছিলে?'

কিন্তু সুব্রত মানুষটা বড় সাদামাটা। সরল এবং অনাড়ম্বর। হেসে বলল, 'তুমি বোধহয় জানতে চাও এর আগে আমি কোনো মেয়ের প্রেমে পড়েছি কি না? আরে ধুর! আমাদের বাংলা ক্লাসে অবশ্য ছাত্রীব অভাব ছিল না। কিন্তু সত্যি বলছি গায়ে পড়ে প্রেম নিবেদন করবার মতো দুঃসাহস আমার কোনোদিন হয়নি।'

এরকম সহজ স্বীকারোক্তির পর আর কোনো কথা বলা চলে না।

কিন্তু সুতপার মনের কোণে একটা আশঙ্কার ছায়া রয়ে গেল। অনেক চেষ্টা করেও সেই ভয়টাকে সে দূর করতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত যদি কোনোদিন ব্যাপারটা জানাজানি হয়? এই ঘটনার সাক্ষী অবশ্য তারা তিনজন। সে নিজে, সুমন এবং তৃতীয় ব্যক্তি নার্সিংহোমের বন্ধু ডাক্তার। অপাঙ্গে সুমনের দিকে তাকিয়ে যে চিমটি কেটে বলেছিল, 'এই কি তোর লেটেস্ট ক্যাচ?'

কিন্তু সুমন তো দুবাই চলে গেছে। পাঁচ বছরের কনট্র্যাক্টে। সেখান থেকে ফিরে এলেও কলকাতা অফিসে আর না আসতেও পারে কিংবা দুবাই থেকে কোম্পানির কাজে উপসাগরীয় আরব দেশের কোনো স্টেশনে ফের যেতে পারে। আর নার্সিংহোমের সেই ডাক্তার যে তাকে অবাঞ্ছিত মাতৃত্বের দায় থেকে মুক্তি দিয়েছিল, তার সঙ্গে ফের দেখা হওয়ার সম্ভাবনা কোথায়?

তবু ভালো শাড়ির গায়ে মরচের দাগ পড়ার মতো ওই ঘটনাটা তার মন থেকে মুছে যায়নি।

তারপর সুমনের সই করা গ্রিটিংস কার্ডটা হাতে পেয়েই তার বুকের ভেতরটা ধক্ করে উঠল। পাঁচ বছর পরে তবে কি সুমন কলকাতায় ফিরে এসেছে? কিন্তু দেশে ফিরলেও তাকে গ্রিটিংস কার্ড পাঠানোর মতো নির্লজ্জ সে হতে পারল?

ব্যাগ থেকে খামটা বের করে গোয়েন্দা পুলিশের মতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে লেফাফাটা পর্যবেক্ষণ করল।

কোথা থেকে এসেছে এই চিঠিখানা? খামের গায়ে মারা সিলমোহরটা এত অস্পষ্ট যে জায়গাটা কোথায় কত দূরে তা সে বুঝতেই পারল না। আরও একটা প্রশ্ন থেকে যায়। তার স্বামীর বাড়ির ঠিকানাটা সুমন জানল কেমন করে? নিশ্চয়

তার পুরোনো অফিসে গিয়ে খোঁজ করেছিল? হয়তো সেখান থেকেই এই বাড়ির নম্বরটা পেয়েছে। অথবা তার সেই বন্ধু অণিমার কাছ থেকেও পেতে পারে।

বাড়ি ফিরে ইচ্ছে করেই গ্রিটিংস কার্ডের প্রসঙ্গটা সে আর তুলল না। দোষ কিংবা গুণ যাই বলুন সুব্রতর কৌতূহল বড়ো কম। সুতপাকে কে গ্রিটিংস কার্ড পাঠাল সেটা জানার মতো আগ্রহও তার নেই। তবু সুতপার মনের মধ্যে একটা কাঁটার মতো ওই গ্রিটিংস কার্ডটা কোথাও বিঁধে রইল। রাত্তিরে তার ঘুম আসছিল না। সুতপার কেবলি মনে হয়েছে চিঠি যখন এসেছে তখন এবার মানুষটা নিশ্চয় সশরীরে তার সামনে এসে হাজির হবে।

সুতপার আশংঙ্কা যে অমূলক নয় দিন পনেরো বাদেই তার প্রমাণ মিলল। টিফিন শুরু হওয়ার মুহূর্তে সে এসে হাজির। কাউন্টারে বসে সুতপা সেভিংস অ্যাকাউন্টের পাস বইগুলো আপ-ডেটিং করছিল। সুমন এসে দাঁড়াতেই সে বলল, 'দেখছ তো, এখন খুব ব্যস্ত আছি। তুমি বরং আর একদিন এসো।'

'আর একদিন তো আসবই।' সুমন অন্তরঙ্গতার সুরে কথা কইল। 'কিন্তু আজ কিছুক্ষণ কথা বলে যাই। কতদিন পরে দেখা হল। তুমি কাজটা সেরে নাও। আমি অপেক্ষা করছি।'

সল্টলেকের ব্র্যাঞ্চে সুমনকে কেউ চেনে না। এই তো প্রথমবার এল। আর সুব্রত? স্ত্রীর কর্মজগতে ঢোকা সে অনধিকার প্রবেশ বলে মনে করে। আসা দূরে থাক, শেষ কবে একটা টেলিফোন করেছিল সুতপার মনে নেই।

হাতের কাজ সারতে মিনিট কুড়ির বেশি লাগল না। কাউন্টারের রেলিঙের ফাঁক দিয়ে সুতপা দেখল একটা বেঞ্চের ওপর সুমন ঠায় বসে আছে। নড়বার কোনো লক্ষণ নেই।

ওকে এড়িয়ে যাওয়ার কোনো উপায় নেই দেখে সুতপা ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। বলল, 'কী ব্যাপার? কিছু বলবে?'

'হ্যাঁ। আর সেজন্যই তো তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।' সুমন বেশ নরম গলায় কথা কইল।

কিন্তু সুতপা ভাঙল না। সে তেমনি টানটান শক্ত ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে জানাল, 'কী বলবে সেটা বলে ফ্যালো।'

'আশ্চর্য! এখানে এই ভাবে দাঁড়িয়ে কি কথা বলা যায়? অন্তত ছুটির পর আমাকে আধঘণ্টা সময় দাও। কোথাও গিয়ে—' বাকিটুকু সুমন ইঙ্গিতে বোঝাল।

'তার মানে কোনো রেস্তোরাঁ বা কাফেতে বসে আগের মতো কথা বলতে চাও, এই তো?'

সুমন সহাস্যে তার দিকে তাকাতেই সুতপা আবার বলল, 'আমি তো ভেবেই পাচ্ছি না পাঁচ বছর বাদে তোমার আর কী কথা বলতে বাকি আছে? সবই যখন চুকেবুকে গেছে।'

সুমন বলল, 'তুমি মিছিমিছি রাগ করছ সুতপা। আমাকে হঠাৎ দুবাই চলে যেতে হল কি না। আসলে কোম্পানি একদিন মুম্বাইতে ডেকে পাঠাল। এদিকে তলে তলে সব ব্যবস্থাই পাকা করে রেখেছিল। পাসপোর্ট, ভিসা, মায় প্লেনের টিকিট পর্যন্ত। একরকম ঠেলেঠুলেই আমাকে দুবাই পাঠিয়ে দিল। মানে তখন আর রিফিউজ করবার কোনো উপায় ছিল না। একটা ভালো চান্স, বুঝতেই পারছ?'

'বুঝতে পারছি বৈকি।' সুতপা ব্যঙ্গ করে হাসল। বলল, 'ভাল চান্স কেউ ছাড়ে? ইতিমধ্যে কোম্পানি নিশ্চয় তোমাকে প্রোমোশন দিয়েছে। তা দুবাই থেকে ফিরলে কবে?'

সুমন হাসতে হাসতে জবাব দিল, 'বেশি দিন নয়। মাসখানেকও হয়নি।'

'আবার সেই কলকাতা অফিসেই ফিরে এলে?'

'না-না। এখানে আমার জন্য কোনোও ভেকেন্সি নেই। আপাতত দিল্লিতে পোস্টিং। পরে বাঙ্গালোর কিংবা মুম্বাই যেতে পারি।'

'তাহলে কলকাতায় এলে কেন?'

'ও একটা ছুতো করে চলে এলাম। মাঝে মাঝে কোম্পানিব এটা-সেটা কাজে মুম্বাই, কলকাতা যেতে হয় আমাদেব। তবে এসব কাজে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ররাই আসে। সিনিয়রদের বড়ো একটা পাঠায় না।'

'তাহলে তুমি এলে কেন?'

সুমন হেসে বলল, 'চলে এলাম। এমনিতে চার-পাঁচ দিনের ট্যুর মন্দ লাগে না। কলকাতায় কোম্পানির গেস্টহাউস রয়েছে, অসুবিধে নেই। তাছাড়া কলকাতায় যেতে হবে শুনে তোমাকে মনে পড়ে গেল। ভাবলাম যাই, সুতপার সঙ্গে দেখা হবে।'

ব্যাপারটা এখানেই চাপা দেবার জন্য সুতপা বলল, 'কিন্তু আমাব সঙ্গে এখন দেখা করে তোমার কী লাভ? দেখতেই পাচ্ছ, আই অ্যাম ম্যারেড।'

'হ্যাঁ। তা কতদিন বিয়ে হয়েছে তোমাব?' সুমন শুধোল।

'তিন বছর।' সুতপা গর্বের সঙ্গে জানাল।

'ওরে বাবা! সে তো অনেকদিন। তোমার ছেলেমেয়ে?'

সুতপা মাথা নাড়ল। বলল, 'ওসব কথা থাক।'

সুমন বলল, 'তুমি কিন্তু আগের থেকেও অনেক সুন্দর হয়েছ, সুতপা।'

সুতপা কেমন বাঁকা হেসে বলল, 'এরকম কথা কিন্তু তুমি আগেও অনেকবার বলেছ। যাক গে, এখন বলো, কোথায় অপেক্ষা করবে?'

সুমন বলল, 'বেশিদূর তোমাকে যেতে বলব না। উল্টোডাঙার কাছেই সি, আই. টি. রোডের ওপর একটা নতুন এ. সি. রেস্তোরাঁ হয়েছে। নাম—দি কুইন। দরজার সামনেই তোমার জন্য অপেক্ষা করব। ধরো, ছ'টা নাগাদ। প্লিজ কাম।' সুমন অনুনয় করল।

'দেখি ভেবে।' সুতপা কেমন রহস্য করে কথা কইল। বলল, 'যদি মনে হয় যাওয়া উচিত তাহলেই যাব। নইলে—'

'নইলে আমাকে ফিরে যেতে হবে, এই তো?'

'হ্যাঁ। নইলে আর কী করবে?' সুতপা কথা বাড়াল না। শুধু এক চিলতে হাসল।

•

সুমন চলে যাবার পর সুতপা ভাবছিল তার যাওয়া উচিত কি না? আচ্ছা কী মতলব ওই লোকটার? খোঁজখবর নিয়ে তার ব্যাংকের ঠিকানাটা তো বের করেছে। ওর কলকাতায় আসার পিছনে অন্য কোনো বদ মতলব নেই তো? সুতপা বিবাহিতা জেনেও ওর কোনো ভাবান্তর চোখে পড়েনি। সুতপা না গেলে ও যদি একদিন সন্ধের পর তার বাড়িতে এসে হাজির হয়? সুব্রত সেটা কেমন চোখে দেখবে? সব দিক চিন্তা করে সুতপা শেষ পর্যন্ত দি কুইন রেস্তোরাঁয় যাবার সিদ্ধান্ত নিল।

ছ'টার আগে থেকেই সুমন তার জন্য অপেক্ষা করছিল। সুতপা গিয়ে পৌঁছতেই সে সহাস্যে অভ্যর্থনা জানাল, 'এসো, এসো, দেরি দেখে আমার তো ভয় করছিল তুমি বুঝি এলেই না।'

'নাহ্। মানে আসব না কেন? একে ছুটির পর বাসে যা ভিড়। একটা খালি ট্যাক্সিও চোখে পড়ল না।'

'ভেরি স্যরি', সুমন হাসল। বলল, 'ফেরার সময় তোমাকে বাড়ির কাছাকাছি ড্রপ করে দেব।'

'তার দরকার নেই।' সুতপা জবাব দিল। বলল, 'ট্যাক্সি কিংবা বাস যাতে হোক আমি চলে যেতে পারব।'

প্রায়ান্ধকার ঘরটার এক কোনে বসল দুজনে। শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত হল। তাদের বসবার জায়গার ঠিক পাশেই একটা থাম। সুতপার অস্বস্তি অনেকখানি কেটে গিয়েছিল। থামের আড়ালে অনেকেই তাদের লক্ষ্য করতে পারবে না। নইলে হঠাৎ যদি চেনাজানা কারও সঙ্গে দেখা হয়ে যায়?

সুমন বিয়ার নিল। সুতপা আগেই বলল, 'আমি এসব খাই না।'

সুমন জোর করল না। বলল 'ঠিক আছে। তুমি একটা আপেল জুশ নাও।'

হালকা পানীয় একটু সিপ্ করেই সুতপা তাড়া দিল, 'কেন ডেকেছ বল? কী কথা আছে তোমার?'

'বলছি, বলছি। এত ব্যস্ততা কীসের?' সুমন সহজ হবার চেষ্টা করল। হেসে বলল, 'আপেল জুশটা খাও না।'

বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দিয়ে সুমন কী যেন ভাবছিল। সুতপার দিকে তাকিয়ে শুধোল, 'আচ্ছা, আমার কথা তোমার স্বামী জানে?'

প্রশ্নটা তীক্ষ্ণ। সুতপা ভ্রূকুঞ্চিত করল। সুমন ঠিক তাকে কোন দিকে নিয়ে

যাচ্ছে? সে যদি নেতিবাচক উত্তর দেয় তাহলে কি সুমন সন্তুষ্ট হবে? আর নেতিবাচক জবাব দিলে সুমন হয়তো আর একটা সুযোগের জন্য তৎপর হয়ে উঠবে?

ঈষৎ গম্ভীর মুখে সুতপা বলল, 'তুমি কি আশা করেছিলে? বিয়ের পর তোমার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতার কথা নিজের মুখে স্বামীর কাছে কবুল করব?'

সুমন বাঁকা চোখে তাকাল। বলল, 'কোনো মেয়েই সেটা করে না। স্বামী ছাড়াও অন্য একজন পুরুষের সঙ্গে কত মেয়ের বন্ধুত্ব কিংবা ঘনিষ্ঠতা থাকে। স্বামী কোনোদিন তা জানতেও পারে না।'

সুতপা বলল, 'তোমার সঙ্গে যে পরিচয় বা ঘনিষ্ঠতার কথা বলছ ওটা আমার জীবনে Past, একটা মৃত অতীত। কোনোদিন আর তা জীবন্ত হয়ে উঠবে না।'

সুমন বলল, 'কিন্তু ধরো, তোমার স্বামী যদি কোনোদিন এই ঘনিষ্ঠতার কথা জানতে পারেন? একজন পুরুষের সঙ্গে সংসর্গের ফলে তুমি সন্তানসম্ভবা হয়েছিলে।'

'উনি সেটা কেমন করে জানবেন?' সুতপা বিরক্তিসূচক মন্তব্য করল। শেষে বলল, 'অবশ্য তুমি যদি জানাও তাহলে--'

'বারে!' সুমন ঈষৎ অপ্রস্তুত ভঙ্গি করে হাসল। বলল, 'আমি কেন জানাতে যাব? তবে ব্যাপারটা আমি ছাড়াও তো কেউ কেউ জানে।'

'কী রকম?' সুতপা জিজ্ঞাসু হল।

'কেন? আমার সেই ডাক্তার বন্ধু, গাইনোকোলজিস্ট ডাঃ দাশ। যিনি তোমার অ্যাবরশন করিয়েছিলেন।'

সুমন যেন তার গোপন কথার ঝুলি থেকে একটা সূত্র বের করে দিল।

সুতপা কিছু বলার আগেই সুমন ফের বলল, 'ডাঃ দাশ নাকি তোমাকে কয়েকবার দেখেছেন।'

'আমাকে? কোথায়?' সুতপাকে ঈষৎ নার্ভাস দেখাল।

সুমন বলল, 'না মানে কলকাতায় এসে একদিন ওর চেম্বারে দেখা করতে গিয়েছিলাম। দু-চার কথার পর নিজেই বলল, তোমাকে নাকি উল্টোডাঙার বাসস্টপে দু-তিন দিন দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে। বলছিল, সিঁথিতে সিঁদুর দেখেই বুঝতে পেরেছে ইউ আর ম্যারেড।'

সুতপা বলল, 'ঠিকই দেখেছেন। বাড়ি ফেরার জন্য উল্টোডাঙার বাসস্টপে আমাকে দাঁড়াতেই হয়। উনি তাই দেখেছেন।'

সুমন বলল, 'ডাক্তারের কাছে শুনলাম কলকাতায় এরকম কেস নাকি কত হয়। প্রথমে পরিচয় তারপর বন্ধুত্ব, ঘনিষ্ঠতা। এক সময় দৈহিক মিলন। শেষ পর্যন্ত হয়তো কোনো কারণে সম্পর্কটা ভেস্তে গেল। পরে আবার ওই মেয়েটির অন্যত্র শুভ-পরিণয়, ঘর-সংসার সবই হচ্ছে। ওসব পুরোনো দিনের কথা কেউ আর মনে রাখে না।'

শুনে সুতপা আশ্বস্ত বোধ করল। বলল, 'উনি যা জানেন তাই বলেছেন। এরকম অভিজ্ঞতা কারও জীবনে হতেই পারে! কিন্তু তাই বলে জীবনটাই নষ্ট হয়ে গেল এরকম ভাবনার কোনো কারণ নেই।

সুমন বলল, 'ডাক্তার কিন্তু একটা ব্যাপারে সামান্য চিন্তিত। জিগ্যেস করছিল তোমার কোনো ইস্যু হয়েছে কি না?'

'কেন?' সুতপা ভুরু তুলে তাকাল।

সুমন বলল, 'অ্যাবরশনের সময় মেয়েদের ফ্যালোপাইন টিউবে সামান্য আঘাত লাগলেও তার ফল মারাত্মক হতে পারে।'

সুতপা শুনল। কিন্তু কোনো মন্তব্য করল না।

বেয়ারা চাইনিজ মোমো আর এক প্লেট চিলি চিকেন রেখে গিয়েছিল।

সুমন একটা মোমো তুলে নিয়ে বলল, 'তোমার কাছে আমার একটা প্রস্তাব ছিল, সুতপা। অবশ্য তুমি যদি রাজি হও।'

'বারে!' সুতপা আড়চোখে তাকাল। বলল, 'না শুনেই রাজি হব কেমন করে?'

সুমন বলল, 'দুবাইয়ে থাকতে তোমাকে খুব মনে পড়ত। চিঠি লেখার কথা যে ভাবিনি তা নয়। পরে মনে হয়েছে চিঠিটা যদি ব্যাংকের অন্য কারও হাতে পড়ে তাহলে তোমার কী অবস্থা হবে।'

'ওসব কথা থাক।' সুতপা ঈষৎ বিরক্তি প্রকাশ করল। বলল, 'বরং তুমি যা বলতে চাও সেটাই বলো।'

'কথাটা তেমন কিছু নয়।' জিভটাকে সচল করে নিয়ে সুমন জানাল, 'আমার জন্য তুমি কি একটা বেলা স্পেয়ার করতে পারো? অফ কোর্স ইফ ইউ টেক ইট লাইটলি।'

'তার মানে?' সুতপা পাল্টা প্রশ্ন করল, 'একজ্যাক্টলি কী বলতে চাও তুমি?'

'ব্যাপারটা তেমন গুরুতর কিছু নয়। নাথিং সিরিয়াস। It's a joy ride.' সুমন একটা বিষণ্ণ অভিব্যক্তি করে তাকাল। বলল, 'হয়তো এটাই তোমার সঙ্গে আমার শেষ দেখা সুতপা। কারণ কলকাতায় বড়জোর আর দুটো দিন আছি। তারপর দিল্লি। সেখান থেকে কোম্পানি কোথায় পাঠিয়ে দেবে নিজেও তা জানি না।

'ঠিক কী বলতে চাও, সুমন?' সুতপা সোজাসুজি প্রশ্ন করল। তার কণ্ঠস্বরে এখন ঝাঁঝ কম বরং অনেক নরম।

সুমন ধীরে ধীরে বলল, 'আগের মতো আমার সঙ্গে একদিন বেড়িয়ে আসবে চলো। জাস্ট ফর এ ফিউ আওয়ার্স। বলতে পারো এটাই আমাদের লাস্ট রাইড, টুগেদার।'

সুতপার হঠাৎ মনে হল সুমন যেন তাকে ঠিক আগের মতো সম্মোহিত করছে। ওর কথায় যেন যাদু আছে। সে অস্ফুটে শুধোল, 'কোথায় নিয়ে যাবে?'

'কলকাতার আশেপাশে যেখানে হোক। যেমন আগে গিয়েছি।' সুমন ফিসফিস

করল। 'প্লিজ, তুমি আপত্তি কোরো না।'

সুতপা সব বুঝতে পারছিল। সুমনের মতলবটা এখন দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। তবু ওকে প্রত্যাখান করবার মতো জোর তার ছিল না। নেতিবাচক উত্তর দিলে হয়তো টেলিফোন করে সুব্রতকে তার সঙ্গে যে সম্পর্ক ছিল তা আদ্যন্ত জানিয়ে দিতে বিলম্ব করবে না। ওই মানুষটার সঙ্গে মাত্র একদিনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যে পরে এমন জটিল আকার ধারণ করবে সুতপা স্বপ্নেও ভাবেনি। তার চেয়ে ওর প্রস্তাবে রাজি হয়ে কয়েক ঘণ্টা বেড়িয়ে এলে হয়তো ব্যাপারটার এখানেই ইতি হবে। আর সুমন তো বলেছে তার সঙ্গে এটাই শেষ দেখা। লাস্ট রাইড টুগেদার।

তবু নিজেকে সংযত করে সে বোঝাতে চেষ্টা করল, 'তুমি ভেবে দ্যাখো। এখন কি আর এটা সম্ভব? ডোন্ট ফরগেট আই অ্যাম ম্যারেড। আমার স্বামী আছেন।'

'থাকলেই বা।' সুমন নির্লজ্জের মতো হাসল। বলল, 'কাকপক্ষীতেও টের পাবে না। আর আমি তো কথা দিচ্ছি ভবিষ্যতে কোনওদিন তোমার সামনে আসব না। তোমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা, ফিজিক্যাল রিলেশন, যার জন্য তোমাকে নার্সিংহোমে যেতে হয়েছিল, এই বৃত্তান্ত শুধু তোমার স্বামী কেন পৃথিবীতে আর কেউ জানবে না।'

সুতপা বুঝল দাবার ছকে সুমন এক মোক্ষম চাল দিয়েছে। ওর প্রস্তাবে রাজি হলে ভালো নইলে এ সমস্ত কথা যে সুব্রতর কানে উঠবে তা নিশ্চিত। আর অবিবাহিত জীবনে স্ত্রী যে একবার গর্ভবতী হয়েছিল এ কথা শুনলে কোনো স্বামী মাথা ঠিক রাখতে পারবে?

অগত্যা সুতপা বলল, 'কবে যেতে চাও?'

'কাল কিংবা পরশু।' সুমন বলল, 'তুমি তো জানো আমি আর মাত্র দুটো দিন কলকাতায় আছি।'

'ঠিক আছে। তবে কাল নয় পরশু।'

'Very good.' সুমন খুশি হয়ে বলল, 'আমি জানতাম You are practical.'

চেয়ার ছেড়ে ওঠার আগে সুতপা শুধোল, 'পরশু কোথায় দেখা হবে?'

সুমন যেন গোটা প্ল্যানটাই ছকে নিয়ে এসেছিল। এক মুহূর্ত চিন্তা না করে জবাব দিল, 'নিউ এম্পায়ারের সামনে। দুটো নাগাদ এস। আমি অপেক্ষা করব।'

বেলা দুটোর আগেই সুতপা নিউ এম্পায়ারের সামনে পৌঁছে গেল। একটা সাদা রঙের অ্যামবাসাডর গাড়ির পাশে সুমন দাঁড়িয়েছিল। চোখাচোখি হতেই বলল, 'এসো এসো। You are just in time.'

সমস্ত পথ সুতপা চুপ করে বসেছিল। একটি কথাও ব্যয় করেনি। গাড়িটা সুমন নিজেই ড্রাইভ করছিল। ইচ্ছে করেই সুতপা পিছনের সিটে বসল। এই নিয়ে সুমন একটি কথাও বলেনি। শিকার যখন জালে বন্দি তখন আর বৃথা বাক্যব্যয় করে লাভ কি?

গাড়ি কলকাতা পিছনে ফেলে মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে ছুটে চলল। সুমন বলল, 'তুমি এত আড়ষ্ট কেন? এমন লাইফলেস তো আগে কোনোদিন মনে হয়নি।'

'ও কিছু নয়।' সুতপা জবাবটা এড়িয়ে গেল।

সেই আগের মতো একটা রেসর্টের সামনে গাড়ি এসে থামল। দরজা খুলে দিয়ে সুমন বলল, 'নেমে এসো। কোণের ওই ঘরটা টেলিফোনে বুক্ করে রেখেছি।'

সুতপা বলল, 'আমি কিন্তু লাঞ্চ করব না। বাড়ি থেকে খেয়ে বেরিয়েছি।'

সুমন ভুরু কোঁচকাল। বলল, লাঞ্চ না করো, অন্য খাবার তো খাবে।'

'সে দেখা যাবে।' সুতপা সংক্ষিপ্ত হল।

বেয়ারা এসে ঘরের দরজা খুলে দিল। মেঝে জুড়ে সবুজ রঙের কার্পেট পাতা। জোড়া খাটের ওপর ফোম রবারের গদি। সাদা ধবধবে চাদর, বালিশ।

বেয়ারা সুমনকে বিয়ার-গ্লাসে পানীয় ঢেলে দিল।

সুতপা বলল, 'আমি শুধু কোল্ড ড্রিংকস নেব।'

ইঙ্গিত করতেই সে একটা গ্লাসে ঠান্ডা পানীয় সার্ভ করল।

বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দিয়ে সুমন বলল, 'আজ তুমি এমন চুপচাপ কেন? হঠাৎ যেন কী রকম বদলে গেছ। আগে কিন্তু তুমি বেশ স্মার্ট আর ফ্রি ছিলে।' সুমন এগিয়ে এসে তাকে আকর্ষণ করবার চেষ্টা করল।

ওর হাতটা সরিয়ে দিয়ে সুতপা বলল, 'তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে।'

সুমন মুচকি হেসে বলল, 'এখন আবার কথা? আমি তো ভেবেছি তুমি তৈরি হয়ে এসেছ।'

তার কথার কোনো গুরুত্ব না দিয়ে সুতপা বলল, 'আমার একটা প্রশ্নের জবাব দেবে? যদি তোমার সঙ্গে সংসর্গের ফলে আমি ফের গর্ভবতী হই তাহলে কি আমাকে সেই নার্সিংহোমে যেতে হবে?'

'ধুর! আর নার্সিংহোমে কেন যাবে? তুমি এখন বিবাহিতা। তোমার সঙ্গে আজকের রিলেশনের ফলে যদি তোমার পেটে সন্তান আসে তাহলে তুমি হবে তার মা।'

'আর বাবা?' সুতপা বাঁকা চোখে তাকাল।

ঢকঢক করে গলায় খানিকটা বিয়ার ঢেলে সুমন বলল, 'এর উত্তর তো সোজা। আইনের চোখে তোমার সন্তানের বাবা হবেন তোমার হাজব্যান্ড। সমাজ সেটা স্বীকার করে নেবে সুতপা।'

'অর্থাৎ তোমার আর আমার সম্পর্কের ফলে যদি কেউ জন্ম নেয় তাহলে

সেই সন্তানের পিতৃত্ব স্বীকার করে নেবেন আমার স্বামী। অথচ সেই ভদ্রলোকের এই ব্যাপারে কোনো ভূমিকাই নেই।'

সুমন বলল, 'তুমি মিছিমিছি ব্যাপারটাকে জটিল করে তুলছ। যা বলছ এ সবই তো hypothesis, তোমাব মনগড়া।'

'কেন? তোমার সঙ্গে আজকের সংসর্গের ফলে আমার গর্ভে সন্তান আসা কি নিতান্ত অসম্ভব? আসলে ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ডরায়। বলতে পারো সুমন, একজন স্ত্রী একটা অপরাধবোধকে সারাজীবন মনের মধ্যে পুষে বেঁচে থাকতে পারে? ছেলে কিংবা মেয়ে যাই হোক সুব্রতকে বলতে হবে এই সন্তান তোমাব ঔবসজাত। অথচ সেটা ডাহা মিথ্যে, অসত্য। তার সাক্ষী আমি নিজে।'

সুতপা উঠে দাঁড়াল। বলল, 'কোনোভাবেই একটা শান্ত, ভদ্র, মার্জিত মানুষকে আমি সমস্ত জীবন প্রবঞ্চনার শিকার হতে দিতে পারি না। শুধু এই কথাটা বুঝিয়ে বলার সুযোগ পাইনি বলেই তোমার সঙ্গে এত দূর আসতে হয়েছে।'

কিন্তু সুমন দত্ত হাত বাড়িয়ে তাকে জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করল। বলল, 'কাছে এসো। প্লিজ।'

কিন্তু সুতপা মরিয়া। এক ধাক্কায় সুমনকে ফেলে দিয়ে দরজার ছিটকিনি খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। সুমন ঘব থেকে বেরিয়ে আসতেই সে ঘৃণার সঙ্গে জানাল, 'আর এক পা এগিযে আসার চেষ্টা করলে আমি চিৎকার করে লোক ডাকতে বাধ্য হব।'

অগত্যা সুমনকে থামতে হল। দাঁতে দাঁত চেপে সে বলল, 'কাজটা ভালো করলে না সুতপা। এর ফল তুমি ভুগবে।'

'জানি।' মুখটা বিকৃত কবে সুতপা জবাব দিল। বলল, 'টেলিফোন করে সুব্রতকে সব জানিয়ে দেবে, এই তো? কিন্তু তার আগেই এই অপরাধ আমি নিজের মুখে স্বীকার করব। পরিণাম যাইহোক তার জন্য আমি প্রস্তুত হয়ে আছি।' হাঁপাতে হাঁপাতে সুতপা আবার বলল, 'কিন্তু তোমাকেও আমি ছাড়ব না, সুমন। পুলিশকে জানাব একটা মেয়ের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে তাকে ব্ল্যাকমেইল করে তুমি এই রেসর্টে টেনে এনেছিলে। শুধু তার শরীরটাকে আর একবার উপভোগ করবে বলে। আমার এই অভিযোগ পেলে পুলিশ তোমাকে রেহাই দেবে ভেবেছ?'

রেসর্টের পাশে একজন শিখ ড্রাইভার ট্যাক্সি নিয়ে অপেক্ষা করছিল। গাড়িতে উঠে সুতপা শুধু বলল, 'আমহার্স্ট স্ট্রিট চলুন।'

সুব্রত বাড়ি ফিরল অনেক রাত্তিরে। দশটার পর। সুতপা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করল, 'কলেজ থেকে ফিবে আবার গিয়েছিলে কোথায়?'

'ডাক্তারের কাছে।' সুব্রত হাসছিল। বলল, 'রিপোর্ট দুটো নিয়ে এলাম। জানো তোমার কিংবা আমার কারও কোনো খুঁত নেই। যে কোনোদিন তুমি সন্তানের মা হাতে পারো।'

সে কথার জবাব না দিয়ে সুতপা জিগ্যেস করল, 'আচ্ছা, তোমাকে কেউ টেলিফোন করেছিল?'

'আমাকে? কে আবার টেলিফোন করবে?' সুব্রত পাল্টা প্রশ্ন করল।

'না মানে এমনি মনে হল তাই।'

'কী পাগলের মতো বকছ?' সুব্রত স্ত্রীকে ধমক দিল। বলল, 'তোমাকে বেশ ক্লান্ত লাগছে। বরং খাওয়া-দাওয়া করে শুয়ে পড়ো। রাত অনেক হয়েছে।'

রাত্তিরে ঘুমোবার আগে সুতপা বৃত্তান্তটা স্বামীকে জানাবে ভাবছিল। কিন্তু বিছানায় শুয়েই সুব্রত নিদ্রাচ্ছন্ন। মানুষটাকে ঘুম থেকে তুলে এই ঘটনা জানাবার এটাই কি সময়?

পরদিন অফিস থেকে ফিরে সুতপা দেখল সুব্রত টি. ভি.-র পর্দায় চোখ রেখে বসে আছে। মাঝে মাঝে নিজের মনে হাসছে। লোকটার কোনো ভাবান্তর, মানসিক পরিবর্তন তার চোখে পড়ল না। তবু এক সময় শুধোল, 'এই তোমাকে কেউ টেলিফোন করেছিল?'

'আশ্চর্য! গতকাল থেকে ওই একটা কথাই বলছ তুমি। শোনো তোমাকে কেমন শুকনো আর অবসন্ন লাগছে। বরং ব্যাংক থেকে দু'দিন ছুটি নিয়ে স্রেফ ঘুমিয়ে কাটিয়ে দাও। মনে হচ্ছে তোমার বিশ্রাম দরকার।'

আরও তিন-চার দিন কাটল। নাহ্! কোনো টেলিফোন কিংবা সুব্রতর নামে চিঠি এ বাড়িতে এসেছে কি না সুতপা বুঝতে পারছে না। আর ওই মানুষটা! কী নির্বিকার শান্ত আর হাসিখুশি। একটা প্রবঞ্চকের কাছ থেকে স্ত্রীর কলঙ্কের কাহিনি জেনেও অনায়াসে হাসছে, মজা করে কথা বলছে। কখনও টি.ভি.-র নব্ টিপে দেখছে।

দিন সাত অপেক্ষা করে সুতপা আর থাকতে পারল না। ব্যাংক থেকেই ফোন করল কেনউড কনস্ট্রাকশনের অফিসে। সুমন দত্তের খোঁজ করতেই সেই ভদ্রলোকের গলা। 'ভেরি স্যরি ম্যাডাম। সুমন দত্ত কয়েকদিন আগেই তো দিল্লি গেছে। এখানে চার-পাঁচ দিন ছিল আর এখন বোধহয় দিল্লিতেও নেই।'

'নেই মানে? কোথায় গিয়েছেন?'

সে বলল, 'যদ্দুর জানি কোম্পানি ওকে আবার বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছে। একটা বড় প্রজেক্টের কাজ চলছে কি না। অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার বলেই হয়তো পাঠাল। তবে ক্ষতি নেই। মোটা টাকা ওভারসিজ পে। আর এবার শুনেছি সাত বছরের কন্ট্র্যাক্ট।'

'কোথায় গিয়েছে জানেন?'

'হ্যাঁ জানি বৈকি, সেই মিডল ইস্টে। তবে এবার দুবাই নয়, —বাহারিন।'

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে সুতপা একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। সে মিথ্যে ভয় পেয়েছিল।

সুমন দত্তের কল আর কোনোদিন তার বাড়ির টেলিফোন যন্ত্রে ঝনঝন করে বেজে উঠবে না।

প্রেতশিলা



জীবন এক কাহিনি—৩

এক

সঙ্গে কেউ আসেনি। স্টেশনে তাকে গাড়িতে তুলে দিতে আসবে বাড়িতে এমন লোকও নেই। তবু মা একবার বলেছিল,—'হ্যাঁরে, হিতেনকে সঙ্গে নিয়ে যাবি? তাহলে ওকে ডেকে পাঠাই?'

হিতেন তার কোনো আত্মীয়-কুটুম্ব বা বন্ধু-বান্ধব নয়। এই পাড়ারই ছেলে। চাকরি-বাকরি নেই। অদ্যাবধি বঙ্গীয় বেকার সমিতির সদস্য। তবে ছেলেটা ভালো। বখাটে কিংবা অ্যান্টি-সোস্যাল নয়। একটু বেশি বকবক করে, ওই যা দোষ। সকাল-সন্ধে গলির মুখে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফোঁকে, বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে আড্ডা মারে। সরস্বতী পুজো অথবা এখানকার ছোটখাটো ফাংশনে জান লড়িয়ে খাটে। তবে হ্যাঁ, পাড়ার বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান দেয়, যা আজকালকার ছেলে-ছোকরার কাছে আশা করা ভুল। আব অবিনাশ তো একজন ইনটেলেকচ্যুয়াল। আপিসের ফাঁকিবাজ কেরানি নয়। কিংবা ছুটকো কারবারে দুটো পয়সা বেশি কামাতে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে না। সে একজন শিক্ষাব্রতী,—কলেজের অধ্যাপক। অনার্স ক্লাসে পড়ায়। তার হাতে কত সুপ্ত প্রতিভা শুধু পাপড়ি মেলে ফুটে ওঠার প্রতীক্ষায় রয়েছে। কতকটা সেই কারণে এই পাড়ায় তার মান-সম্মান এবং খাতিরটা অন্যদের চেয়ে বেশি।

হিতেনকে ডেকে পাঠালে নিশ্চয় আসত। ছেলেটা তাকে মান্য করে। রাস্তায় আচমকা দেখা হলে,মুখের সিগারেটটা সন্তর্পণে নামিয়ে আড়ালে রাখে। কোনো প্রয়োজনে খোঁজ করলে দৌড়ে হাজির হয়। অবিনাশ বাড়িতে না থাকলেও হিতেনের আসতে অসুবিধে নেই। তার মায়ের সঙ্গে দিব্যি গল্প করে। পাড়ার দুটো চুটকি মুখরোচক খবর দেয়। সময়ে এলে এক কাপ চা খায়। তার মাকে হিতেন মাসিমা বলে ডাকে।

প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে অবিনাশ সেই কথা ভাবছিল। হিতেনকে না এনে একরকম ভালো করেছে। ছেলেটা বড্ড বকে। ওই স্বভাব,—একটা কথার খেই ধরে নানা প্রসঙ্গে চিলের মতো চক্কর দিয়ে ফেরে। প্ল্যাটফর্ম থেকে গাড়ি ছাড়বার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত হিতেন কি তাকে নিস্তার দিত? অনর্গল ফড়ফড় করে বকত। আর কথা বলবার সময় উচিত-অনুচিতের সীমাজ্ঞান তার মগজে থাকে না। হয়তো তাকে জিজ্ঞাসা করত,—'আচ্ছা, এর আগে কখনও গয়া গিয়াছেন?' নইলে বলত—হঠাৎ গয়া যাচ্ছেন কেন অবিনাশদা?' তারপর ব্যাপারটা উপলব্ধি করেছে

এমনি একটা ভঙ্গি করে নিজেই উত্তর দিত,—'অ বুঝেচি। মেসোমশাইয়ের এখনও পিণ্ড দেওয়া হয়নি, তাই না?'

বাড়িটা হিদারাম ব্যানার্জি লেনে। গলি হলেও রাস্তাটা মোটামুটি চওড়া। একটা গাড়ি অনায়াসে ভেতরে ঢোকে। বিপরীত দিক থেকে রিকশা কিংবা ছোট সাইকেল ভ্যান এলে সহজে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। তবে ট্যাক্সি অথবা বড় গাড়ি হলে মুশকিল হয়। ওরই মধ্যে দু-একটা জায়গায় গলিটা আবার একটু বেশি প্রশস্ত। কিংবা যেখানে গলিটা প্রায় নদীর মতো বাঁক নিয়ে ফের অন্যদিকে চলে গেছে, সংঘর্ষ বাঁচিয়ে দুটো গাড়ি সেখানেই একে অপরকে অতিক্রম করে।

সন্ধের মুখে খালি ট্যাক্সি পাওয়া শক্ত। আর পেলেও হাওড়া স্টেশন যাবার নাম শুনলে ড্রাইভারের মুখ প্যাঁচার মতো বেজার হয়। যাত্রীকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে নাকের ডগা দিয়ে গাড়ি নিয়ে হুস করে বেরিয়ে যায়। তবু ছুটোছুটি করে অবিনাশ একটা ট্যাক্সি ধরল। ড্রাইভার লোকটি বয়স্ক। হাওড়া স্টেশনে যেতে হবে শুনে প্রথমে বিগড়ে গেল। বলল, পোলের মুখে জ্যামজট। একবার ফেঁসে গেলে নির্ঘাত তিন-চার ঘণ্টা ভোগান্তি। নিরুপায় হয়ে অবিনাশ পাঁচটি টাকা বেশি কবুল করল। আর তাইতেই মন্ত্রের মতো কাজ, ড্রাইভারের মুখে হাসি। সে মিটার ডাউন করে অবিনাশকে গাড়িতে উঠতে আহ্বান জানাল। গলির মুখে ঢুকতেই হঠাৎ লোডশেডিং হয়ে গেল। মুহূর্তে তামাম দুনিয়া অন্ধকার, যেন ঘোর অমাবস্যা। অথচ কলকাতায় বিনা নোটিশে অমন লোডশেডিং আকছার হচ্ছে। কিন্তু অবিনাশের হঠাৎ বেশ অস্বস্তি, কী একটা আশঙ্কায় মনটা কেঁপে উঠল। অন্ধকার সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠলে ডানদিকে অবিনাশের ফ্ল্যাট। প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে উপবে উঠে সে সজোরে দরজায় ধাক্কা দিল। ফের মাকে উদ্দেশ্য করে বার দুই-তিন চেঁচিয়ে ডাকতেই সুহাসিনী লণ্ঠন হাতে ছুটে এল। অন্ধকারে একা থাকলেই ছেলের কী যেন একটা হয়। মুখের দিকে তাকিয়ে সুহাসিনী সেটা টের পেল। তাই ছেলে ঘরে ঢুকতেই কাছে এসে বাহুতে, পিঠের নীচে সস্নেহে হাত বুলিয়ে শুধোল, —'কি রে, মুখটা অমন শুকনো কেন?'

অবিনাশ অস্বীকার করল,—'না, ও কিছু নয়।'

সুহাসিনী তেমনি আদর করে ভরসা দিল,—'ইস্টিশানে গেলেই দেখবি অনেক লোক। গাড়িতেও সব ভর্তি। সকালবেলায় গয়া পৌঁছে যাবি। কাজকর্ম সেরে আবার সন্ধেবেলাতেই ট্রেন, তাই না রে?'

অবিনাশ মাথা হেলিয়ে জবাব দিল,—'হ্যাঁ, সন্ধে সাতটায়। টাইম-টেবিলে তাই লেখা আছে।'

মুখ নামিয়ে মা ফিস ফিস করে বলল,—'দেখিস্ এবার ভয়-টয় সব কেটে যাবে। গয়াতে পিণ্ডি দিলেই আত্মার মুক্তি হয়। ব্যস্! স্বামী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন, —এই পৃথিবীর কোনো বন্ধন আর থাকল না।'

সিঁড়িতে আলো ফেলে মা তার সঙ্গে রাস্তা পর্যন্ত এল। সে উঠে বসতেই ট্যাক্সি স্টার্ট নিল। গলি ছাড়িয়ে আরও খানিকটা গিয়ে গাড়ি সেন্ট্রাল এভিনিউ ধরতেই ফের চারপাশে আলো জ্বলতে দেখা গেল।

সামনে দিল্লিগামী কালকা মেল দাঁড়িয়ে। ঘড়িতে সওয়া আটটা বাজে। গাড়ি ছাড়তে আর দেরি নেই। এরপর তার ট্রেন,—দেরাদুন এক্সপ্রেস। প্ল্যাটফর্মে সে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, চারপাশে অগুনতি লোক। মেয়ে-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ। বিছানা-বাক্স, লটবহর ছড়ানো। এই জনসমুদ্রের মাঝখানে দাঁড়িয়ে অবিনাশ একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। বাড়ি থেকে বেরোবার মুখে যে ভয়-ভয় ভাবটা হয়েছিল, তা আর নেই এখন। বেশ হৈ-চৈ, চেঁচামেচি। ঝলমলে নিওন আলো। হাওড়া স্টেশনে রাত-দিনের ফারাক কোথায়? মাঝে মাঝে ইঞ্জিনের তীক্ষ্ণ হুইসিল। হকারের আনাগোনা। ঠেলাগাড়িতে ডজনখানেক সুটকেস চাপিয়ে একজন লোক সেটা ঠেলতে ঠেলতে প্ল্যাটফর্মের আর এক প্রান্তে চলে গেল। গাড়ির চাকায় কর্কশ শব্দ। লোকটা তার অগ্রবর্তী লোকদের হুঁশিয়ার করে বলছিল,—'হট্ যাও। হট্ যাও।'

গয়া যাওয়ার ব্যাপারটা অবিনাশ কারও কাছে ফাঁস করেনি। কী প্রয়োজন? কেউ গয়া যাচ্ছে শুনলেই অনেক প্রশ্নের জট বেরিয়ে আসে। তাছাড়া মাত্র একটা দিন। কাজ সেরে আবার কাল রাত্তিরের ট্রেন ধরে ফিরে আসবে। সকাল সাতটায় গাড়ি হাওড়ায় পৌঁছোবার কথা। ঠিক টাইমে এলে বাড়ি ফিরে স্নানাহার সেরে ফের কলেজে রওনা হতে পারে।

অবশ্য দিন দশ আগেও গয়া যাওয়ার কথা সে চিন্তা করেনি। গত মঙ্গলবার সকালে মা হঠাৎ তাকে ডাকল,—'অবু, এদিকে শোন। তোর সঙ্গে একটু কথা আছে।'

চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে অবিনাশ একটা বইয়ের পাতায় চোখ বুলোচ্ছিল। অনার্সের ক্লাস। অনেক নতুন নতুন সাবজেক্ট এখন কোর্সের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে। তার সময়ে অনার্সে এসব ছিল না। পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ক্লাসে অল্পস্বল্প কিছু পড়েছিল। কিন্তু সেই বিদ্যেটুকু সম্বল করে ক্লাসে গেলে প্রতি পদে হোঁচট খাওয়ার সম্ভাবনা। তারপর এক নাজেহাল অবস্থা। মাস্টারের দুর্ভোগ দেখে ছাত্রছাত্রীরা মুখ টিপে হাসবে।

মায়ের কণ্ঠস্বর ঈষৎ চাপা। তার অর্থ মা কোনো গোপনীয় বিষয় আলোচনা করতে চায়। অগত্যা বইয়ের পাতা থেকে মুখ তুলে অবিনাশ এক মুহূর্ত ভাবল। ফের বইয়ের মলাট বন্ধ করে পায়ে চটি গলিয়ে পাশের ঘরে গেল।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে সুহাসিনী বলল,—'কাল ভটচায্ মশায় এসেছিলেন, বুঝলি?'

—'ভটচায্ মশায়?' অবিনাশ ব্যাপারটা ঠিক ধরতে না পেরে ফের চিন্তিত হল। এই সামান্য কথাটা বলার জন্য মা তাকে ডাকল? আর নারাণ ভট্‌চায্যি মশায়

তো ফি-মাসে একবার আসেন। পূর্ণিমার দিন এ বাড়িতে তাঁর সত্যনারায়ণ পুজো আছে। তাছাড়া প্রায়ই বিশেষ পালা-পার্বণে তাঁকে এখানে আসতে হয়। তাহলে?

মা আর ভনিতা না করে আসল কথাটা বলল,—'তুই একবার গয়া থেকে ঘুরে আয় অবু।'

—'গয়া!' অস্ফুটে কথাটা বলে অবিনাশ ভ্রূ কোঁচকাল।

ব্যাপারটা পাঁচকান না হলেই ভালো। সকালে বাড়িতে কাজের লোক আসে। তাই এদিক-ওদিক তাকিয়ে মা বোধহয় আর একটু সাবধানী হতে চাইল। ঈষৎ চাপা গলায় বলল,—হ্যাঁরে, গতকাল ভটচায্ মশায় এসেছিলেন। সব শুনে উনি এই মত দিলেন। বললেন, বৌমার আত্মার বোধহয় সদ্গতি হয়নি। নইলে প্রায় দু-বছর হতে চলল, এখনও তোর ভয়-ভয় ভাব গেল না। রাত্তিরবেলায় ভালো করে ঘুমোস্ কই? মাঝে-মাঝে কেন অমন চমকে উঠিস্ বল দিকি?'

অবিনাশ তেমনি ভ্রূ কুঁচকে প্রশ্ন করল,—'তুমি কি গয়াতে পিণ্ড দিতে বলছ?'

—'হ্যাঁ বাবা। আমাদের শাস্ত্রে তো তাই আছে। গয়াতে পিণ্ডদান না করলে আত্মার মুক্তি হয় না। বৌমার সন্তান থাকলে এ কাজ সে করত। কিন্তু ছেলেপুলে যখন হয়নি—তাছাড়া ভটচায্ মশায় বললেন, পিণ্ডদানের অধিকার নাকি তোর। বৌমার মুখাগ্নি যখন তোকেই করতে হয়েছিল অবু।'

মুখাগ্নি! অবিনাশের বুকের ভিতরটা ধক্ করে উঠল। নামমাত্র মুখে অবশ্য একটু আগুন ঠেকিয়ে দিতে হয়েছে। নইলে প্রথমে তো মালতীর মুখের দিকে তাকিয়ে অবিনাশ চেতনা হারিয়েছিল। আগুনে পোড়া ঝলসানো চামড়া। অমন সুন্দর কোঁকড়ানো কালো চুল পুড়ে বিবর্ণ ছাই। চোখের ঘন কৃষ্ণ ভ্রূ-যুগল নেই। উপরের পাটির সাদা দাঁতগুলো পোড়া ওষ্ঠের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে মালতীকে অমারাত্রিব প্রেতিনীর মতো দেখাচ্ছে। অবিনাশ ভাবতেও পারেনি, মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে একটা মিষ্টি নরম মেয়ে এমন বীভৎস রূপ নিতে পারে। তার চিৎকার শুনে যারা ছুটে এসেছিল, তারাই চোখে-মুখে জল দিয়ে, পাখার বাতাস করে অবিনাশের জ্ঞান ফিরিয়ে আনে। তারপর অবশ্য আর কিছু ঘটেনি। অবিনাশ হঠাৎ যেন শান্ত, বোবা হয়ে গিয়েছিল।

ভোর সকালেই পুলিশ এসে হাজির হল। আগুনে পুড়ে মৃত্যু, তার মানে আনন্যাচারল ডেথ কেস। তাই খবর যেতেই পুলিশের গাড়ি এসে দরজার সামনে দাঁড়াল।

ডেডবডি মর্গে পাঠানোর কথা। কিন্তু অবিনাশের বন্ধু-বান্ধব আর পাড়ার দু-একজন লোক অনেক করে বোঝাল। ভদ্রমহিলা কিছুদিন ধরে ভুগছিলেন। আর সাধারণ রোগ-অসুখ তো নয়। এ যেন জীবন্মৃত হয়ে থাকার পরোয়ানা। অবশ্য পুলিশ ইচ্ছে করলে লাশ ময়না তদন্তের জন্য পাঠাতে পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সেটা হবে মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা। তাছাড়া আত্মহত্যা করবার কথা তো ভদ্রমহিলা

অনেকবার বলেছেন। এটা সেই মনের ইচ্ছার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। তবু পাড়ার লোকজন কিংবা অবিনাশের বন্ধু-বান্ধবের কথায় পুলিশ ক্ষান্ত হয়নি। টাউন দারোগা ঘনশ্যাম ভৌমিক প্রকাশ্যেই বলল, 'স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে হঠাৎ একজন আত্মহত্যা করলে নানারকম সন্দেহ হতে পারে। তাই জল ঘোলা না করে উপায় নেই।'

শেষ পর্যন্ত অবিনাশের ফ্যামিলি ফিজিসিয়ান ডাঃ ঘোষ এসে সুইসাইডের কারণ ব্যাখ্যা করে বোঝালেন। এবং তাইতেই ফল হল। তাছাড়া মালতীর একটা শেষ জবানবন্দি তো ছিল,—তার এই পরিণতির জন্য কেউ দায়ী নয়।

অবশেষে ব্যাপারটা মিটে গেল। বেলা বারোটা নাগাদ পুলিশ ডেড-বডি ছেড়ে দিল। তারপর সকলে যা বলছে, কলের পুতুলেব মতো অবিনাশ শুধু তাই করল। তার সহকর্মী দ্বিজেন আর ডাঃ ঘোষ দাঁড়িয়ে থেকে সব ব্যবস্থা করলেন। আগুনে পোড়া মালতীর দেহখানা খাটে শোয়ানো হল। পাড়ার ছেলেরা কার বাগানের একরাশ ফুল ছিঁড়ে এনে মৃতদেহের উপর ছড়িয়ে দিল। দ্বিজেন কাকে যেন বাজারে পাঠিয়ে খই আর বাতাস আনাল। কোথা থেকে দু তিনজন লোক এসে খোল-করতাল বাজিয়ে হরিবোল ধ্বনি দিতে লাগল। ক্ষতস্থানের ওপর মলম লাগালে যেমন ঠান্ডা লাগে, যন্ত্রণার কিঞ্চিৎ উপশম হয়, মুহূর্তে মালতীর আত্মহত্যাজনিত আকস্মিক আঘাতটাও অনেকটা তেমনি সহনীয় মনে হল। সন্ধের একটু আগে গঙ্গেশ্বরী নদীর ধারে স্ত্রীকে সম্পূর্ণ দাহ করে অবিনাশ যখন ফিরে এল, তখন পশ্চিমের আকাশে সন্ধ্যাতারা জ্বলজ্বল করছে।

এই আকস্মিক দুর্ঘটনার কথা সে নিজে কাউকে জানাতে পারেনি। রসুলপুরের বাড়িতে মা একা। তার দাদা এখন কোচিনে পোস্টেড। ছেলেমেয়ে নিয়ে বৌদিও সেখানেই আছে। এমন একটা দুঃসংবাদ পেয়ে মা শুধু কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়বে। অথচ খবর শুনে আর কিছু করবার নেই। তবু দ্বিজেন এসে বলল,—'তোর শ্বশুরবাড়ির ঠিকানা দে। সেখানে একটা খবর পাঠানো উচিত।' অবিনাশ ঠিকানা জানাতেই সে কাকে যেন ডেকে পোস্ট-অফিসে একটা জরুরি টেলিগ্রাম করে আসতে বলল। তার শ্বশুরবাড়ি চেতলায়। শাশুড়ি বিধবা। বছরখানেক আগে শ্বশুর গত হয়েছেন। বড় শালা বিদেশে, বউ নিয়ে আমেরিকায় থাকে। মালতীর দুই দিদির অনেক আগেই বিয়ে হয়েছে। তাদের নিজেদের এখন বড় সংসার। ঘরদোর ফেলে মায়ের কাছে আসতে ফুরসৎ পায় না। ছোট ছেলে বি. এ. পড়ছে। সামনের বছর পরীক্ষা দেবে। শাশুড়ির কাছে চেতলার বাড়িতে সেই থাকে।

পরদিন সকালে মালতীর মা স্টেশনে গাড়ি থেকে নেমে প্রায় দৌড়ে এলেন। অবিনাশকে দেখে ডুকরে কেঁদে উঠে বললেন,—'হ্যাঁ বাবা, আমার মেয়ে আত্মহত্যা করল কেন? এমন স্বামী, ঘর-সংসার থাকতে তার কীসের দুঃখ ছিল?'

অবিনাশ চুপ। তার মুখ দিয়ে একটা শব্দও বের হয়নি। বরং শাশুড়ির সামনে

দাঁড়িয়ে তার নিজেকে একজন ডুবন্ত মানুষের মতো অসহায় মনে হচ্ছিল, তলিয়ে যাওয়ার আগে হাতের কাছে একটা খড়কুটো পেলেও মানুষ যেমন সেটা আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায়, অবিনাশও তেমনি একটা অবলম্বন খুঁজছিল। কিন্তু শাশুড়ির মুখের দিকে তাকিয়ে সে মূক হয়ে রইল। একটি কথাও বলতে পারল না।

বন্ধুর পক্ষে দ্বিজেন সওয়াল করল,—'মাসিমা, এ নিয়তি ছাড়া কিছু নয়। নইলে বৌদি এইভাবে সকলকে ফাঁকি দিয়ে যাবেন, আমরা কোনোদিন চিন্তা করতে পাবিনি। রোগের যন্ত্রণা সহ্য কবতে না পেরে মাঝে মাঝে আত্মহত্যার কথা বলতেন শুনেছি। কিন্তু তাই যে সত্যি হবে, একথা আমরা স্বপ্নেও ভাবিনি।'

সারারাত্তির দু চোখের পাতা বোজেনি। অবিনাশ একা নয়। হস্টেলেব তিনজন ছাত্র আর কলেজের এক বেয়ারা তার সঙ্গে পালা করে রাত জেগেছে। তবু মাঝে-মাঝে অবিনাশের কেমন অস্থির লাগছিল। শরীরে কী যেন একটা অস্বস্তি। গলার কাছে কিছু বোধহয় আটকে আছে। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। ছাত্ররা তাব গায়ে হাত রেখে দু-তিনবার জিজ্ঞাসা করল,—'অমন ছটফট কবছেন কেন স্যার? শরীর খারাপ লাগছে?'

ঘরের ভিতর চার ফুট বড় ল্যাম্পের আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যায়। সমস্ত রাত্তির অবিনাশ সুইচ অন করে রেখেছিল। ছেলেরাও আপত্তি কবেনি। গত রাত্রে এই বাড়িতেই একজন কাপড়ে কেরোসিন ঢেলে অগ্নিদগ্ধ হযে সুইসাইড করেছে। অন্ধকার হলেই একটা গা-ছমছমে ভাব। মনে হয় কাছেই যেন এক অশরীরীর উপস্থিতি। তাই স্বাভাবিক কারণেই ভয় হতে পারে।

শাশুড়ি প্রায় তখুনি স্টেশনে ফিরে গেলেন। দ্বিজেন অনেকবার বলেছিল, অন্তত এ-বেলা থেকে স্নানাহার করে যেতে। কিন্তু মালতীর মা আর একটি মুহূর্তও থাকতে রাজি হননি। তাঁর এক কথা—যাকে নিয়ে সম্পর্ক সেই যখন নেই, তখন মিছিমিছি আব এখানে পড়ে থেকে কী লাভ?

বেলা বারোটা নাগাদ অবিনাশও ঘরের দরজায় তালা দিয়ে দুর্গাপুরের বাস ধরতে বেরোল। দ্বিজেন সঙ্গে ছিল। বন্ধুকে বাড়ি যেতে সেই পরামর্শ দিয়েছে। এখন আর বাঁকুড়ায় থাকবার কোনো প্রয়োজন নেই। মৃতা স্ত্রীর পারলৌকিক কাজকর্ম সে দেশের বাড়িতেই করতে পারে। তাছাড়া ক'টা দিন মায়ের কাছে থাকলে অস্থির মন একটু শান্তি পাবে। আচমকা এই দুর্ঘটনায় অবিনাশ যে মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছে, হয়তো সেটা দ্রুত পুনরুদ্ধার সম্ভব।

অবিনাশ নিজেও এখান থেকে যাওয়ার জন্য ছটফট করছিল। দ্বিজেনের প্রস্তাব তাই যে লুফে নিল। আসলে প্রতাপ বাগানের বাড়িতে আর একটি রাত্তিরও কাটাতে তার সাহসে কুলোবে না। অন্ধকার হলেই ভয়-ভয় ভাব। গলার কাছে কী যেন আটকে আছে মনে হয়। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট। আর সমস্তক্ষণ আলো জ্বালিয়ে ছাত্ররা কি পালা করে রাজ জেগে তাকে পাহারা দেবে? না সেই কথা মুখ ফুটে বলা যায়?

বাঁকুড়ায় ছেলের বাসায় এত যে সব কাণ্ড ঘটে গেছে সুহাসিনী তার বিন্দুবিসর্গও জানত না। ছেলেকে অমনি শুকনো মুখে উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা নিয়ে একলা বাড়ি ঢুকতে দেখে ভয়ে তার বুকের ভিতরটা হিম হয়ে এল। অনেকক্ষণ মুখ দিযে বাক্য সরেনি। গায়ের জামা খুলে ধপ করে একটা চেয়ারে বসে অবিনাশ নিজেই বলল,—'তোমার বৌমা পরশু রাত্তিরে হঠাৎ—'

ছেলের মুখ থেকে বাকিটুকু শোনাব আগেই সুহাসিনী সব বুঝতে পাবল। চোখ দুটি বিস্ফারিত কবে সে জিজ্ঞাসা করল,—'কেন, কী হয়েছিল তার? বল অবু, চুপ করে থাকিস্ নে।'

অবিনাশ মুখ নীচু কবে বলল,—'কিছু হযনি। নিজের শাড়িতে কেরোসিন ঢেলে মালতী সুইসাইড কবেছে। তার আগে একটা কাগজে লিখে রেখেছিল, এই পরিণতির জন্য কেউ দায়ী নয়।'

সুহাসিনী অস্ফুটে বলল,—'আত্মহত্যে! বৌমা শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যে করল?'

অবিনাশ চুপ। কোনো জবাব দিল না। গভীর শোকাহত মূর্তির মতো স্থির দৃষ্টিতে সে অসীম নীলাকাশেব দিকে তাকিযে রইল।

দুই

ঠিক সাড়ে নটায় দুন এক্সপ্রেস গতিশীল হল। তার গাড়িতে গয়ার লোকজন বেশি। কে একজন বলল, এটা গয়া কোচ। তার মানে স্টেশনেই বগিটা কেটে রেখে দেবে। সকালবেলায় ঘুম না ভাঙলেও ক্ষতি নেই। কামরা তো গয়াতেই পড়ে থাকছে।

থ্রি-টায়ার স্লিপার। গাড়ির মধ্যে আলো জ্বলছে। ট্রেন খানিকটা দূরে যেতেই যাত্রীরা সব তক্তার ওপর চাদর-বালিশ পেতে শোবার আয়োজন করল। শিয়রে মালপত্র রেখে কেউ বা নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে চাইছে। দু-একজন যাত্রী ব্যাগ থেকে খাবার কৌটো বের করে নৈশাহার সেরে নিল। অবিনাশের লোয়ার বার্থ। অক্টোবরের মাঝামাঝি। কলকাতায় এখনও শীত পড়েনি। বরং গরম বলা যায়। কিন্তু হাজারিবাগ জেলায় বিশেষত কোডারমায় নাকি শেষ রাত্তিরে বেশ ঠান্ডা। মা একটা মোটা চাদর সঙ্গে দিয়েছে। সেটা পায়ের কাছে। প্রয়োজন হলে গায়ের ওপর টেনে নেবে। জানালা দিয়ে এখন বেশ ফুরফুরে হাওয়া। তবু কী যেন একটা গূঢ় কারণে অবিনাশ কাচের শার্সিটা টেনে দিল।

রাত এগারোটার কিছু পরেই গাড়ি বর্ধমান পেরিয়ে গেল। পিলে-ওঠা পেটের মতো হাওয়া-ভর্তি বালিশে মাথা রেখে অবিনাশের হঠাৎ বিশাখার কথা মনে পড়ল। বর্ধমানে কার্জন গেটের কাছে বিশাখা একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকে। এখানকাব উইমেন্স কলেজের অধ্যাপিকা। কলকাতায় তারা একই ইয়ারে এম. এ পড়ত। শুধু সাবজেক্ট আলাদা। বিশাখার ইকনমিকস্, তার ইংরেজি সাহিত্য।

অ্যালবাম খুলে পুরোনো দিনের ছবি দেখার মতো পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ক্লাসের হাসি-তরল দিনগুলির স্মৃতি মাঝে-মাঝে তার ভাবতে ভালো লাগে। জীবন ছিল তখন টগবগে তেজি ঘোড়ার মতো, বেপরোয়া, দুরন্ত। দু' চোখে অজস্র স্বপ্ন। আর এই ক-বছরে আকাশের সেই রংটা যেন সম্পূর্ণ বদলে গেল। জীবন এখন একটা ভারবাহী জন্তু,—ধীরপদ, মন্থর। ফি-বছর ক্লাসে ঢুকে অজস্রবার আওড়ানো সেই একই বিষয়ের ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তি। সকাল-সন্ধে প্রতিক্ষণ বৈচিত্র্যহীন একরঙা রুটিনে পর্যবসিত।

মফস্সলের কলেজ থেকে পাশ করলেও অনার্সে তার পরীক্ষার ফল বেশ ভালো হয়েছিল। সে বছর ফার্স্ট ক্লাস কেউ পায়নি। অবিনাশ সেকেন্ড ক্লাস থার্ড। প্রথম দিন ক্লাসে অধ্যাপক মজুমদার প্রত্যেকের নাম ধরে ডেকে রোলকল করলেন। শুধু তাই নয়, বি. এ পরীক্ষায় কার কেমন রেজাল্ট হয়েছিল তাও বেশ আগ্রহ

সহকারে শুধোলেন। অবিনাশ মফস্‌সলের কলেজ থেকে এমন ভালো ফলাফল করেছে জেনে তাঁকে রীতিমতো খুশি মনে হল। ক্লাস শেষ হতেই অবিনাশ দেখল তাকে নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বেশ একটা গুঞ্জন শুরু হয়ে গেছে। অনেকেই তার সঙ্গে যেচে আলাপ করল। কোথায় থাকে জানতে চাইল। ক্লাসে তার প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা অনেকটা ভিনি-ভিডি-ভিসির পর্যায়ে পৌঁছে গেল।

বিশাখার সঙ্গে তার পরিচয় হল আরও কিছুদিন পরে। কলকাতায় অবিনাশ এসে উঠেছিল শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের মেসে। দোতলায় কোণের দিকে ছোট ঘর। দিনের বেলাতেই ভালো করে আলো ঢোকে না। ঘরে দুটো ছোট জানালা। তার একটা নোনাধরা দেয়ালের পাশে। জানালা খুলে দাঁড়ালেই পাঁচিলের খসে-পড়া চুনবালি চোখে পড়ে। আর একটা জানালা পশ্চিমে। বেলা চারটের পর অস্তসূর্যের ক্ষীণরশ্মি বাতায়নের ফাঁক দিয়ে স্বল্পক্ষণের জন্য এই ঘরে ঢোকে।

মাসখানেক না যেতেই ইকনমিকস্ ডিপার্টমেন্টের কী যেন একটা ফাংশন হল। যতদূর মনে পড়ে সেটা নবীন-বরণ গোছের কোনো অনুষ্ঠান। তার সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের আবৃত্তি-নাচ-গান। কিন্তু সেটা মুখ্য আকর্ষণ নয়। আসল ব্যাপারটা হল ফাংশনে নাকি একজন নামী শিল্পী পপ্-সং গেয়ে শোনাবেন। সেই ভদ্রমহিলাকে এমনি ছোট্ট আসরে পাওযা নিতান্ত ভাগ্যের কথা। বড় বড় ফাংশনে তাঁর গান শুনতে হাজার হাজার লোক সাগ্রহে অপেক্ষা করে থাকে। নেহাত সিক্সথ্ ইয়ার ক্লাসের কোন ছাত্রের দাদার সঙ্গে নাকি এই ভদ্রমহিলার বেশ খাতির আছে। সেই সুবাদে যোগাযোগ। তাই ইউনিভার্সিটির এমনি একটা ছোট অনুষ্ঠানে তিনি গাইতে রাজি হয়েছেন।

ফাংশনে গিয়ে বিশাখার সঙ্গে প্রথম আলাপ। হলঘরে ঢুকতেই তাদের ক্লাসের চন্দনা সেনের মুখোমুখি। মুচকি হেসে সে জিজ্ঞাসা কবল,—'কী ব্যাপার? ভালো ছেলে হঠাৎ পপ্ সঙেব আসরে?'

—'কেন, ভালো ছেলেদের বুঝি গান শোনা নিষেধ?' অবিনাশের পাল্টা জবাব।

—'নিষেধ থাকবে কেন?' চন্দনা মুচকি হেসে বলল, —'তবে গানেব আসবে সময় নষ্ট করলে আখেরে ক্ষতি হতে পারে।'

অবিনাশ এতক্ষণ লক্ষ করেনি। চন্দনাব ঠিক পাশে দাঁড়িয়ে আর একজন সাগ্রহে তাদের কথা শুনছে। মেয়েটি খুব লম্বা নয়, মাঝারি উচ্চতা। চন্দনার চেয়ে সামান্য খাটো। তবে উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। মাথায় এক ঢাল ঈষৎ কুঞ্চিত কালো কেশ। আয়ত চোখ। কিন্তু সেই দুটি নয়নের বৈশিষ্ট্য হল ভিতরের সাদা অংশের ওপর যেন একটা নীলচে আভা ছড়িয়ে আছে। সচরাচর যা দেখা যায় না।

চন্দনা তার অন্যমনস্কভাব টের পেয়ে নিজেই বলল,—'এসো, তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। আমার বন্ধু বিশাখা রায়—ইকনমিকসের ছাত্রী। স্কটিশে দুজনে একসঙ্গে পড়েছি।'

অবিনাশ হাত তুলে নমস্কার করল। রীতিমাফিক বিশাখাও প্রতিনমস্কার জানিয়ে মৃদু হাসল।

চন্দনা রীতিমতো ভনিতা করে বলল,—'অবিনাশের সম্বন্ধে অনেক কথা জানাবার আছে। হি ইজ এ ব্রিলিয়্যান্ট স্টুডেন্ট। আমাদের ক্লাসের ভালো ছাত্র। মফস্‌সল কলেজ থেকে সেকেন্ড ক্লাস থার্ড হয়েছে। প্রফেসর মজুমদার তাই বলেছেন, এম এ. তে ও নিশ্চয় ফার্স্ট ক্লাস পাবে।'

—'মোটেই না।' অবিনাশ প্রায় প্রতিবাদ জানাল। 'প্রফেসর মজুমদার আদৌ সে কথা বলেননি। উনি শুধু আশা করেন যে এম. এ. তে আমি আরও ভালো রেজাল্ট করব।'

চোখ ঘুরিয়ে চন্দনা জবাব দিল,—'তার মানেই ফার্স্ট ক্লাস। ভালো রেজাল্ট আর কাকে বলে?' ফের বিশাখাকে লক্ষ করে বলল, 'কি রে আমি ঠিক বলেছি না?'

আড়চোখে অবিনাশে দিকে তাকিয়ে বিশাখা বুঝতে পারল বেচারি রীতিমতো অস্বস্তিতে রয়েছে। তাকে উৎসাহিত করবার জন্য সে বলল,—'এতে লজ্জা পাবার কী আছে? প্রফেসর মজুমদার নিশ্চয় আপনাকে ফার্স্ট ক্লাস পাওয়ার যোগ্য ভেবেছেন। সেটাই উনি আশা করেন।'

চন্দনা আরও কী যেন বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু সেই মুহূর্তে হলঘরের আলো নিভে গেল। অনুষ্ঠান শুরু,—তাই বচসা মুলতুবি রইল। ওরা তাড়াতাড়ি পছন্দমতো তিনটি আসন সংগ্রহ করে বসে পড়ল।

ফাংশন শেষ হতে রাত্তির আটটা বাজল। হল থেকে বেরিয়ে তিনজনে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। চন্দনা শ্যামবাজারে থাকে। ফাঁকা লাইনে তিনচক্ষু দানবের মতো একটা ট্রাম দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছে। তাই দেখে সে ব্যস্ত হয়ে বলল—'এই, আজ তাহলে আসি। আরও রাত্তির করে ফিরলে মা কিন্তু আস্ত রাখবে না।'

চন্দনা ট্রামে উঠে চলে গেল। এখন শুধু বিশাখা আর সে। অবিনাশ শুধোল, —'আপনি কোনদিকে যাবেন?'

—'আমহার্স্ট স্ট্রিট।' বিশাখা মুখ তুলে তাকাল। বলল,—'কাছেই বাড়ি। এইটুকু পথ আমি হেঁটে যাই-আসি।'

—'চলুন তাহলে। আমি ওদিকেই যাব।' অবিনাশ জানাল।

—'আপনি এদিকেই থাকেন নাকি?' বিশাখা গ্রীবা বাড়িয়ে শুধোল।

—'না।' অবিনাশ মৃদু হাসল। বলল—'আমি একটা মেসে থাকি। শ্রীগোপাল মল্লিক লেনে।'

মির্জাপুর স্ট্রিট ধরে দুজনে হাঁটতে লাগল। এদিকটা বেশ জমজমাট হয়ে উঠেছে। বাঁ দিকে ফুটপাত ঘেঁষে সারবন্দি দোকান। কিন্তু বেশির ভাগ তাঁতের কিংবা ছাপা শাড়ির। ছিট কাপড়ের দোকানও অনেক। এখনও কিছু দোকান খোলা। দু-এক জায়গায় রেডিমেড জামাটামা বিক্রি হচ্ছে। গোলদিঘির শেষের পথের মোড়ে কয়েকটা রকবাজ ছেলে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছিল। তাদের একজন বিশাখার দিকে ভাদুরে কুকুরের মতো সতৃষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে ফের নিজেদের মধ্যে কী যেন বলাবলি শুরু করল।

শুক্লপক্ষ। বোধহয় দশমী তিথি। কানাভাঙা একটা উজ্জ্বল চাকতির মতো আকাশে রুপোলি চাঁদ। বিকেলের দিকে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। তাই আকাশ ফটফটে নীল। পেঁজা তুলোর মতো সাদা সাদা টুকরো মেঘ বাতাসে ভেসে যাচ্ছে। ডানদিকে কর্পোরেশনের বাড়িটা পিছনে ফেলে আরও কিছু দূরে গিয়ে বিশাখা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল,—'শ্রীগোপাল মল্লিক লেনটা কোথায়?'

—'বেশি দূরে নয়।' অবিনাশ এক মুহূর্ত চিন্তা করে ফের বলল,—'একটু আগে ডান দিকে যে গলিটা ছেড়ে এলাম ওটা ধরে ভিতরে ঢুকতে হয়। তবে কাছেই, ইউনিভার্সিটি থেকে বড়জোর মিনিট দশ লাগে।'

বিশাখা ভ্রূ কুঁচকে কী যেন ভাবল। পরে অপাঙ্গে অবিনাশের মুখের ওপর এক পলক দৃষ্টি বুলিয়ে শুধোল,—-'আচ্ছা, আপনি কি পড়াশুনো নিয়ে খুব ব্যস্ত থাকেন?'

—'কেন বলুন তো?'

—'শনিবার বিকেলের দিকে একটু সময় দিতে পারবেন?'

—'হয়তো পারব। কিন্তু কী হেতু, তাই তো এখন বলেননি।'

'হেতু সামান্য, তবে অহেতুক নয়।' বিশাখা আড়চোখে তাকিয়ে সুন্দর একটি ভ্রূভঙ্গি করল। ফের হেসে বলল,—'মাসে দুটো শনিবার আমাদের একটা ছোটখাটো আসর বসে। যার যা ইচ্ছে তাই করে। কেউ গান, কেউ আবৃত্তি, কেউ কবিতা। কেউ বা ছোট গল্প লিখে এনে পড়ে শোনায়।'

—'এ বিউটিফুল আইডিয়া।' অবিনাশ প্রশংসায় সোচ্চার হল। ফের শুধোল, —'এমন সুন্দর পবিকল্পনা প্রথম কার মাথায় এল জানতে পারি?'

—'সেটা অপ্রয়োজনীয়।' বিশাখা মুখ ফিরিয়ে যেন ইচ্ছে করেই জবাবটা এড়িয়ে যেতে চাইল।

—'বুঝতে পেরেছি।' অবিনাশ হেসে বলল,—'আইডিয়াটা তাহলে আপনার? কিন্তু রিয়েলি, এর জন্য আপনাকে তারিফ করতে হয়।'

বিশাখা লজ্জা পেল। কর্ণমূলে ঈষৎ রক্তোচ্ছ্বাস। মৃদু হেসে সে বলল,—'এই সামান্য ব্যাপারে এত প্রশংসা করতে নেই। তাছাড়া সকলের সহযোগিতা পেয়েছি বলেই তো বছরখানেক ধরে এই আসর নিয়মিত বসছে।'

—'বলেন কী? আপনার আসরের বয়স এক বছরের বেশি?'

—'হ্যাঁ নিশ্চয়। বিশাখা সগর্বে তাকাল। ফের হেসে বলল,—'স্কটিশে পড়বার সময় প্রথম এটা চালু করি। তারপর এতদিন একইভাবে চলে আসছে। এখনও বন্ধ হয়নি।'

—'সত্যি, আপনাকে আবার প্রশংসা না করে পারছি না।' অবিনাশ যেন স্তুতি করল। বলল,—এই আসরের সভানেত্রী নিশ্চয় আপনি?'

—'মোটেই না।' বিশাখা পরিষ্কার উত্তর দিল। বলল,—'বরং আমাদের আসরের একজন সভাপতি আছেন।'

—'সভাপতি?' অবিনাশ ভ্রূ কুঁচকে তাকাল। 'কী নাম তাঁর?'

—'তাঁর নাম শ্রীঅরূপ চৌধুরি। আমরা অরূপদা বলে ডাকি। উনি ইকনমিকসের সিক্সথ্ ইয়ার ক্লাসের ছাত্র। আপনার মতোই ব্রিলিয়্যান্ট স্টুডেন্ট। অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট।'

শুনে ফিউজ হওয়া বাল্‌বের মতো অবিনাশ হঠাৎ নিষ্প্রভ হয়ে গেল। অরূপ চৌধুরির তুলনায় তার পরীক্ষার ফল যে সাদামাটা তা বুঝতে কারও অসুবিধে হয় না। নেহাত ভদ্রতা করেই বিশাখা তাকে অরূপ চৌধুরীর সমপর্যায়ভুক্ত ভালো ছাত্র বলে চিহ্নিত করেছে। নইলে অনার্সে সোনার মেডেল পাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। আসলে অবিনাশকে নিয়ে প্রফেসর মজুমদার সেদিন একটু বাড়াবাড়ি করেছিলেন। এমনও হতে পারে ওটা নিছক কৌতূহল। মফঃস্বল থেকে মোটামুটি ভালো রেজাল্ট করেছে বলেই প্রফেসর তার সম্বন্ধে কিছু খোঁজখবর নিয়েছেন।

আমহার্স্ট স্ট্রিটে এসে পৌঁছতেই বিশাখা বলল,—'আমি এবার ডান দিকে যাব, আপনি?'

অবিনাশ ভ্রূকুঞ্চিত করল। সত্যি কথা স্বীকার করলে তার এদিকে আসা একটা অছিলা মাত্র। সামান্য প্রয়োজন হয়তো আছে, কিন্তু সেটা এমন কিছু জরুরি নয় যে তার জন্য এত রাত্তিরে পূরবী সিনেমার কাছে সেই দূর-সম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়িতে খোঁজখবর নিতে হবে। আসলে কিছুক্ষণের জন্য একান্তে বিশাখার সঙ্গ পাওয়ার লোভেই সে এই পথটুকু তার পাশাপাশি হেঁটে এসেছে। অবিনাশের ইচ্ছে করছিল আমহার্স্ট স্ট্রিট বরাবর বিশাখার সঙ্গে আরও কিছু দূর যায়। তাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসে। কিন্তু সে কথা মুখ ফুটে বলা চলে না। বিশাখার সঙ্গে তার মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে পরিচয়। আর এখনই যদি সে এমন একটা অশোভন গায়ে-পড়া ভাব করে তাহলে বিশাখা কী ভাববে?

একটা ঢোক গিলে অবিনাশ বলল—'পূরবী সিনেমার কাছে আমার এক আত্মীয়ের বাড়ি। একবার সেখানেই যাবে।'

বিশাখা বলল,—'তাহলে সামনের শনিবার বিকেল চারটেয় আমাদের আসরে আসছেন তো?'

'ইচ্ছে ষোলো আনা। শনিবারের আসরের নিয়মিত সদস্য হতে সে এখনই রাজি। কিন্তু আদেখলের মতো সে কথা প্রকাশ করে অবিনাশ নিজের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করল না। এক মুহূর্ত চিন্তা করে ছদ্ম গাম্ভীর্যের সঙ্গে সে জবাব দিল,—'খুবই চেষ্টা করব।'

—'চেষ্টা নয়। অবশ্য আসবেন।' বিশাখা প্রায় আবদেরে গলায় ফের বলল—'না এলে মনে করব আপনি মিছিমিছি একটু আগে আমার প্রশংসা করছিলেন।'

—'মিছিমিছি নয়।' অবিনাশ তাকে আশ্বস্ত করল। ফের বলল,—'আপনার এই সাধু প্রচেষ্টাকে সবাই অভিনন্দন জানাবে।'

বিশাখাকে উৎফুল্ল দেখাল। সে মুচকি হেসে বলল,—'এবার আসর বসছে

আমাদের বাড়িতে। একশো' তেত্রিশ নম্বর আমহার্স্ট স্ট্রিট। বাড়ির নম্বরটা মনে থাকবে আশা করি? সামনের দরজায় নেম-প্লেটে আমার বাবার নাম লেখা,—মিঃ ডি রায়।'

—'কোনো চিন্তা নেই।' অবিনাশ প্রায় ঘোষণা করল। 'শনিবার বিকেল চারটের আগেই আমি একশো' তেত্রিশ নম্বর বাড়ির দরজায় পৌঁছে যাচ্ছি।'

বিশাখা চলে যাবার পর অবিনাশ অনেকক্ষণ ইতস্তত ঘুরে বেড়াল। শেষে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে ঢুকে একটা খালি বেঞ্চে চুপ করে বসল। আশ্বিনের শুরু। অবিনাশ তাকিয়ে দেখল পার্কের কোণে একটা শিউলি গাছে অজস্র কুঁড়ি। কয়েকটা ফুল ইতিমধ্যেই টুপ টুপ করে ঝরে পড়েছে। আরও রাত্তির হলে অনেক কুঁড়ি ফুটবে। ভোর না হতেই শিউলিতলায় ফুল নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু হয়ে যাবে।

অবিনাশের মনে পড়ল তাদের রসুলপুরেব বাড়িতেও উঠোনের এক কোণে একটা বড় শিউলি গাছ আছে। আশ্বিনের শুরুতে সে গাছেও নিশ্চয় এখন অজস্র কুঁড়ি। সন্ধেবেলায় তার মা শিউলিতলায় একটা পরিষ্কার কাপড় পেতে দেয়। সমস্ত রাত্তির ধরে চুঁইয়ে পড়া জলের মতো কাপড়টার ওপর টুপ টুপ কবে ফুল ঝরে পড়ে। ভোর না হতেই মা বাসি কাপড় ছেড়ে একটা বড় সাজি হাতে ছুটে আসে। মাটির ওপর বিছানো কাপড়টা তুলে ফুলগুলো নিয়ে যায়।

পার্কের বেঞ্চিতে বসে সে ফের বিশাখার কথা ভাবছিল। পাতলা ছিপছিপে, গায়েব রং রীতিমতো ফর্সা। সামনের দিকে চুলগুলি ঈষৎ কুঞ্চিত। কপালের ভ্রূ যুগল যেন কোনো নিপুণ শিল্পীর তুলির টান। ঈষৎ উঁচু একসার শুভ্র দন্তপঙ্‌ক্তি। একটু আগে বিশাখা হাসতেই সেগুলি যেন ঝিকমিকিয়ে উঠল।

অবিনাশ চিন্তা করল শনিবারের আসরে তার কী ভূমিকা হবে? কেবলমাত্র শ্রোতা? অবশ্য বিশাখা তাকে গান, আবৃত্তি, কিংবা কোনো কবিতা অথবা গল্প-টল্প লিখে আনতে বলেনি। এমনও হতে পারে প্রথম দিন বলে বিশাখা তাকে ইচ্ছে করেই আর বিব্রত করতে চায়নি। তাছাড়া অবিনাশ যে ঠিক যেতে পারবে, তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? সে শুধু যেতে চেষ্টা করবে বলেছিল। আর বিশাখা তাকে শনিবারের আসরে উপস্থিত হতে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। অর্থাৎ ওই দিনের আসরে সে একজন অতিথিমাত্র। সুতরাং তার পক্ষে কোনো ভূমিকা নেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না।

মেসে ফিরতে রাত্তির দশটা বাজল। তার রুম-মেট সুকোমল মিত্তির বিছানায় শুয়ে একটা মোটা বইয়ের পাতায় চোখ বুলোচ্ছিল। সুকোমল বট্যানি নিয়ে পড়ছে। সিটি কলেজ থেকে পাশ। মেদিনীপুরের কাছে কোথায় যেন বাড়ি। সিরিয়াস ছাত্র। তার পড়ুয়া জীবন রুটিনমাফিক। ঘুম থেকে উঠে হালকা একটু ব্যায়াম করে। চা-টোস্ট অথবা অন্য কিছু খায়। তারপর দু-ঘণ্টা পড়াশুনো। এরপর স্নান-আহার। সায়েন্স কলেজে বেরোবার আগে খবরের কাগজটায় একবার চোখ বুলিয়ে নেয়। বিকেলে ক্লাস থেকে মেসে ফিরে কিছু টিফিন করে। তারপর প্রতিদিন গোলদিঘিটা চার-পাঁচবার পরিক্রমা করা তার নিত্যকার অভ্যেস। সন্ধের পর ফের বই নিয়ে

বসে। রাত দশটার আগে আসন ছেড়ে সচরাচর ওঠে না।

তাকে দেখেই সুকোমল বলল,—'কী ব্যাপার মশায়? বিকেল চারটে থেকে নিপাত্তা। এত রাত্তির অব্দি ছিলেন কোথায়?'

অবিনাশের ইচ্ছে করছিল উত্তরে শুধু একটু মুচকি হাসে। একটা রহস্যের সৃষ্টি করে। তারপর সুকোমল চাপাচাপি করলে আজকের সন্ধের মনোরমা অভিজ্ঞতার কথা ধীরে ধীরে বলবে। ঠিক একটা রূপকথার কাহিনি। সেই কুঁচবরণ রাজকন্যা আর তার মেঘবরণ চুল। হ্যাঁ, আজই তো সেই রাজকন্যার সঙ্গে প্রথম দেখা। অদূর ভবিষ্যতে ওই মেয়ে এবং তার একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠা কিছু বিচিত্র নয়। সুকোমলকে কৌতূহলী করে তুলতে সে বেশ রং চড়িয়ে, আরো মজা করে সমস্ত ঘটনা বলবে। কিন্তু রুম-মেটের মুখের দিকে তাকিয়ে অবিনাশ কেমন যেন মিইয়ে গেল। সুকোমল বট্যানি নিয়ে পড়ে ঠিক। কিন্তু আজ পর্যন্ত তার মুখ থেকে একটা ভালো ফুলের নাম, সেই পুষ্পের সৌন্দর্যের কথা অবিনাশ শোনেনি। এই লেখাপড়ার জগৎ ছাড়া যে আর একটা মধুর পৃথিবী আছে, সুকোমল বোধহয় তার খোঁজ রাখে না। আসলে মানুষটা শুধু হিসেবি, রসকষহীন। সহপাঠিনীর বন্ধুত্ব, কিংবা একটি মেয়ের মিষ্টি হাসি তার মনে কোনো প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে না। হয়তো বা সেটা অর্থহীন ভাবে।

অন্যদিকে তাকিয়ে অবিনাশ অম্লানবদনে মিথ্যাভাষণ করল,—'ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে এক আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। উঠি-উঠব করে দেরি হয়ে গেল।'

'তাই বলুন।' সুকোমল যেন আশ্বস্ত হয়েছে মনে হল। ফের বলল,—'আমি ভাবছি এত রাত্তির অব্দি আপনি ছিলেন কোথায়?'

শনিবার দিন সকাল থেকেই মনটা যেন বিক্ষিপ্ত হয়ে রইল। কেমন একটা অস্থির ছটফটানি। যতক্ষণ না সেখানে গিয়ে পৌঁচচ্ছে, ততক্ষণ এই অস্বস্তির হাত থেকে রেহাই নেই। অবশেষে বেলা তিনটে বাজতেই সে তাড়াতাড়ি তৈরি হতে শুরু করল। অন্যদিন সকালেই দাড়ি কামায়। আজ আর সেটা করেনি। বিকেলে বেরোবার আগে কামিয়ে নেবে ভেবেছিল। এখন তাই সেফটি রেজার বের করে দ্রুত ক্ষৌরকর্ম সমাধা করতে লাগল। আগের দিন লন্ড্রি থেকে কাচানো জামাকাপড় আনা ছিল। কামানো শেষ হতেই মুখহাত ধুয়ে পাটভাঙা ধুতি আর ধোপদুরস্ত পাঞ্জাবি পরে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

চুল-টুল আঁচড়ে নিজেকে বেশ পরিপাটি করে সাজিয়ে নিল অবিনাশ। মুখে একটু স্নো-পাউডার দিলে হয়তো আর একটু স্মার্ট লাগত। কিন্তু এখানে ওসব জিনিস পাবে কোথায়? তবে ভাগ্যিস সুকোমল ঘরে নেই। শনিবার তার প্র্যাকটিকাল ক্লাস থাকে। ফিরতে পাঁচটা বেজে যায়। সেটা সুবিধে। নইলে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে এমন ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে লক্ষ করছিল অবিনাশ। সুকোমল থাকলে নিশ্চয় আড়চোখে বারবার তাকাত। তারপর হয়তো জিজ্ঞাসা করত,—'কী

ব্যাপার মশায়? বিয়ে বাড়িতে নেমন্তন্ন আছে নাকি?'

বিশাখাদের বাড়িটা রাস্তার ঠিক ওপরে নয়, একটু ভিতরে। খুঁজে বের করতে অবিনাশের তেমন অসুবিধে হয়নি। তবে চারটে বাজতে দেরি দেখে সে ইচ্ছে করেই দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল না। পনেরো-বিশ মিনিট আগে ফাঁকা আসরে গিয়ে বসলে নিজেকে ভারি বোকা-বোকা লাগে। অবিনাশ যখন এসে পৌঁছল, তখন আসর জমজমাট। বোধহয় সকলেই হাজির। প্রায় চোদ্দো-পনেরো জন ছেলেমেয়ে। বাড়ির দরজার সামনে একটা সবুজ রঙের-অ্যামবাসাডর দাঁড়িয়ে। সম্ভবত সদস্যদের কেউ গাড়ি হাঁকিয়ে আসরে যোগ দিতে এসেছে।

তাকে দেখে বিশাখা সাদর অভ্যর্থনা করল,—'এই যে আসুন, আসুন। আমি অনেকক্ষণ থেকেই ভাবছি আপনার দেরি হচ্ছে কেন?'

—'দেরি কোথায়?' অবিনাশ হাতঘড়ির দিকে এক পলক তাকিয়ে সহাস্যে বলল,—'এই মাত্র চারটে বাজল।'

—'আরি বাপস্।' পাশ থেকে কে একজন মন্তব্য করল, 'আপনি দেখছি ভীষণ পাংচ্যুয়াল।'

শুনে বিশাখা মুচকি হাসল। ফের সকলকে উদ্দেশ্য করে বলল,—'এতক্ষণ এর কথা বলছিলাম। অবিনাশবাবু, ইংরেজির ছাত্র। আমাদের চন্দনার ক্লাস-ফ্রেন্ড।' অবিনাশ হাত তুলে নমস্কার জানাল। আড়চোখে বিশাখার দিকে তাকিয়ে সে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। না, মেয়েটার সত্যি কাণ্ডজ্ঞান আছে। চন্দনা হলে নির্ঘাত একগুচ্ছের কথা বলত,—'দারুণ ভালো ছেলে। এম এ. তে ফার্স্ট ক্লাস সিওর।' তারপর সবাই মিলে তাকে নিয়ে খানিকটা মজা করত। সামনে বাহবা দিত, আড়ালে অযথা টিপ্পনি কাটত।

ঘরের মধ্যে একটা বড় শতরঞ্জি পাতা। তার উপর সাদা চাদর বিছানো। মাঝখানে ফুলদানিতে দীঘল রজনিগন্ধা, ধূপের গন্ধ। সেখানে মধ্যমণির মতো একজন বসে। ভারি সুন্দর দেখতে ছেলেটিকে। ফর্সা গায়ের রং, কোঁকড়ানো চুল। পাতলা ঠোঁট দুটি ঈষৎ রক্তিম। শুধু চোখের রং সামান্য কটা, বিড়ালাক্ষী বললেই বোধহয় মানায়। অবিনাশ আন্দাজ করল, আসরের উনিই সভাপতি।

একটু পরে সেই ছেলেটি জিজ্ঞাসা করল,—'আজ চন্দনা আসেনি বুঝি?'

—'না অরূপদা।' বিশাখা জবাব দিল। বোম্বে থেকে ওর পিসিমা, আরো কারা যেন এসেছে। বাড়িতে হৈ-হৈ কাণ্ড। তাই চন্দনা আসতে পারবে না।'

অবিনাশ বুঝতে পারল, ইনি সেই স্বনামখ্যাত অরূপ চৌধুরি। গত বছর প্রেসিডেন্সি থেকে ইকনমিকস্ ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। সামনের বছর এম. এ. তেও গোল্ড মেডাল পাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা।

সভাপতি তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাল,—'আসুন অবিনাশবাবু। আজ এই আসরে আপনি প্রথম এলেন। কিন্তু এখন থেকে আপনাকে নিয়মিত পাব বলে আমরা আশা করি।'

বিভুতোষ আধশোয়া অবস্থায় আয়েস করছিল। সে একটা কথা ছুঁড়ে দিল, —'অবিনাশবাবুকে আমাদের আসরের মেম্বার করে নিলে হয় না?'

—'বারে!' বিশাখা হেসে বলল,—'উনি মেম্বার হতে রাজি হবেন কেন? ধরো, এই আসর ওর ভালো না লাগতেও পারে।'

অবিনাশ লজ্জা পাচ্ছিল। এবার নিশ্চয় কিছু বলা উচিত। এরা তার সঙ্গে বেশ আন্তরিক ব্যবহার করছে। আর এই আসরের সদস্য হবার ইচ্ছে যখন ষোল আনা। শুধু নিজে মুখ ফুটে সেকথা বলতেই যা লজ্জা। তা সে বালাই তো রইল না। সভাপতি তাকে পরোক্ষ আসরে স্থায়ীভাবে যোগ দিতে অনুরোধ করেছেন। তখন নিশ্চয় সেই আহ্বানে তার সাড়া দেওয়া উচিত।

মৃদু হেসে অবিনাশ বলল—'মেম্বার হতে আমার কোনো আপত্তি নেই। তাছাড়া মিস রায়কে তো আমি আগেই বলেছি এমন একটা বিউটিফুল আইডিয়া যার মাথায় প্রথম এসেছে তিনি নিশ্চয় সকলের কাছ থেকে অকুণ্ঠ প্রশংসা দাবি করতে পারেন।'

বিভুতোষ তড়াক করে লাফিয়ে উঠে খানিকটা থিয়েটারি ঢঙে বলল,—'আমি প্রস্তাব করছি অবিনাশবাবুকে এই আসরের সদস্য গ্রহণ করা হোক।'

ঈষৎ ঢ্যাঙা, কালো মতন একটি ছেলে দাঁড়িয়ে উঠে সেই প্রস্তাব সমর্থন করল।

বিশাখা বলল,—'এত তাড়াহুড়ো করবার কোনো প্রয়োজন নেই। অনুষ্ঠান শেষ হোক। তারপর অবিনাশবাবুকে আমি মেম্বারশিপ ফর্ম দেব। উনি পূরণ করে দিলেই ওঁকে সদস্য হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।'

অরূপ চৌধুরি তাকে সমর্থন করল। 'নিশ্চয়। বিশাখা যখন এ কাজের ভার নিয়েছে, তখন আর এ ব্যাপারে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। বরং এখন আমরা অনুষ্ঠান শুরু করতে পারি।'

তার আগে বিশাখা তাকে উপস্থিত সদস্যদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। প্রথমে বিভুতোষ মিত্তির। সে ইতিহাসের ছাত্র। বড়লোকের ছেলে। দরজার সামনে সবুজ অ্যামবাসাডরখানা তার বাহন। তারপর পরাশর সেন,—এম.এ. আর ল দুই পড়ছে। ভবিষ্যতে হাইকোর্টে যাওয়ার ইচ্ছে। এ ছাড়া সুকন্যা দাশ, বাংলার ছাত্রী। হরেন ঘোষ, বেলা সান্যাল, মাধব গোস্বামী, তিনজনেরই ইকনমিকস্। তারপর হরিমোহন বসু,—পিওর ম্যাথমেটিকস্ নিয়ে পড়ে। বাকি সকলের সঙ্গে বিশাখা তাকে রীতিমাফিক আলাপ করিয়ে দিল।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই গান। সুন্দর একটি রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করল প্রণতি রক্ষিত। সংস্কৃতের ছাত্রী। স্কটিশ থেকে বি.এ. পাশ করেছে। গান শুরু হতেই তার কানের কাছে মুখ নামিয়ে বিশাখা জিজ্ঞাসা করল,—'রেডিওতে প্রণতির গান শুনেছেন আগে?'

অবিনাশ মাথা নাড়ল। ফের বোকার মতো প্রশ্ন করল,—'উনি রেডিও আর্টিস্ট নাকি?'

বিশাখা মুচকি হাসল। বলল,—'এখন গান শুনুন। পরে কথা হবে।'

প্রণতির গানের পর আবৃত্তি। তারপর মাধব গোস্বামী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাফল্যের বিষয়ে এক তথ্যবহুল প্রবন্ধ ঝাড়া বিশ মিনিট ধরে শোনাল। তার পড়া শেষ হতেই বিভুতোষ ঘাড় চুলকে অস্বস্তি প্রকাশ করে বলল,—'আদ্ধেক কথার মানেই তো বুঝলাম না। দিলে মাথাটা ধরিয়ে।'

অরূপ চৌধুরি আশ্বাস দিল,—'এখুনি চা আসছে। এক ঢোক পেটে পড়লেই শরীর-মন চাঙ্গা হয়ে উঠবে।'

তাই সত্যি। প্রায় তখুনি চায়ের কাপ হাতের কাছে পৌঁছে গেল। ছোট ছোট রেকাবিতে খাবার। চিঁড়েভাজা, সন্দেশ, চারকুচি আপেল, ডিশের কোণে একটা ওমলেট।

পরাশর বলল—'আরি ব্বাস্। বিশাখা দেখছি আজ এলাহি কাণ্ড করে বসে আছে!'

বিভুতোষ মুখের কাছে তর্জনী ঠেকিয়ে মন্তব্য করল,—'নো টক্।' ফেব মুচকি হেসে বলল,—'পরাশর ফালতু বাজে বকে। এখুনি তো নাকের তলা দিয়ে সব মাল পেটের ভেতর চালান করে দেবে বাবা।'

ওর কথা শুনে বেলা সান্যাল খিলখিলিয়ে হেসে উঠল।

ঘবের মধ্যে একটা গুঞ্জন। ক্রমে সেটা হট্টগোলেব রূপ নিচ্ছে দেখে সভাপতি তাড়াতাড়ি বলল,—'অর্ডার, অর্ডার। অনুষ্ঠানের বাকি অংশ এখুনি শুরু করছি।'

চা-পর্ব শেষ হতেই সুকন্যা দাস গল্প পড়তে উঠল। মিষ্টি রিনরিনে গলা। অবিনাশ মন দিয়ে শুনছিল। গল্পের কাহিনি-অংশ দুর্বল কিংবা জোলো নয়। তবে বলার টেকনিকটা বোধহয় এখনও ঠিক আয়ত্তে আসেনি। ভাষা অবশ্য আরও সুন্দর হতে পারে। তাব জন্য চাই অনুশীলন। তাহলে ক্রমেই সেটা ঝকমকে হয়ে দাঁড়াবে।

সভাপতির নির্দেশে হরেন রক্ষিত গল্পের ওপর আলোচনা শুরু করল। অবিনাশ দেখল, গল্পটা নিয়ে সে যা ভেবেছিল সমালোচক প্রায় সেরকম বলে যাচ্ছে। কাহিনি দুর্বল নয়, তবে গল্পের পরিণতিকে যেভাবে অনায়াসে সরলীকরণ করা হয়েছে তা এড়াতে পারলে নিশ্চয় এটি একটি বলিষ্ঠ প্রয়াস হিসেবে মেনে নেওয়া যেত। তার গল্পের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বক্রোক্তি শুনে সুকন্যা আলোচনার মাঝখানেই কী যেন বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু অরূপ চৌধুরি ডানহাত তুলে তাকে নিবৃত্ত করল। বলল,—'আলোচনা শেষ হোক। তারপর তোমার যা বক্তব্য আছে নিশ্চয় জানাতে পারবে।'

সন্ধে সাতটা নাগাদ অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হল। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই সবাই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। অবিনাশও যাচ্ছিল। কিন্তু বিশাখা তার দিকে তাকিয়ে প্রায় রহস্য করে বলল,—'আপনি চলে যাচ্ছেন যে? মেম্বারশিপ ফর্মে সই করবেন না?'

সুতরাং অবিনাশকে ফের বসতে হল। বাড়ির ভিতর থেকে একজন লোক এসে উচ্ছিষ্ট আহার্য এবং তার সঙ্গে প্লেট, চায়ের কাপডিশ সব উঠিয়ে নিয়ে গেল। ইতিমধ্যে আলমারি খুলে একটা কাগজ বের করে আনল বিশাখা। এক নজর তাকিয়ে অবিনাশ বুঝতে পারল ওটা পূরণ করে তাকে মেম্বার হবার জন্য

আবেদন করতে হবে। নিশব্দে হাত বাড়িয়ে সে ফর্মটি গ্রহণ করল।

বিশাখা মুচকি হেসে বলল, 'দেখুন আপত্তি থাকলে আমি না হয় ফর্ম ফিরিয়ে নিচ্ছি। অনিচ্ছুক মানুষকে সদস্য করার আমি আদৌ পক্ষপাতী নই।'

ফর্মটা হাতে রেখেই অবিনাশ প্রশ্ন করল,—'আমি সদস্য হতে অনিচ্ছুক, তাই আপনি মনে করেন?'

—'না-না। তা মনে করব কেন? তবে ফর্ম দেবার সময় আমি সকলকে একথা বলি।' বিশাখা জবাব দিল।

অবিনাশ হেসে বলল,—'তাহলে জেনে রাখুন আমি স্বেচ্ছায় সানন্দে এই আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করছি।'

বিশাখা তার মুখের ওপর এক নজর বুলিয়ে ধীরে ধীরে জানাল,—'আমাদের আসরের কিন্তু একটা বিশেষ নিয়ম আছে।'

—'আবার কী নিয়ম?' অবিনাশ ভ্রূ কুঁচকে রইল।

বিশাখা উত্তর দিল,—'নিয়ম হ'ল নতুন সদস্যকে প্রথম অনুষ্ঠানে অংশ নিতে হবে।'

—'তার মানে?' অবিনাশ যেন ব্যাপারটা বুঝেও না বোঝার ভান করল।

বিষয়টি প্রাঞ্জল করে বিশাখা বলল, 'তার মানে পনেরো দিন পরে ফের যে আসর বসবে সেখানে আপনাকে একটা গল্প, কবিতা কিংবা প্রবন্ধ পাঠ করতে হবে।'

অবিনাশ অসহায় ভঙ্গি করে বলল,—'কিন্তু গল্প, কবিতা এসব তো আমার কিছুই আসে না।'

—'বেশ তো। তাহলে একটা প্রবন্ধ পড়বেন।'

—'প্রবন্ধ?' অবিনাশ যেন অকূলে ভেসে যেতে যেতে হঠাৎ একটা আশ্রয় পেয়ে বলে উঠল,—'কিন্তু কী বিষয়ে?'

'কেন, সাহিত্য নিয়ে।' কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করে ফের মুখ উজ্জ্বল করে বিশাখা বলল,—'আচ্ছা, টি. এস. এলিয়টের ওপর আপনি একটা প্রবন্ধ লিখুন না।'

এলিয়ট তার প্রিয় কবি। অবিনাশ মুহূর্তের জন্য ভাবালু হয়ে উঠল। ফের সহাস্যে বিশাখার দিকে তাকিয়ে জবাব দিল,—'এটা ভালো সাজেশান। বেশ, আপনার প্রস্তাবে রাজি হলাম।'

বিশাখা সোৎসাহে বলল,—'তাহলে সভাপতিকে জানিয়ে দিচ্ছি যে শনিবারের আসরে আপনি এলিয়টের ওপর একটি প্রবন্ধ পড়বেন।'

—'হ্যাঁ নিশ্চয়।' অবিনাশ যেন অনাবশ্যকভাবে শেষ কথাটির ওপর জোর দিল। ফের কী মনে হতে জিজ্ঞাসা করল,—'পরের বার শনিবারের আসর কোথায় বসবে?'

—'বিভুতোষের বাড়িতে, বালিগঞ্জে।' বিশাখা ভ্রূ নাচিয়ে কথা কইল। মুচকি হেসে বলল,—'দারুণ বড়লোক। ওর বাবা একজন ইনডাস্ট্রিয়ালিস্ট। তিন-চারটে

বিজনেস। এক্সপোর্ট-ইমপোর্টের কারবার। চলুন না গিয়ে দেখবেন, বিভুতোষ কী এক কাণ্ড করে বসে আছে।'

বাড়ির দরজা পেরিয়ে পথে নামল বিশাখা। সামান্য দূর পর্যন্ত তার সঙ্গে হেঁটে গেল। আজ একটা সুন্দর ময়ূরকণ্ঠী রঙের শাড়ি পরেছে সে। বিকেলবেলা অনুষ্ঠান শুরু হবার আগে নিশ্চয় গা ধুয়ে প্রসাধন করেছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে তার ছিটেফোঁটাও অবশিষ্ট নেই। গরমে ঘামে সব ধুয়ে মুছে গেছে। এখন ঘরোয়া আটপৌরে সাজ। তবু আড়চোখে এক পলক তাকিয়ে তার হঠাৎ মনে হল বিশাখা ভারি সুন্দর দেখতে। নবপুষ্পিতা মল্লীলতার মতো তন্বী, লীলাময়ী। মুখখানি লাবণ্যে মাখা। আর আয়ত দুটি চোখে একটা নীলচে ভাব—যা প্রথমদিন আবিষ্কার করে অবিনাশ মুগ্ধ হয়েছিল। ওর দৃষ্টিতে, কথা বলার ভঙ্গিমায়, মেলামেশার মধ্যে কোথায় যেন উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করা একটা আশ্চর্যসুন্দর আভিজাত্যবোধ লুকিয়ে আছে। প্রথমদিন অবিনাশের সেটা দৃষ্টি এড়ায়নি। বিশাখার সান্নিধ্যে এলেই নতুন করে আবার তা অনুভব করে।

মেসে ফিরতেই পিছন থেকে সুকোমলের আচমকা প্রশ্ন,—'কী ব্যাপার মশায়? সেজেগুজে গিয়েছিলেন কোথায়?'

অবিনাশ হেসে জবাব দিল,—'একটা সাহিত্যসভায়'।

'—সাহিত্যসভা?' সুকোমল খুব অবাক হয়েছে মনে হল। সামনে এসে ফের জিজ্ঞাসা করল,—'সেটা কোথায়? কলকাতার বাইরে নাকি?'

—'বাইরে কেন হবে?' অবিনাশ অকপটে ব্যক্ত করল,—'এই তো কাছেই, আমহার্স্ট স্ট্রিটে। আমাদের মেস থেকে হেঁটে গেলে বড় জোর দশ মিনিট লাগতে পারে।'

—'বলেন কী? এখানেই?' সুকোমল ফের জিজ্ঞাসা করল,—'বড় সাহিত্যিক কেউ এসেছিলেন নিশ্চয়?'

—'না—না। ওসব কিছু নয়।' অবিনাশ আরও প্রাঞ্জল হতে প্রয়াসী হল। বলল, —'নেহাত ঘরোয়া ব্যাপার। ইউনিভার্সিটির কয়েকজন ছেলেমেয়ে মিলে একটা আয়োজন করে। ওরা নামে দিয়েছে শনিবারের আসর। আমাকে বিশেষ করে যেতে বলেছিল তাই।'

সুকোমলকে ব্যাপারটা বোঝানো গেল। সায়েন্স কলেজের ছেলে। কলেজ স্ট্রিট পাড়ার অত খবর রাখে না। আর তেমন কৌতূহলও নেই। এখানের ছাত্র হলে খুঁটিয়ে দশটা প্রশ্ন করত। হয়তো শনিবারের আসরের ব্যাপারটা কেউ কেউ জানে। এত সাজের ঘটা দেখে তারা আড়ালে হাসত। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করত, —সাহিত্যবাসর না ঘেঁচু। দেখুন গিয়ে এর ভেতরে অন্য কোনো আকর্ষণ রয়েছে।'

মেসে ব্যাপারটা চাপা থাকলেও সোমবার ক্লাসে যেতেই সব ফাঁস হয়ে গেল। চন্দনা তাকে পাকড়াও করে বলল—'সব খবর পেয়ে গেছি কিন্তু।'

—'কী খবর?' অবিনাশ যেন আকাশ থেকে পড়ল।

—'বাব্বা!' চন্দনা বাঁকা হেসে জবাব দিল,—'তুমি যে এমন ফার্স্ট খেলোয়াড় তা কিন্তু জানা ছিল না।'

—'খেলোয়াড়? তার মানে?' অবিনাশ মুখ কুঁচকে রইল।

—'এর মানেও কী বুঝিয়ে বলতে হবে?' চন্দনা একটি সুন্দর ভ্রূভঙ্গি করে হাসল। বলল,—'এই তো গত বুধবারে তোমার সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দিলাম। তারপর এই দু-চারদিনের মধ্যে তুমি তো দেখছি বাজিমাৎ করে বসে আছ।'

—'কী যা-তা বলছ।' অবিনাশ সরব প্রতিবাদ জানাল।

চন্দনার ঠোঁটের ফাঁকে ভাঙা হাসি ফুটে উঠল। তার দিকে একটা কটাক্ষ হেনে অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করে সে বলল,—'কিন্তু একটা কথা মনে রেখো অবিনাশ। কম্পিটিশনে অরূপ চৌধুরিকে হারাতে হবে।'

ব্যাপারটা অবিনাশের যে মনে হয়নি তা নয়। এরকম একটা সন্দেহ যে-কোনো মানুষের মগজেই সৃষ্টি হতে পারে। আর শুধু বিশাখা কেন, অরূপ চৌধুরীর ওপর কিঞ্চিৎ দুর্বলতা থাকা সব মেয়ের পক্ষেই স্বাভাবিক। অমন মেধাবী ছাত্র। অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। এম. এ. তে নিশ্চয় ভালো রেজাল্ট করবে। অন্য দিক থেকে বিচার করলেও ব্যাপারটা কষ্টকল্পনা বলে আদৌ মনে হয় না। বিশাখা সুন্দরী, মার্জিতরুচি। ওর মিষ্টি ব্যবহার যে-কোনো পুরুষকেই সহজে আকৃষ্ট করে। সুতরাং অরূপ চৌধুরি যে তার প্রতি অনুরক্ত হবে তা বুঝতে একটুও অসুবিধে হয় না।

কিন্তু চন্দনা যা ইঙ্গিত করছে সেটা যে সর্বৈব মিথ্যা। স্বকপোল কল্পিত একটি বিষয়। যা অতিরঞ্জন দোষে দুষ্ট। নইলে সত্যি বলতে বিশাখার সঙ্গে নিছক সৌজন্যের সম্পর্ক ছাড়া আর কী বা ঘটেছে? ভদ্রতা করে বিশাখা তাকে শনিবারের আসরে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। তারপর অন্যদেব আগ্রহাতিশয্যে অবিনাশকে আসরের সদস্য করে নিয়েছে। এখন নতুন সদস্যের প্রথম অধিবেশনে একটা ভূমিকা নেবার কথা। তাই তাকে এলিয়টের ওপর একটি প্রবন্ধ লিখে এনে পড়তে বলেছে। সমস্ত ব্যাপারটা খুব স্বাভাবিক ও যুক্তিগ্রাহ্য। এর মধ্যে কোনো হৃদয়ঘটিত সমস্যা কিংবা ভাবাবেগের টানাপোড়েন নেই। কিন্তু তবু এই সহজ সম্পর্ক নিয়েই চন্দনা আকাশ-পাতাল কত কী ভেবে বসে আছে। অবিনাশের হঠাৎ মনে হল চন্দনার মুখে ওই কথা শুনে তার তীব্র প্রতিবাদ জানানো উচিত ছিল। কিন্তু অবিনাশ যে-কোনো কারণেই হোক তা পারেনি। বরং ওর সামনে দাঁড়িয়ে সে নিজেকে কেমন যেন দুর্বল অনুভব করছিল। চন্দনা যখন তার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল, তখন অবিনাশের ভালো লাগছিল। আসলে মনে মনে অবিনাশ বোধহয় ওটা সত্যি ভেবে বসে আছে। কিন্তু বিশাখার প্রতি এই গোপন দুর্বলতার কি কোনো অর্থ হয়? তেমন কিছু যখন সত্যি ঘটেনি। আর চন্দনা তো মুখের ওপর বলে গেল কম্পিটিশনে অরূপ চৌধুরিকে তাকে হারাতে হবে। এবং সেটা যে কত কঠিন, প্রায় অসাধ্য—সে কথা অবিনাশ কেন, চন্দনা নিজেও বেশ ভালোমতো বোঝে।

তিন

দিন কয়েক বিশাখার সঙ্গে আর দেখা হয়নি। তাদেব ইংরেজি ডিপার্টমেন্ট আশুতোষ বিল্ডিঙের দোতলার দক্ষিণ দিকে। আর ইকনমিকস্ ক্লাস হয় তিনতলার উত্তর দিকের ঘবে। সুতরাং কোনো অছিলায় সিঁড়ি ভেঙে তেতলায় উঠলেই বিশাখার সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা নয়। বড় জোর ছুটির সময় কিংবা ক্লাস শুরু হবার মুখে গেটে অথবা রাস্তায় আচমকা দেখা হতে পারে। অবিনাশ দু-একদিন সে চেষ্টাও করেছে। চারটেব সময শেষ পিরিয়ডের বেল বাজলেই তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেযে নেমে গেটের মুখে দাঁড়িয়ে রইল। ভাবটা এই যে, বাইরে থেকে কেউ আসবে বলে তাব অপেক্ষায় আছে। মাঝে মাঝে ছল করে হাতঘড়ির দিকে তাকায। কখনও গলা বাড়িয়ে ভিড়ের মধ্যে কল্পিত সেই মানুষটির অস্তিত্ব খোঁজে। কিন্তু তবু ভাগ্য মন্দ। তাই এত ছলের আশ্রয় নিয়েও বিশাখার সাক্ষাৎ মেলেনি।

হঠাৎ কী একটা ব্যাপারে সেদিন বেলা দুটোর সময় ইংরেজি ডিপার্টমেন্টেব ছুটি হয়ে গেল। অবিনাশ ভাবছিল, লাইব্রেরিতে গিয়ে একটু পডাশুনো করবে কিংবা শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের মেসে ফিরে যাবে! কিন্তু দুটোর কোনোটাই মনঃপূত হল না। এই ভরদুপুরে মেসের এই প্রায়ান্ধকার ঘরে ফিরে গেলে দিনের বাকি সময়টুকু তাকে একাকী মুখ বুজে কাটাতে হবে। কারণ সায়েন্স কলেজ থেকে সুকোমলের ফিরতে বেশ দেরি হয়। ক্লাস করে কোথায় যেন টিউশনি সারে। মেসে ফিরতে সাড়ে সাতটা কোনোদিন আটটা বাজে। তবে হ্যাঁ, লাইব্রেরিতে গেলে কিছু কাজ হয়। বেফারেন্স বই ঘেঁটে তার প্রয়োজনমতো নোট নিতে পারে। কিন্তু এখন এই অবেলায় পেট চুঁই চুঁই করছে। খালি পেটে কি বইয়ের পাতায় মন বসাতে পারবে?

করিডোর দিয়ে চন্দনা আর সমীরণ যাচ্ছিল। তাকে দেখে দুজনেই দাঁড়াল। চন্দনা বলল,—'এই যে ভালো ছেলে, চুপচাপ কী এত ভাবছ?'

—'না, ও কিছু নয়।' অবিনাশ স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করল।

চন্দনা বলল,—'চলো না আমাদের সঙ্গে।'

—'কোথায়?' অবিনাশ মুচকি হাসল।

—'কফিহাউসে। তিনজনে বেশ জমিয়ে আড্ডা দেওয়া যাবে।' তার জবাবের অপেক্ষায় চন্দনা উৎসুক চোখে তাকাল।

অবিনাশ প্রস্তাবে রাজি। কফিহাউসে একটা টেবিল দখল করে তিনজনে বেশ সুন্দর গল্প করা যাবে। এমনি একটা পরিবেশে কিছুক্ষণ থাকলে অবসন্ন মন চাঙা হয়ে উঠবে। কিন্তু অন্য একটা অসুবিধার কথা ভেবে সে রীতিমতো অসহায় বোধ করল। পকেটে হাত ঢুকিয়ে আঙুল নেড়ে তার সেই অবস্থার কথা জানিয়ে বলল, —ট্যাঁক যে গড়ের মাঠ। যাই কেমন করে?'

—'আরে, এই নিয়ে তুমি মাথা ঘামাচ্ছ?' চন্দনা ঠোঁট বেঁকিয়ে বিচিত্র ভঙ্গি করে হেসে উঠল। ফের তির্যকদৃষ্টিতে সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে বলল,—'তাহলে সমীরণ রয়েছে কেন? কফিহাউসে দুজনেই তো ওর গেস্ট হতে পারি।'

সমীরণ শুনে বলল,—'অফকোর্স। আই অ্যাকসেপ্ট ইট উইথ প্লেজার।'

সমীরণ কলকাতার বনেদি পরিবারের ছেলে। বাগবাজারের কাছে বাড়ি। তার বেশভূষা, সাজগোজ, চকচকে জুতো সব কিছুর মধ্যেই একটা গভীর পূর্ণতার ছাপ আছে। পকেট সম্ভবত ভারী থাকে। তাই বন্ধুবান্ধব কিংবা সহপাঠীদের সঙ্গে নিয়ে রেস্তোরাঁ অথবা কফি-হাউসে টাকা ওড়ায়।

চন্দনা হঠাৎ একটা কাণ্ড করল। এক পা এগিয়ে এসে অবিনাশের হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে বলল,—'চলো, আর একটি মিনিটও আমি নষ্ট করতে রাজি নই। এদিকে আড়াইটে বাজে। আবার ছটার মধ্যে বাড়ি না ফিরলেই মা রেগে কাঁই হবে।'

—'তোমার মা তো খুব কড়া গার্জিয়ান। সমীরণ মন্তব্য করল।

—'শুধু কড়া নয়। মায়ের একটা সিক্সথ্ সেন্স আছে। মুখের দিকে তাকালেই মা সব টের পায়।'

—'কী রকম?'

—'যেমন ধরো, আজ দুটোর সময় আমাদের ছুটি হয়ে গেল। বাড়ি ফিরতে হয়তো পাঁচটা, সাড়ে পাঁচটা বাজবে। মা কিন্তু আমার দিকে একবার তাকিয়েই বুঝতে পারবে যে অনেকক্ষণ আগে ছুটি হয়েছিল। এতক্ষণ কোথাও জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছিলাম।'

—'সর্বনাশ!' অবিনাশ যেন আঁতকে উঠে বলল,—'দেন ইউ আর কট্।'

—'আহা!' চন্দনা ভ্রূ নাচিয়ে বলল,—'এতে ধরা পড়ার কী আছে? মা তো জানে মাঝে ক্লাস-টাস অফ গেলে আমরা দল বেঁধে কফিহাউসে আড্ডা দিই।'

—'বুঝতে পেরেছি।' অবিনাশ মাথার চুলে হাত রেখে বলল,— 'উনি বোধহয় চান, তুমি একটা নির্দিষ্ট সময়ে বাড়ি ফিরবে। তাই না?'

'একজ্যাক্টলি।' চন্দনা জবাব দিল। ফের যেন ঈষৎ রাগের সঙ্গে জানাল,—কিন্তু পোস্টগ্র্যাজুয়েটে পড়তে এসে এত ধরাবাঁধার মধ্যে কী থাকা যায়?'

কফিহাউসে গিয়ে বসবার আধঘণ্টা পরেই একটা অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ঘটল। বিভুতোষ এবং আরো দুটি ছেলের সঙ্গে বিশাখা এসে হাজির। ওদের একজনকে

অবিনাশ দেখেছে। শনিবারের আসরের সদস্য। কিন্তু আর একজন অচেনা। হয়তো বিভুতোষের বন্ধুবান্ধব কেউ হবে।

চন্দনা দেখতে পেয়েই হাত নেড়ে ওদের কাছে ডাকল। সকলের অলক্ষ্যে বাঁ হাতে অবিনাশকে একটা মৃদু খোঁচা দিয়ে বলল,—'কি, এবার খুশি তো?'

খোঁচা লাগতেই অবিনাশ চমকে উঠল। কিন্তু চন্দনাকে বিশ্বাস নেই। কখন বেঁফাস কী বলে বসে! এখন সাবধান করতে গেলে মুখ ফসকে আবার কিছু বেরিয়ে পড়বে।

ব্যাপারটা সমীরণ টের পায়নি। সে মনোযোগ-সহকারে স্যান্ডউইচ ভক্ষণ করছিল। বিভুতোষেব সঙ্গে বোধহয় ওর আগে থেকেই আলাপ। তাকে দেখে সে সহাস্যে বলে উঠল,—'আরে এসো এসো। জমিয়ে আড্ডা হোক। দি মোর, দি মেরিয়ার।'

মোটামুটি সকলেই পরস্পরের মুখ চেনা। তবু চন্দনা আর এক প্রস্থ পরিচয়-বিনিময় করিয়ে দিল।

অবিনাশ অনেকক্ষণ কথা বলেনি। বিশাখার দিকে তাকিযে সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল,—'আপনাদের ডিপার্টমেন্টেও ছুটি হল নাকি?'

—'ছুটি?' বিশাখা ঠোঁট ফাঁক করে ঈষৎ হাসল। ফের আড়চোখে বিভুতোষের দিকে তাকিয়ে কপট রাগের সঙ্গে বলল,—'ছুটি কেন হবে? ওই আমাকে জোর করে নিয়ে এল। অথচ আজ প্রফেসর বরাটের একটা ক্লাস ছিল। ফালতু সেটা কামাই হল।'

বিভুতোষ টিপ্পনি কাটল,—'তোমার ক্লাসে যাওয়ার কী প্রয়োজন বলতে পার? সোনার মেডেল পাওয়া ছাত্রের মূল্যবান নোট যখন এমনি তোমার হাতে এসে যাচ্ছে।'

কথার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত আছে। সকলেই সেটা বুঝতে পারে। বোধহয় সে কারণে বিশাখার কর্ণমূল ঈষৎ আরক্ত হয়ে উঠল। চন্দনা প্রায় কোমর বেঁধে তার পক্ষে দাঁড়াল। সে বলল,—'আহা! এই নিয়ে আবাব খোঁটা দেওয়ার কী আছে? অরূপদা যদি ওর ভালো নোটগুলো বিশাখাকে বিলিয়ে দেন, তাতে আব পাঁচজনের গায়ে ফোস্কা পড়ে নাকি?'

বিভুতোষ শুনে হো-হো করে হেসে উঠল। বলল,—'এখনও ফোস্কা পড়েনি। কিন্তু মনে হচ্ছে তোমার কথায় গায়ে ফোস্কা পড়তে পারে।' ফের শরীরটা একটু সামনে ঝুঁকিয়ে করজোড়ে নিবেদন করল,—'ঠিক আছে। যদি অন্যায় কিছু করে থাকি তাহলে আই অ্যাপলোজাইজ।'

বিশাখা সুমিষ্টস্বরে বলল,—'আরে না-না। কী যে পাগলামি কর।'

বিভুতোষ উঠে দাঁড়িয়ে প্রায় নাটকীয় ভঙ্গিতে ঘোষণা করল,—'অলরাটই। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব।' বলেই সে একজন বেয়ারাকে কাছে ডেকে

সকলের জন্য চিকেন ওমলেট আর কফির অর্ডার দিয়ে বসল।

সমীরণ বিনীতভাবে জানাল,—কিন্তু আমি যে এক প্লেট স্যান্ডউইচ সাবাড় করে ফেলেছি।'

বিভুতোষ দমবার ছেলে নয়। ওকে পিঠ চাপড়ে বলল,—'নেভার মাইন্ড। তুমি আর এক প্লেট চিকেন ওমলেট খতম করো।'

শুনে সকলে শব্দ করে হেসে উঠল।

ঘড়িতে পাঁচটা বাজতেই চন্দনা উঠে দাঁড়াল। বলল,—'চলি ভাই। ট্রাম-বাসে এখন যা ভিড়। বাড়ি পৌঁছতে ঠিক ছ'টা হবে।'

বিভুতোষ দুঃখ করল,—'আজ গাড়ি সঙ্গে নেই। নইলে তোমাকে ছেড়ে আসতে বলতাম।'

—'ক্ষেপেছ?' চন্দনা প্রায় রুখে দাঁড়াল, 'তোমার গাড়ি থেকে নামলে বাড়িতে এক ঝুড়ি কৈফিয়ত দিতে হবে না?' ফের কেমন রহস্য করে বলল,—'তারপর? পাড়াতে যে একটা কানাকানি শুরু হয়ে যাবে তখন?'

বিভুতোষ জিজ্ঞাসা করল,—'আগামী শনিবার আসরে আসছ তো?'

—'অফকোর্স।' চন্দনা বিচিত্র ভঙ্গিতে হেসে কী যেন ইঙ্গিত করল। ফের চোখ নাচিয়ে বলল,—'তোমার বাড়িতে আসার হলে কেউ কি মিস করে?'

চন্দনা চলে যাবার পর আড্ডা আর জমল না। কেমন যেন সব ঢিলে হয়ে গেল। আসলে চন্দনা এতক্ষণ একাই মাতিয়ে রেখেছিল। সমীরণ উঠে দাঁড়িয়ে বলল,—'আমার একটা কাজ আছে। তোমরা বরং গল্প করো।'

বিশাখা বলল,—'আড্ডা আর জমবে না। আজ বরং সভা ভঙ্গ হোক।'

বেয়ারাকে ডেকে বিভুতোষ বিল মিটিয়ে দিল। সে বন্ধুদের সঙ্গে এসপ্ল্যানেড যাবে। লিন্ডসে স্ট্রিটের কোন দোকানে প্যান্ট করতে দিয়েছিল। অনেকদিন হল, ট্রায়াল দিতে যাওয়া হয়নি। কফিহাউস থেকে নেমে ওরা একটা ট্যাক্সি ধরবে বলে ট্রাম রাস্তার দিকে এগোল।

অবিনাশ এতক্ষণ প্রায় শ্রোতা সেজে বসেছিল। দু-একটা প্রশ্নে হু-হাঁ দিয়েছে, এই পর্যন্ত। মাঝে মাঝে বিশাখার মুখের ওপর চোরাচাউনি বুলিয়েছে। কিন্তু নিজে তেমন একটা কিছু বলেনি। কফিহাউসের সিঁড়ি বেয়ে নামবার সময় সে ভাবছিল এবার বোধহয় মেসে ফিরে যাওয়া ঠিক হবে। কিন্তু বিশাখা? তার বাড়ি তো আমহার্স্ট স্ট্রিট,—একই পথে যেতে হয়।

রাস্তায় নেমে সে জিজ্ঞাসা করল,—'আপনি এখন বাড়ি ফিরবেন নাকি?'

—'হ্যাঁ।' বিশাখা ঘাড় ফিরিয়ে জবাব দিল। ফের নিজেই প্রস্তাব করল,—'চলুন, আপনি তো ওদিকেই যাবেন। তাই না?'

অনাবশ্যক, তবু অবিনাশ বলল,—'আমার মেস কাছেই। শ্রীগোপাল মল্লিক লেনে।'

হিন্দু স্কুল পেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দুজনে ইউনিভার্সিটির কাছে এল। বিশাখা বলল,—'রাস্তায় লোক গিজগিজ করছে। গা ঘেঁষাঘেষি করে হাঁটা, তার চেয়ে বরং আসুন গোলদিঘিতে ঢুকে একটু শটকার্ট করি।'

ইতিমধ্যে কখন সন্ধে নেমেছে। চারপাশে বাড়িঘর, দোকানপাট,—আলো ঝলমল। যেন বিয়েবাড়ির রোশনাই। গোলদিঘিতে যে ভিড় নেই তা নয়। কিছু বায়ুসেবী মানুষ গ্রহ-উপগ্রহের মতো দিঘির চারপাশে ধীরগতিতে ঘুরছে। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বেঞ্চে অনেকে বসে। তাদের মতো অল্পবয়সি কয়েক জোড়া ছেলেমেয়ে গাছগাছালি কিম্বা ঝোপঝাপের আবছা আঁধারে গা মিলিয়ে মত্ত হয়ে গল্প করছে।

মাথার ওপব শ্লেট বঙের বিবর্ণ আকাশ। সম্ভবত কৃষ্ণপক্ষ। হয়তো অনেক বাত্তিরে চাঁদ উঠবে। কিন্তু এখন চোখ তুলে তাকিয়ে শুধু কয়েকটা দেদীপ্যমান নক্ষত্র নজরে পড়ল। তাও অনুজ্জ্বল টিমটিমে। বোধহয় কলকাতার বায়ুমণ্ডল ধূলিকীর্ণ বলে সম্পূর্ণ আলোক মহানগরীতে পৌঁছয় না। কিংবা মাটির কাছাকাছি এত আলোর ঝলমলানি,—তাই উজ্জ্বল নক্ষত্রকেও নিষ্প্রভ দেখায়।

পাশাপাশি দুজনে হাঁটছিল। বিশাখা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল,—'আপনার লেখাটা তৈবি হযে গেছে?'

লেখাটা শুধু তৈরি হয়েছে জানালে ঠিক বলা হয় না। কেটেকুটে মেজেঘষে অবিনাশ সেটাকে তীক্ষ্ণ এবং ঝকঝকে করে তুলেছে। কিন্তু কী মনে হতে বিশাখার কাছে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ চেপে গেল। মাথার চুলে হাত বেখে সে বলল,—'মোটামুটি একটা খসড়া করে রেখেছি। মনে হয় শিগগির রেডি করে ফেলব।'

বিশাখা বলল,—'আপনার প্রবন্ধেব বিষয আমি প্রায সকলকে জানিয়ে দিয়েছি। অনেকেই খুব ইনটারেস্টেড কিন্তু। তাছাড়া চন্দনা আপনার দারুণ পাবলিসিটি দিচ্ছে।'

—'পাবলিসিটি কীসের?' ব্যাপারটা না বোঝার ভান করে অবিনাশ সামান্য ভ্রূ কোঁচকাল।

বিশাখা বলল,—'অবশ্য চন্দনা অন্যায় কিছু করেনি। যা সত্যি তাই সকলকে বলেছে। আপনি ভালো ছাত্র, ক্লাসের ব্রিলিযান্ট স্টুডেন্ট। প্রফেসর মজুমদার আশা করেন যে এম. এ তে আপনি নিশ্চয় ফার্স্ট ক্লাস পাবেন।'

—'আপনিও কি চন্দনার মতো পাগল হলেন?' অবিনাশ যেন কথাটা ছুড়ে মাবল। 'ইংরেজিতে ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া চাট্টিখানি কথা?'

বিশাখা হেসে ফেলল। বলল,—'মিছিমিছি চটছেন কিন্তু। আসলে গুণের কথা লোকে জোর গলাতেই বলে। তাছাড়া এটা তো মিথ্যে নয় যে এম. এ. তে আপনার ফার্স্ট ক্লাস পাওয়ার সম্ভবনা আছে। শেষ পর্যন্ত তা যদি না ঘটে, তাতে আপনার নিশ্চয় কোনো অপরাধ থাকবে না।'

—'কিন্তু লোকে ঠাট্টা করবে, আড়ালে হাসবে।'

—'কেউ হাসবে না।' বিশাখা সুন্দর একটি ভ্রূভঙ্গি করল। বলল,—'কে কী ভাবল, তাই নিয়ে তো আপনি খুব মাথা ঘামান দেখছি! আচ্ছা, একটা কথা নিশ্চয় মানবেন যে এম. এ. পরীক্ষার যখন রেজাল্ট বেরুবে তখন আমরা কে কোথায় থাকব তাই এখন কেউ জানি না।'

হাঁটতে হাঁটতে তারা দুজনে কখন আমহার্স্ট স্ট্রিটে এসে পড়েছে খেয়াল করেনি। চারপাশের দোকানপাট, সামনের পার্কটার দিকে তাকিয়ে বিশাখা বলল, —'ওমা! আপনার গলিটা তো অনেক আগে ছেড়ে এসেছি।'

—'তাতে কিছু ক্ষতি হয়নি।' অবিনাশ মৃদু হাসল। বলল —'বেশ গল্প করে খানিকটা পথ আপনাকে এগিয়ে দিলাম।'

—'সেজন্য অনেক ধন্যবাদ।' বিশাখা কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকাল।

অবিনাশ বুঝতে পারল তার এবার বিদায় নেওয়া উচিত। এমনও হতে পাবে বিশাখা এই চেনাজানা পথে আর একসঙ্গে হাঁটতে আগ্রহী নয়।

একটা হাত তুলে বিদায়ের ভঙ্গি করে অবিনাশ বলল,—'তাহলে গুড নাইট। পরে নিশ্চয় আবার দেখা হবে।'

—'অফকোর্স।' বিশাখা হেসে জবাব দিল। ফের বলল,—'কিন্তু একটা অনুরোধ, এলিয়টের ওপর লেখাটা শেষ করতে যেন আর দেরি করবেন না।'

—'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। শনিবারের আসরে এলিয়টের বিষয়ে প্রবন্ধটি ঠিক সময়ে পড়া হবে।'

শনিবার দিন বালিগঞ্জে বিভুতোষের বাড়ির নম্বর খুঁজে বের করে অবিনাশের প্রায় তাক লেগে গেল। এই বাড়ি? রাজা বসন্ত রায় রোডে পাঁচ কাঠা জমির ওপর বিরাট অট্টালিকা। সামনে সুন্দর বাগান। মখমলের মতো নরম সবুজ ঘাসের আস্তরণ। কয়েকটা জিনিয়া গাছে কী সুন্দর ফুল ফুটেছে! একজন মালি জলের ঝারি হাতে ফুলগাছের পরিচর্যায় ব্যস্ত। পশ্চিম কোণে মানুষ-প্রমাণ উঁচু এক বেদির ওপর অলস নায়িকার মতো শিথিল ভঙ্গিমায় দাঁড়ানো ভেনাসের অর্ধনগ্ন নারীমূর্তি।

তাকে দেখে গেটের দারোয়ান রীতিমতো সম্মান জানিয়ে ভিতরে আসতে অনুরোধ করল। চারপাশে তাকাতে তাকাতে অবিনাশ ধীরগতিতে হাঁটছিল। কিছুটা এগিয়ে যেতেই একটা বড় ঘরের ভিতর বিভুতোষ এবং আরও কয়েকজনকে সে দাঁড়িয়ে গল্প করতে দেখল। নীচের তলায় দক্ষিণ খোলা ঘরখানা। বেশ বড়, বড় চার পাঁচখানা জানালা। তার দিকে নজর পড়তেই বিভুতোষ অধীর উল্লাস প্রকাশ করে সাদর অভ্যর্থনা জানাল। ভিতরে ঢুকে অবিনাশ দেখল কেউ কেউ এসেছে ঠিক, কিন্তু অনেকেই তখনও আসেনি। যেমন বিশাখা, আসরের সভাপতি অরূপ চৌধুরিও অনুপস্থিত। চন্দনাও আসতে দেরি করছে। অবিনাশ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সময় দেখল। প্রায় সওয়া পাঁচটা বাজে। সাড়ে পাঁচটায় আসর শুরু হওয়ার

কথা। হয়তো মিনিট দশ-বারোর মধ্যেই সবাই এসে পড়বে।

ঘরখানি ভারি সুন্দর সাজানো। মুখোমুখি দেয়ালের দুপাশে দুটি সুদৃশ্য ওয়াল ডিজাইনার। একটা জলরঙের ছবিও আছে। গভীর অরণ্যের নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের বুকে সূর্যোদয়ের রক্তিম আলো এসে পড়েছে। পাখি ডাকছে, ভোর হতে দেরি নেই। জলরঙে আঁকা ছবির শিল্পী এই সুন্দর মুহূর্তটিকে তাঁর নিপুণ তুলির টানে ধরে রাখতে চেষ্টা করেছেন। ঘরের মেঝে চৌকো মার্বেল পাথরে বাঁধানো। এক কণা ধুলোময়লা কোথাও পড়ে নেই। পুবদিক ঘেঁষে আসরের জন্য একটা বড় গালিচা পাতা হয়েছে। তার মাঝখানে সভাপতির নির্দিষ্ট একটি আসন স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত। ফুলদানিতে একদিকে দীঘল রজনিগন্ধা, অন্যদিকে একগুচ্ছ রক্ত গোলাপ। সুঘ্রাণে সেখানের বাতাসটা ম-ম করছে। ধূপদানিতে চন্দনকাঠি জ্বলছে। তারও সুবাস সমস্ত ঘরময় ছড়িয়ে আছে।

আধা উর্দি-পরা একজন বেয়ারা গোছের লোক ট্রে-তে আট-দশ গ্লাস ঠান্ডা পানীয় সাজিয়ে তার সামনে দাঁড়াল। বিভুতোষ কাছে এসে অনুরোধ করল,—যেটা খুশি নিন, ম্যাঙ্গো জুস কিংবা পাইন অ্যাপল। যা আপনার ভালো লাগে। ম্যাঙ্গো জুসটা প্রায় সবুজ, পাইন আপেল ফিকে হলদে। অবিনাশ হাত বাড়িয়ে হলদে রঙের পানীয়টা তুলে নিল। আরও যারা ইতিমধ্যে এসেছে তার কেউ ম্যাঙ্গো জুস, কেউ বা পাইন অ্যাপল নিয়ে গ্লাসে চুমুক দিতে লাগল।

মিনিট পাঁচ-সাত পরেই বিশাখা আর চন্দনা একসঙ্গে ঢুকল। সম্ভবত একটু আগে বাস স্টপে কিংবা রাস্তাতেই দুজনের দেখা হয়েছে। বিভুতোষ তার সেই পুরানো থিয়েটারি ঢঙে উভয়কে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলল,—'আসুন ম্যাডাম্। এক গ্লাস পানীয় গ্রহণ করে হোস্টকে বাধিত করুন।'

অবিনাশ তাকিয়ে দেখল, আগের দিনের চেয়েও বিশাখাকে আজ অনেক বেশি সুন্দর লাগছে। একটা হলুদ রঙের শাড়ি পরেছে সে। ওটা পিওর সিল্ক কিংবা সাউথ ইন্ডিয়ান হতে পারে। গায়ে একই রঙের ম্যাচ করা জামা। কপালে টিপ, গলায় নিশ্চয় ঝুটো মুক্তোর মালা। চন্দনাও কিছু কম সাজগোজ করেনি। তবে তার বেশবাস ঈষৎ উগ্র। টকটকে লাল রঙের একটা শাড়ি পরেছে চন্দনা। পরনে খয়েরি কালারের জামা। কপালে গাঢ় টিপ। ঠোঁটে সামান্য প্রসাধনের চিহ্ন।

ঠিক সেই মুহূর্তে অরূপ চৌধুরি ঢুকল। দুজনের দিকে তাকিয়ে একগাল হেসে বলল,—'আরি বাপস্! এ তো দেখছি সখী ধর-ধর বেশ।'

মন্তব্য শুনে বিশাখা শুধু মুচকি হাসল। কোনো জবাব দিল না। কিন্তু চন্দনা ছেড়ে কথা কইবার পাত্রী নয়। সে চোখ ঘুরিয়ে বিচিত্র ভঙ্গি করে বলল,—'আহা! কে কাকে বলছে? নিজে কিছু কম সেজেছেন? আয়নায় দেখুন, ঠিক নতুন জামাই বলে মনে হবে।'

চন্দনার কথা শুনে অনেকে হো হো করে হেসে উঠল। বিভুতোষ চোখ টিপে

বলল,—'বেড়ে জবাবটা দিয়েছে কিন্তু।'

তা চন্দনা মিথ্যে বলেনি। আজ অরূপ চৌধুরির রীতিমতো সৌখিন সাজ। পরনে কালো পাড় ফিনফিনে শান্তিপুরি ধুতি। গায়ে পাতলা আদ্দির পাঞ্জাবি, —গিলে করা। কাঁধে, গলার নীচে বোতামের ঘরের দুপাশে সুন্দর কাজ। পায়ে এক জোড়া সুদৃশ্য স্লিপার। বাটারফ্লাই ধরনের ছোট্ট একটু গোঁফ নাকের নীচে, আজ সেটা নিপুণ হাতে ছেঁটেছে। দুপুরে স্নানের সময় মাথায় শ্যাম্পু ঘষেছিল, এখনও তাই চুল উড়ু-উড়ু। পাড়ার বখা ছেলেদের মতো শাসনের বাইরে চলে গেছে।

ওরই মধ্যে এক ফাঁকে বিশাখা চাপা গলায় প্রশ্ন করল,—'লেখাটা এনেছেন তো?'

কপটতা করে অবিনাশ জবাব দিল,—'যদি না বলি?'

—'তাহলে মাথা হেঁট।' বিশাখা সভয়ে কথা কইল। 'আমরা তো বড়ো গলা করে সকলকে জানিয়ে দিয়েছি।'

—'ভয় নেই।' অবিনাশ মুচকি হেসে বলল,—'লেখা আমার সঙ্গেই আছে।'

—'বাঁচালেন।' বিশাখা একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে তার মুখের দিকে তাকাল।

সাড়ে পাঁচটাব একটু পরেই অনুষ্ঠান। শুরুতে বিশাখা গান করল। রবীন্দ্রসঙ্গীত—'কী গাব আমি, কী শোনাব আজি এ আনন্দধামে।' অবিনাশ তন্ময় হয়ে গান শুনেছিল। বিশাখা যে এমন সুন্দর গান গাইতে পারে আজই সেটা প্রথম জানল। ব্যাপারটা চন্দনার দৃষ্টি এড়ায় নি। অবিনাশের ভাবান্তর সে লক্ষ করেছিল। চোখাচোখি হতেই অবিনাশ দেখতে পেল চন্দনার ঠোঁটে চাপা হাসি ফুটে উঠেছে:

গানের পর স্বরচিত কবিতা পাঠ। আসরের এক সদস্যা তার রচিত ছ'টি কবিতা পড়ে শোনাল। আধুনিক কবিতা, তবে বেশ ভালো গলা, আর পড়ার ভঙ্গিও সুন্দর। কেউ তারিফ করল, কেউ চুপ করে রইল। তারপরই অবিনাশের ডাক পড়ল। এলিয়টের ওপর সেই নিবন্ধ। পকেট থেকে কাগজটা বের করে বেশ সাবলীল গলায় সে পড়ে যাচ্ছিল। মাঝখানে কে একজন কী প্রশ্ন করে বসতেই অবিনাশ প্রায় হোঁচট খেল। অরূপ চৌধুরি তাড়াতাড়ি হাত তুলে মধ্যস্থতা করে বলল, —'আগে পড়া শেষ হোক, তারপর এই নিয়ে যে কেউ আলোচনা কিংবা প্রশ্ন করতে পারবে।'

কিন্তু আশ্চর্য! পড়া শেষ হতেই ঘরের আবহাওয়াটা যেন পালটে গেল। অজস্র হাততালি, বিমুগ্ধ চোখে নীরব তারিফ। সভাপতি স্বয়ং উঠে দাঁড়িয়ে বলল,—'এই নিবন্ধের জন্য লেখককে আমি কনগ্র্যাচুলেশন জানাচ্ছি।' ঝাড়া পনেরো মিনিট ধরে অবিনাশ তার লেখা পড়ে গেল। শেষ দিকে নিজেই বুঝতে পারছিল তার সুন্দর ইংরেজি এবং জোরালো বক্তব্য একটা সুরেলা গানের মত শ্রোতাদের নিবিষ্ট করে রেখেছে।

চন্দনা বলল,—'লেখকের কাছে আমার একটা আরজি আছে।'

অরূপ চৌধুরি হেসে উত্তর দিল,—'নির্ভয়ে তুমি তা প্রকাশ করতে পার।'

চন্দনা বলল,—'এই নিবন্ধটি আমি কপি করে নিতে চাই।'

কে একজন পিছন থেকে মন্তব্য করল,—'তাই কখনও হয়? পরীক্ষাতে এলিয়টের ওপর প্রশ্ন এলে তুমি যে এটা লিখে বাজিমাৎ করে দেবে।'

অরূপ চৌধুরি জানাল,—'এ ব্যাপারে আসরের কোনো অভিমত নেই। নিবন্ধটি কপি করতে দেওয়ার অনুমতি একমাত্র লেখকই দিতে পারেন। সুতরাং তুমি সরাসরি তাঁর কাছেই আবেদন জানাবে।'

'বেশ, তাই করব।' বলেই চন্দনা অপাঙ্গে অবিনাশের দিকে তাকিয়ে একটা মিষ্টি কটাক্ষ হানল।

অনুষ্ঠানের মাঝখানে জলযোগের ব্যবস্থা। বিশাখা বলেছিল বটে, চলুন না গিয়ে দেখবেন বিভুতোষ কী এক কাণ্ড করে বসে আছে। তা সেটা যে এমন প্রকাণ্ড গোছের হবে, অবিনাশ ভাবতেও পারেনি। ট্রে-তে করে সেই বেয়ারা যে আহার্য সাজিয়ে নিযে এল, তা দেখে চক্ষু ছানাবড়া হবাব জোগাড়। প্রত্যেকের জন্য দুটি করে প্লেট, একটিতে মিষ্টান্ন অন্যটিতে আমিষ। প্রত্যেক ডিশে প্রায় টেনিস বলের মাপের দুটি রসগোল্লা, একটি সন্দেশ। এছাড়া গরম সিঙাড়া। অন্য প্লেটটিতে চিকেন রোল, ফিস ফ্রাই, আলুভাজার সঙ্গে টম্যাটো সস্। অবিনাশ প্লেট দুটি দেখে সভয়ে মন্তব্য করল,—'অসম্ভব! এক সঙ্গে এত কখনও খাওয়া যায়?'

বিশাখা মুচকি হেসে জবাব দিল,—'যা বলার আপনি হোস্ট মানে বিভুতোষকে বলুন।'

চন্দনা বলল,—'তোমার তো এক প্লেট বাড়তি পাওনা হয়েছে। বিভুতোষকে বরং সেটা দিতে বলি?'

—'কেন? কেন?' দু-তিনজন সমস্বরে প্রশ্ন করল।

চন্দনা চোখ ঘুরিয়ে ফের কটাক্ষ করে বলল,—'বারে! এমন সুন্দর প্রবন্ধ লিখেছে অবিনাশ। তার জন্য একটা এক্সট্রা প্লেট ওর প্রাইজ পাওয়া উচিত।'

—'অবশ্য, অবশ্য' অরূপ চৌধুরি সমর্থন করল। ফের মৃদু হেসে বলল, —'এরপর নিশ্চয় চন্দনাকে ওই লেখাটা দিতে আপনার আপত্তি থাকবে না?'

অবিনাশ কোনো জবাব দেবার আগেই অন্য সকলে শব্দ করে হেসে উঠল।

চার

অনুষ্ঠান শেষ হবার পর বাড়ি ফেরা। কেউ উত্তরে, কেউ বা আরও দক্ষিণে যাবে। কারও গন্তব্যস্থল ভবানীপুর কিংবা চেতলা। কেউ বালিগঞ্জ স্টেশনে ট্রেন ধরবে বলে ঘড়ির কাঁটায় সময় দেখে নিল। অরূপ চৌধুরি এবং আর একজনকে হাওড়া স্টেশন যেতে হবে। তবু রাসবিহারী এভিনিউ পর্যন্ত হেঁটে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। ওখানেই নানা দিকের বাস পাওয়া যাবে। বালিগঞ্জ স্টেশনে যেতে ট্রামেই সুবিধে। তারাও লাইন পেরিয়ে উল্টোদিকের স্টপে গিয়ে দাঁড়াবে।

বিশাখাকে লক্ষ করে চন্দনা হঠাৎ বলল, —'অবিনাশ তো আমাদের সঙ্গে যেতে পারে। কলেজ স্ট্রিটে তোরা দুজনে নেমে যাস্।'

এ যেন মেঘ না চাইতেই জল। অবিনাশ হঠাৎ চন্দনার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা অনুভব করল। মনে মনে সে তো তাই চেয়েছিল। আর শুধু এলিয়টের ওপর লেখা নয়, চন্দনা চাইলে তার সমস্ত মূল্যবান নোট্স এই মুহূর্তে অবিনাশ নিজে ওর হাতে তুলে দিতে পারে। ইউনিভার্সিটির বাস স্টপে নেমে মির্জাপুর স্ট্রিট ধরে এই পথটুকু বিশাখার সঙ্গে পাশাপাশি হেঁটে যাওয়া,—ওর দিকে তাকালেই নীলাকাশের ইশারার মতো কী যেন একটা অদৃশ্য শক্তি তাকে ঠিক চুম্বকের ন্যায় আকর্ষণ করে। হঠাৎ চোখাচোখি হলে বিশাখা যখন ঠোঁট টিপে হাসে, অবিনাশের মনের মধ্যে তখন কী যে একটা বিচিত্র অনুভূতির সৃষ্টি হয়, তা সে কাউকে বোঝাতে পারবে না।

দূরে একটা দোতলা বাস দেখে সকলেই গ্রীবা বাড়িয়ে কৌতূহলী চোখে তাকাল। কাছে আসতেই গন্তব্যস্থান জানা গেল। ওটা হাওড়াগামী বাস, এসপ্ল্যানেড হয়ে যাবে। অরূপ চৌধুরি এবং আরও অনেকেই বাসে উঠে হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে গেল। মিনিট কয়েক বাদে চন্দনাদের বাসও এসে পৌঁছল। মোটামুটি খালি গাড়ি। পাশাপাশি তিনখানা সিটে ওরা বসে পড়ল। জানালার ধারে চন্দনা, মাঝখানে বিশাখা,—অবিনাশ শেষে।

চন্দনা খুশি মনে বলল,—'আজকের ফাংশন কিন্তু দারুণ হয়েছে। আর তোমার ওই লেখাটা অবিনাশ—সুপার্ব। আমার তো মনে হয় যাঁরা পড়ান, এলিয়ট সম্বন্ধে তাঁরা অনেক এমন সুন্দর করে লিখতে পারবেন না।'

অবিনাশ লজ্জা পেল। ছি, ছি! বিশাখা কী ভাবছে! সে তাড়াতাড়ি বলল,—'এটা

খুব বাড়াবাড়ি হচ্ছে না চন্দনা?'

—'বাড়াবাড়ি কীসের?' চন্দনা পাল্টা প্রশ্ন করল। ফের আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলল,—'আমার অত ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় নেই। যা ভালো লাগে তা সকলের সামনে খোলাখুলি বলি।'

প্রায় আটটা বাজে। ফাঁকা রাস্তায় রাতের ডবল ডেকার শ্বাপদের তাড়া-খাওয়া হরিণের মতো স্পিডে ছুটে চলেছে। দুপাশে আলো-ঝলমল কলকাতা। গড়ের মাঠ, রেড রোডের দুপাশে সারবন্দি উজ্জ্বল নিওন বাতি। ধর্মতলা পেরিয়ে গাড়ি ওয়েলিংটন স্কোয়্যারের দিকে ছুটে চলল। মাঝে মাঝে দু-একটা স্টপে অল্পক্ষণ দাঁড়ায়। হয়তো কেউ ওঠে, কিংবা নামে। মিনিট দশ-বারো না যেতেই বাস বৌবাজারের ক্রশিঙে এসে থামল।

বিশাখা বলল,—'উঠুন, এবার তো নামতে হবে।'

ফাঁকা গাড়ি। তবু গেটের মুখে ঘেঁষাঘেঁষি করে চার-পাঁচজন লোক দাঁড়িয়ে। ইচ্ছে করলেই ওরা ভিতরে চলে আসতে পারে। তাহলে ওঠা-নামার সময় যাত্রীদের সুবিধে হয়। কিন্তু লোকগুলোর এই স্বভাব। গেটের মুখে দাঁড়িয়ে অযথা যাত্রীদের হয়রানি করে।

ইতিমধ্যে বাস বৌবাজারের ক্রশিঙ পেরিয়ে এল। সামনে মেডিক্যাল কলেজের স্টপ। সিট ছেড়ে উঠে বিশাখা তাড়াতাড়ি গেটের দিকে এগোল। অবিনাশ পিছনে যাচ্ছিল। কিন্তু চন্দনা তার জামার প্রান্ত ধরে মৃদু টান দিতেই সে মুখ ফেরাল।

দাঁত চিপে চন্দনা চাপা গলায় বলল,—'আনগ্রেটফুল। অন্তত একটা থ্যাংকস্ দিয়ে যাও।'

ব্যাপারটা এবার অবিনাশের বোধগম্য হল। চন্দনা তাকে এই সুযোগ করে দিয়েছে বলে কৃতজ্ঞতা আশা করে। মুচকি হেসে পকেট থেকে এলিয়টের ওপর সেই লেখাটা বের করল অবিনাশ। চন্দনার হাতে দিয়ে বলল,—'কী, এবার খুশি তো?'

—'অফকোর্স।' চন্দনা আগের মতোই ফিসফিসিয়ে জবাব দিল।

বাস থেকে নেমে বিশাখা বলল,—'বেশি রাত্তির কিন্তু হয়নি। বিভুতোষের বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাস ধরে এতখানি পথ আসতেও তো সময় লেগেছে।'

—'তা ঠিক।' অবিনাশ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে জবাব দিল,—'এখনও সাড়ে আটটা বাজেনি।'

ট্রামলাইন পেরিয়ে দুজনে মির্জাপুর স্ট্রিট ধরে হাঁটতে লাগল। দোকানপাট অনেক বন্ধ। পথে লোকজনও কম। অবিনাশ হঠাৎ নিজেই বলল,—'এলিয়টের ওপর লেখাটা চন্দনাকে দিয়ে এলাম।'

—'ভালো করেছেন।' বিশাখা আড়চোখে তার মুখের দিকে এক পলক তাকিয়ে হাসল। বলল,—'লেখাটা চন্দনার খুব ভালো লেগেছে।'

—'কিন্তু আপনার কেমন লেগেছে তা একবারও বলেননি।' অবিনাশ যেন দুঃখ করল।

—'তার কি কোনো প্রয়োজন আছে?' বিশাখা পাল্টা প্রশ্ন করল। ফের মৃদু হেসে বলল,—'আচ্ছা, আসরে অত লোক আপনাকে তারিফ করল, সভাপতি নিজে দাঁড়িয়ে কনগ্র্যাচুলেট করলেন—এতেও আপনি খুশি হননি?'

—'খুশি নিশ্চয়।' অবিনাশ স্বীকার করল। বলল,—'তবু আপনার মতামতের তো একটা মূল্য আছে।'

—'আছে বুঝি?' বিশাখা মুচকি হাসল। ফের অপাঙ্গে অবিনাশের মুখের ওপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল,—'সত্যি কথা শুনবেন?'

—হ্যাঁ নিশ্চয়।'—এক মুহূর্ত থামল অবিনাশ। ফের তাড়া দিল, —'কই বলুন, দেরি করছেন কেন?'

বিশাখা ঠোঁটের ফাঁকে এক চিলতে হেসে বলল,—'আচ্ছা লোক আপনি? এতটুকু ধৈর্য নেই।' তার কণ্ঠস্বর এবার যেন ঈষৎ ভারি শোনাল। সে বলল, —'জানেন, ওই লেখাটা আপনি পড়তে শুরু করবার ঠিক আগে আমার কেমন ভয় করছিল।'

—'ভয়? কেন?'

—'বারে! যদি লেখাটা কারও ভালো না লাগে। আড়ালে এই নিয়ে ওরা হাসাহাসি করে?'

—'তাই?' অবিনাশ ভ্রূ কোঁচকাল।

বিশাখা বলল,—'তারপর পড়া শেষ হতেই যখন সবাই হাততালি দিল, তখন আনন্দে আমার চোখ বুজে এসেছে। শেষে অরূপদা আবার দাঁড়িয়ে উঠে আপনাকে কনগ্র্যাচুলেশন জানাল, তখন বিশ্বাস করুন আমার এত ভালো লাগছিল তা কাউকে বোঝাতে পারব না।'

অবিনাশ একটি কথাও বলতে পারল না। আনন্দের সেই অদৃশ্যধারা কখন যেন সংক্রামিত হয়ে তার অন্তরে প্রবেশ করেছে। মনে হল জীবনের দেবতা অকস্মাৎ এক অকৃপণ দাক্ষিণ্যে তাকে পরম সৌভাগ্যবান করে দিয়েছেন। কথা বলতে গিয়ে তার স্বর বেরোল না। কয়েক সেকেন্ড বিশাখার মুখের দিকে তাকিয়ে সে আবার ধীরে ধীরে চোখ নামিয়ে নিল।

ইতিমধ্যে আমহার্স্ট স্ট্রিট এসে গেছে। দুজনের কেউ সেটা খেয়াল করেনি। সচেতন হতে অবিনাশ বলল,—'আমি তাহলে আসি। পরে আবার দেখা হবে।'

পেছন ফিরে অবিনাশ ধীর গতিতে তার মেসের দিকে ফিরে চলল। আনন্দ আর দুঃখ মাঝে মাঝে একই ধরনের অনুভূতির জন্ম দেয়। অবিনাশের মনের গভীরে ঠিক তেমন একটা ভাব রূপ নিচ্ছিল। আজকের এই ব্যাপারটা এক অদ্ভুত আনন্দের। কিন্তু তার জন্য অবিনাশ উল্লাসে ফেটে পড়েনি। বুকের মধ্যে চাপা

কান্না নিয়ে মানুষ যেমন ধীরে হেঁটে চলে, অবিনাশ প্রায় তেমনি বিলম্বিত পদক্ষেপে এগিয়ে চলল। শুধু মনের মধ্যে সেই অব্যক্ত আনন্দটা তাকে মুহূর্তের জন্য শিহরিত করে পরক্ষণেই এক পরম পুলকে তার অন্তর ভরে তুলছিল।

দিন দুই পরে ফের একটা ঘটনা হল। বেলা দুটো নাগাদ খবর পাওয়া গেল প্রফেসর ঘোষালের ক্লাস নাকি হবে না। উনি অসুস্থ। তার মানে একটা পিরিয়ড অফ, এখানে-সেখানে ইচ্ছেমতো আড্ডা দিয়ে বেড়াও। অবিনাশ করিডোর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সংস্কৃত বিভাগে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিল। হঠাৎ পিছন থেকে চন্দনা তাকে ডাকল,—'এই অবিনাশ। দাঁড়াও, কথা আছে।'

কাছে এসে চন্দনা বলল—'শিগগির যাও, বিশাখা তোমাকে খুঁজছে। জরুরি কাজ।'

—'জরুরি কাজে আমাকে?' অবিনাশ রীতিমতো অবাক হয়ে তাকাল।

চন্দনার চোখে চাপা হাসি। কোথায় যেন একটা রহস্য আছে। সেটা আঁচ করতে পেরে অবিনাশ শুধোল,—'ব্যাপার কী? ফাজলামি কবছ না তো?'

—'আমাকে বিশ্বাস করে দেখো। যদি না যাও, তাহলে কিন্তু পরে পস্তাবে।' চন্দনা মুচকি হাসল।

—'কী যে হেঁয়ালি করো।' অবিনাশ ঈষৎ বিরক্তি প্রকাশ করে শুধোল, —'বিশাখা কোথায়?'

—'ক্যান্টিনেব কাছে। ওদের ক্লাসের করবীর সঙ্গে দাঁড়িয়ে গল্প করছে।'

অবিনাশের এবার মনে হল কথাটা হয়তো মিথ্যা নয়। যে-কোনো কারণেই হোক বিশাখার নিশ্চয় তাকে প্রযোজন আছে। তবে চন্দনা ব্যাপারটা জানে, কিন্তু সেটা ভাঙতে চায় না।

ক্যান্টিনের কাছে দাঁড়িয়ে বিশাখা একটি মেয়ের সঙ্গে গল্প করছিল। সম্ভবত ওরই নাম করবী। তাকে দেখতে পেয়ে মেয়েটি পিছন ফিরে চলে গেল। পরক্ষণেই বিশাখা তার দিকে এগিয়ে এল। ঈষৎ কুণ্ঠার সঙ্গে বলল,—'আসুন, আসুন। চন্দনা নিশ্চয় আপনাকে খবর দিয়েছে।'

'হ্যাঁ। কী একটা জরুরি কাজে আপনি নাকি খুঁজছেন।'

বিশাখা সলজ্জ হেসে বলল,—'খুঁজছি মানে,—তাহলে ব্যাপারটা খুলে বলি। কিন্তু আপনি আবার কিছু মনে করবেন না তো?'

—'কী ব্যাপার বলুন তো? আপনি এত সঙ্কোচ করছেন কেন?'

বিশাখা তবু বলল,—'জানেন, চন্দনাকে আমি বারণ করেছিলাম। হয়তো আপনার অসুবিধে থাকতে পারে। কিন্তু ওর বিশ্বাস, ব্যাপারটা শুনলে আপনি নিশ্চয় রাজি হবেন।'

অবিনাশ আর কোনো প্রশ্ন করল না। শুধু বাকিটুকু শোনার জন্য জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল।

বিশাখা নরম গলায় বলল,—'আমার কাছে দুটো সিনেমার টিকিট আছে।

মেট্রোতে ম্যাটিনি শো'র। কিন্তু এই মুহূর্তে তেমন কাউকে সঙ্গী পাচ্ছি না। অথচ একা অতদূরে যেতেও খুব খারাপ লাগছে।'

ব্যাপারটা এতক্ষণে তার বোধগম্য হল। এমন একটা লোভনীয় প্রস্তাব। কান অনেক সময় প্রবঞ্চনা করে। এটা তাই নয় তো? কিন্তু আশ্চর্য! বিশাখা সত্যি কাউকে ছবি দেখার সঙ্গী পায়নি? চন্দনা কিংবা মেয়েরা কেউ নিশ্চয় যেতে পারত। বিশাখা কৈফিয়ত দেবার ঢঙে বলল,—'বিভুতোষ আজ ক্লাসে আসেনি। নইলে ও নিশ্চয় যেতে রাজি হত। আর চন্দনাকে বলা মিথ্যে। ওর মা কী রকম কড়া জানেন তো? বাড়িতে বলে আসেনি। ম্যাটিনি শো হলেও এসপ্ল্যানেড থেকে শ্যামবাজার যেতে তা প্রায় সাতটা বাজবে।'

অবিনাশ হেসে বলল,—'তাহলে চলুন, ছবিটা দেখে আসি।'

—'আপনি যাবেন?' বিশাখা আনন্দে উজ্জ্বল হল।

—'অগত্যা।' অবিনাশ নির্বিকার চোখে তাকাল। ফের বলল,—'কিন্তু কী বই হচ্ছে মেট্রোতে?'

—'দি রোমান হলিডে। পুরোনো বই, আগেও কলকাতায় এসেছে। কিন্তু আমার দেখা হয়নি। তাই আজ আর মিস্ করতে চাই না।' কী ভেবে বিশাখা ফের জিজ্ঞাসা করল,—'ছবিটা আগে আপনি দেখেছেন নাকি?'

অবিনাশ মাথা নাড়ল। সে মফস্বলের কলেজে পড়াশুনো করেছে। ইংরেজি বই সেখানকার হলে বড় একটা যায় না। গেলেও সেটা বাচ্চাদের দেখবার,—টার্জানের বই-টই।

বিশাখা বলল,—'শুনেছি গ্রেগরি পেক্ দারুণ অভিনয় করেছে। আমার মনে হয় ছবিটা আপনার ভালো লাগবে।'

টিকিট দেখে গেটকিপার তাদের দোতলায় যেতে নির্দেশ দিল। তখনও বই শুরু হতে মিনিট কয়েক দেরি। সিটে বসে অবিনাশের মনে হল আসন দুটো বেশ দামি। প্রায় পিছনের সারিতে কোণের দিকে। সম্ভবত ফার্স্ট ক্লাসের ওপরে,—ড্রেস সার্কেল কিংবা ওই গোছের কিছু হবে।

শুরু হতেই অবিনাশ নিবিষ্ট মনে বই দেখতে লাগল। চমৎকার গল্প। বিদেশের এক রানী সফরে এসেছেন অন্য এক রাজ্যে। দিনভর তার ঠাসা এনগেজমেন্ট। ঘড়ির কাঁটা ধরে নিয়মের শৃংখলে তা এগিয়ে চলে। শেষ পর্যন্ত এই রুটিনের ভারে ক্লান্ত অল্পবয়সি মেয়েটি একদিন রানির আবাস ছেড়ে পালাল। তারপর সমস্ত দিন তার এক নতুন জীবন,—রানির খোলস ছেড়ে অনাস্বাদিত ছুটির আনন্দে সে মশগুল হয়ে রইল।

ইনটারভ্যালের সময় বিশাখা ঠাট্টা করল,—'একেবারে তন্ময় হয়ে বই দেখছেন।'

—'হ্যাঁ। ছবিটা বিউটিফুল।' অবিনাশ প্রশংসায় মুখর হল। 'চন্দনা ঠিকই

বলেছিল, যদি আপনার সঙ্গে দেখা না করি তাহলে পরে পস্তাতে হবে।'

বিশাখা আড়চোখে তার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল,—'চন্দনা এই কথা বলেছিল বুঝি?'

—'হ্যাঁ, মানে—' অবিনাশ হঠাৎ বিশাখার মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেল। মনে হল তার ঠোঁটে একটা দুর্জ্ঞেয় হাসি। হয়তো কথাটার অন্য কোনো অর্থ করে বিশাখা কিছু ভাবছে।

শো ভাঙলে দুজনে হল থেকে বেরিয়ে এলো। বিশাখা বলল,—'আজ চা খাওয়া হয়নি। চলুন, কাফে-ডি-মনিকোতে বসে এক কাপ খেয়ে যাই।'

—'আমার আপত্তি নেই।' অবিনাশ মুখ তুলে জবাব দিল। 'তবে একটা শর্তে।'

—'কী শর্ত আবার?'

—'শুধু চা নয়। তার সঙ্গে আরও কিছু খেতে হবে।' মুচকি হেসে বলল,—'মুখে লজ্জা করে তো কোনো লাভ নেই। খিদেয় পেট একেবারে চুঁই-চুঁই করছে।'

—'বেশ তো। চায়ের সঙ্গে স্যান্ডউইচ কিংবা ফিস্ ফ্রাই যা ইচ্ছে হবে খাবেন।'

—'আপনাকেও খেতে হবে।' অবিনাশ তার মনের ইচ্ছে ব্যক্ত করে ফের বিনীতভাবে বলল,—'তবে রেস্তোরাঁতে ঢুকে আপনি কিন্তু গেস্ট। কথাটা মনে রাখবেন।'

তার মতলব বুঝতে পেরে বিশাখা প্রবল আপত্তি তুলল। 'তাই কখনও হয়? ছবি দেখতে এসেছেন আমার সঙ্গে। আর আমি হব অতিথি?'

কাফে-ডি-মনিকোর পর্দা-ঢাকা গ্রিলে বসে অবিনাশ আয়েস করে চায়ের কাপে চুমুক দিল। ফিস-ফ্রাইতে একটা কামড় দিয়ে বলল,—'বেশ টেস্টফুল হয়েছে, তাই না?'

বিশাখা মুচকি হেসে জবাব দিল,—'ভালো লাগলে বলুন, আর এক প্লেট অর্ডার দিই?'

—'না-না। তার প্রয়োজন নেই।' অবিনাশ সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করল। বলল, —'আপাতত এই যথেষ্ট। তবে একটা কথা ভাবছি।'

—'কী ভাবছেন আবার?'

—'ভাবছি ঋণ কখনও ফেলে রাখতে নেই।'

—'আপনার আবার ঋণ কীসের?'

—'বারে! এই যে সুন্দর একটা ছবি দেখালেন। রেস্তোরাঁতে খাওয়াচ্ছেন। এরপরও আমি ঋণী নই?'

—'তাহলে কী করতে চান?'

—'যা করা উচিত তাই। অবিলম্বে ঋণ পরিশোধ করতে হবে।'

—'তার মানে?' বিশাখা ভ্রূ কুঁচকে তাকাল।

—'মানে, এরপর আমি দুটো সিনেমার টিকিট কাটছি। আপনাকে সঙ্গে যেতে

হবে। অবশ্য আপত্তি না থাকলে—'

'না না। আপত্তি কীসের?' বিশাখা মৃদু হেসে বলল,—'টিকিট কেটে একদিন আগে আমাকে জানাবেন, কেমন?'

পরদিন ক্লাসে ঢুকতেই চন্দনা নিশব্দে তার কাছে এসে দাঁড়াল। ফিসফিস করে শুধোল,—'কী, কতদূর এগোলে?'

—'মানে?' অবিনাশ যেন আকাশ থেকে পড়ল। 'তুমি কী বলতে চাও?'

—'আহা! ন্যাকামি দেখে বাঁচিনে। যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে শেখেননি।'

অবিনাশ মধুর হেসে বলল,—'তুমি যা সন্দেহ করছ, তা কিন্তু নয়। শো দেখার পর আমরা হল থেকে বেরিয়ে বাস ধবে বাড়ি ফিরে গেলাম।'

—'তাহলে তুমি একটা হোপলেস।' চন্দনা কথাটা তাকে ছুঁড়ে মারল। ফের কটাক্ষ করে বলল,—'এমন গোল্ডেন অপবচুনিটি পেয়েও মনের কথা জানাতে পারোনি?'

—'আচ্ছা, তুমি কী ভাবো বল তো চন্দনা?' অবিনাশ বোঝাতে চেষ্টা করল। 'মানে, বিশাখার সঙ্গে আমার ক'দিনের পরিচয়?'

—'তোমার দ্বারা কিচ্ছু হবে না।' চন্দনা তাকে এক বাক্যে খারিজ করে দিল। ফের ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল,—'জানো, গতকাল ম্যাটিনি শোতে কার সঙ্গে ওর সিনেমা যাওয়ার প্রোগাম ছিল?'

—'কার সঙ্গে?' অবিনাশ প্রায় নির্বোধের মতো প্রশ্ন করল।

—'সেটা তুমি আন্দাজ করে নাও।' চন্দনা এক পলক বাঁকা চোখে তাকিয়ে ধীরে ধীরে নামটা উচ্চারণ করল,—'অরূপ চৌধুরি।'

—'আই সি,' অবিনাশের গলাটা হঠাৎ কেমন শুকনো লাগল। একটা ঢোক গিলে সে বলল,—'ইয়ে, তাহলে উনি গেলেন না কেন?'

—'যাবে বলেই তো সব ঠিক ছিল। তাই আগেই টিকিট কাটা হয়েছে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে কী একটা জরুরি কাজে আটকা পড়ে গিয়েছিল, তাই—।'

—'তাই আমার ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ল।' বলেই অবিনাশ বিষণ্ণ হাসল।

চন্দনা বলল,—'বিশাখা অবশ্য তোমার কথা নিজে বলেনি। আগে বিভুতোষের খোঁজ করেছিল। তারপর আমাকে যেতে বলল। কিন্তু জানো তো, বাড়িতে সময় মতো না ফিরলেই মা এক অশান্তি শুরু করে দেবে। সেই হয়েছে জ্বালা। শেষে তোমার নাম বলতেই বিশাখা সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল।'

শুনে অবিনাশের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আগের সেই বিষণ্ণ মনমরা ভাবটা কাটিয়ে সে বলল,—'তখুনি বোধহয় আমাকে খবরটা দিতে ছুটলে?'

কিন্তু চন্দনা সে কথার জবাব না দিয়ে কী যেন চিন্তা করতে লাগল। ফের স্বগতোক্তির মতো বলল,—'এখন তো দেখছি বিশাখা গভীব জলের মাছ।'

—'তার মানে?' অবিনাশ ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

চন্দনা মুচকি হেসে জানাল,—'আমার ধারণা ছিল তোমার সম্বন্ধে বিশাখার দুর্বলতা আছে। কিন্তু সে রকম কিছুই তো ধরা পড়ছে না।' এক মুহূর্ত থেমে প্রায় বিলোল কটাক্ষ করে ফের বলল,—'তুমি সব চেপে যাচ্ছ না তো অবিনাশ?'

—'চেপে যাওয়ার মতো কিছুই তো নেই।' অবিনাশ ঈষৎ কাঁধ ঝাঁকিয়ে কথা শেষ করল।

চন্দনা বঙ্কিম দৃষ্টিতে তাকে একবার জরিপ করে নিয়ে বলল,—'তোমাকে তো আগেই জানিয়ে দিয়েছি বাপু। কম্পিটিশনে অরূপ চৌধুরিকে হারাতে হবে। নইলে বিশাখার মন পাওয়া কোনোদিন তোমার পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে।'

ওর কথা শুনে অবিনাশ বেশ দমে গিয়েছিল ঠিক। কিন্তু নিভে যাওয়ার আগের মুহূর্তে প্রদীপের সলতেটা যেমন দীপ্ত অগ্নিশিখায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, সেও প্রায় তেমনি মরিয়া হয়ে একটা কাণ্ড করে বসল। ইউনিভার্সিটির কাছেই একটা সিনেমা হলে ভালো বাংলা ছবি হচ্ছিল। তারাশংকরের 'কবি'। অবিনাশ দুম করে দুখানা দামি টিকিট কেটে সোজা ইকনমিকস্ ডিপার্টমেন্টে গিয়ে হাজির হল। বিশাখার খোঁজ করে বলল,—'কাল ম্যাটিনি শো দেখার ব্যবস্থা করেছি। বেলা দুটো নাগাদ কলুটোলা স্ট্রিটের গেটে আপনার জন্য অপেক্ষা করব, কেমন?'

বিশাখা একটু আশ্চর্য হয়ে শুধোল,—'টিকিট কাটা হয়ে গেছে?'

—'নিশ্চয়। নইলে আপনাকে বলতে আসি?' এক মুহূর্ত থেমে অবিনাশ প্রশ্ন করল,—'কেন, আপনার কোনো অসুবিধে আছে?'

—'না, অসুবিধে কীসের?' মুচকি হেসে বিশাখা পরিহাস করল, 'ঋণ শোধ করবার জন্য আপনি দেখছি খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।'

কিন্তু পরদিন দুপুরে বিধাতা স্বয়ং যেন তার বাড়া ভাতে ছাই দিতে এগিয়ে এলেন। বারোটা বাজতেই ঝমঝম বৃষ্টি। আকাশে ঘন কালো মেঘ। পাহাড়ি পথের মতো দামিনী অকস্মাৎ এঁকেবেঁকে আকাশ চিরে ছুটে গেল। পরক্ষণেই গুড়গুড় ধ্বনি,...কখনও দূরে কোথাও সশব্দে বাজ পড়ার শব্দ। অবিনাশ রীতিমতো বিক্ষুব্ধ হয়ে ঈশ্বরকে গালিগালাজ দিতে শুরু করল। বেলা দুটো নাগাদ ভগবান যেন একটু প্রসন্ন হলেন। বৃষ্টি কমে এল। অবিনাশ সাহসে বুক বেঁধে ধীরে ধীরে কলুটোলা স্ট্রিটের গেটের কাছে এসে দাঁড়াল। প্রায় তখুনি বিশাখাও নেমে এল। কিন্তু রাস্তায় এক হাঁটু জল। তাই দেখে একটা হতাশ ভঙ্গি করে বিশাখা বলল, —'যাঃ! এ যে সমুদ্দুর। সিনেমা যাওয়া ইম্‌পসিবল।' কিন্তু অবিনাশ তখন মরিয়া, যে-কোনো বাধাকেই সে অতিক্রম করবে। তা কয়েক মিনিট না যেতেই প্রায় অসম্ভবকে সে বাস্তব করে ফেলল। জলের মধ্যে কোথা থেকে একটা রিকশা এসে দাঁড়াতেই অবিনাশ এক লাফে তার ওপর উঠে বসল। তারপর বিশাখাকে লক্ষ করে বলল,—'আসুন আসুন। শো আরম্ভ হতে আর দেরি নেই।'

গেটের ওপাশে অগুনতি লোক, ছাত্রছাত্রী। তাদের চোখের সামনে শাড়িটা পায়ের ওপরে বেশ কিছুদূর তুলে বিশাখা কোনোমতে রিকশার ভিতরে গিয়ে বসল। এইভাবে অবিনাশের সঙ্গে যেতে তার খুব লজ্জা করছিল। কিন্তু আর ওসব ভেবে কোনো লাভ নেই। না যেতে চাইলে অবিনাশ নিশ্চয় তার ওপর রাগ করত। তবে যারা তাকে এই অবস্থায় রিকশাতে উঠতে দেখেছে, তারা অবশ্য এমন ঘটনা সবিস্তারে অন্যদের কাছে গল্প করতে ছাড়বে না।

বাইরে বৃষ্টি। রিকশা'র সামনে মোটা পর্দা। তবু কোনাকুনি জলের ছাঁট ঢুকছে। ঘেরাটোপের মধ্যে বসে অবিনাশ আচমকা ওর মাথার ওপর আলতোভাবে হাত রাখতেই বিশাখা যেন ঈষৎ শিহরণ অনুভব করল। সেদিকে লক্ষ না করেই অবিনাশ বলল,—'ইস্! একেবারে ভিজে গিয়েছেন। তাড়াতাড়ি মুছে ফেলুন। নইলে ভুগতে হবে।'

মাথা থেকে তার হাতটা সরিয়ে দিয়ে বিশাখা হাসল। কর্ণমূলে সামান্য রক্তোচ্ছ্বাস। কী সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে। অবিনাশের মনে হল কোনো অনাত্মীয়া যুবতীর ঠোঁটে এমন মিষ্টি হাসি সে কখনও দেখেনি।

প্রায় জনহীন পথ। পর্দার ফাঁক দিয়ে অবিনাশ বারিস্নাত কলকাতা শহরকে দেখছিল। সিনেমা হলটা বেশি দূরে নয়, কাছেই। ছাতা মাথায় দিয়ে দু-একজন পথচারী যাচ্ছে। জলের ছাঁট বাঁচাতে সে কিছুক্ষণ পর্দার প্রান্তটা চেপে ধরে রইল। তারপর আড়চোখে কখন যে বিশাখার চোখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল বুঝতে পারেনি।

হঠাৎ ফিসফিস করে বিশাখা শুধোল—'কী দেখছেন?'

অবিনাশ প্রথমে কোনো জবাব দিল না। একবার ভাবল বলে, যমুনার নীল জলের ছায়া।

বিশাখা ফের শুধোল,—'কই, কী দেখছেন বললেন না? আমি লক্ষ করেছি অন্য সময়েও চোখের দিকে আপনি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন।'

অবিনাশ একটা ঢোঁক গিলে বলল,—'ইয়ে, মানে তেমন কিছু নয়। আসলে আপনার চোখের মধ্যে ওই সাদা অংশটার ওপর একটা নীলচে আভা রয়েছে। সচরাচর এ রকম দেখা যায় না।'

বিশাখা হেসে চোখ নামিয়ে নিল। বলল,—'চোখের ওই সাদা অংশটাকে কী বলে জানেন?'

—'না।' অবিনাশ মাথা নাড়ল।

—'চোখের ওই সাদা অংশটার নাম স্ক্লেরা।'

—'নিশ্চয় ডাক্তারি নাম?' অবিনাশ ভ্রূ কোঁচকাল। ফের বলল,—'আপনি এসব জানলেন কেমন করে?'

—'আমার দাদুর কাছে শুনেছি। উনি ডাক্তার ছিলেন। স্কুলে পড়বার সময়

ছুটিছাটা হলেই মামাবাড়িতে চলে যেতাম। দাদু আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলতেন,—এ যে নীলনয়না সুন্দরী গো। তারপর আদর করে কোলে তুলে দিয়ে দিদিমাকে বলতেন,—বুঝলে, তোমার নাতনি নিশ্চয় আগের জন্মে মেমসাহেব ছিল।'

অবিনাশ পরিহাসের সুরে বলল—'উনি মিথ্যে বলেননি। সত্যি, আপনার চোখের মধ্যে একটা নীল ছায়া আছে।'

বিশাখার মুখ ফস্কে হঠাৎ বেরিয়ে গেল,—'জানেন না, অরূপদা তাই আমাকে নীলাঞ্জনা বলে খেপায়।'

অনেক কথা আছে, যা বলার ইচ্ছে থাকে না। যা বলা হয়তো উচিত নয়, হঠাৎ মুখ আলগা হয়ে বেরিয়ে যায়। কিন্তু তারপর কেমন যে লজ্জা লাগে। বিশাখার অবস্থা প্রায় তেমনি হল। ঈষৎ আরক্ত মুখ, একটা অপ্রস্তুত ভঙ্গি। কিন্তু ইতিমধ্যে যা হবার তা হয়ে গেছে। সামান্য ওই একটু কথায় অবিনাশের মুখখানা প্রায় ফিউজ হওয়া বাল্‌বের মতো নিস্তেজ, বেশ অপ্রসন্ন দেখাল। বিশাখা চেষ্টা করল, এটা-ওটা আরও পাঁচ রকম কথা বলে পরিস্থিতি অনুকূলে আনতে। কিন্তু ঠিক আগের মতো যেন আর জমল না। ছবি শুরু হতেই অবিনাশ গম্ভীর মুখে বই দেখতে লাগল। আর একটা কথাও বলল না।

পরদিন ক্লাসে গিয়ে অবিনাশ টের পেল সিনেমা যাওয়ার ব্যাপারটা গোপন নেই, ফাঁস হয়ে গেছে। পর পর দুটো পিরিয়ড ক্লাস হবার পর একটা ঘণ্টা অফ। নীচে নামবে বলে অবিনাশ করিডোর হয়ে সিঁড়ির দিকে যাচ্ছিল। এ মাসের মাইনে এখনও দেওয়া হয়নি। এই অফ-পিরিয়ডে যদি ক্যাশ-কাউন্টারে টাকাটা জমা দেওয়া যায়। আশুতোষ বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে লনে পা দিতেই বিভুতোষের সঙ্গে দেখা। ছেলেটা ভালো। বেশ হাসিখুশি, সাদাসিধে, খোলামেলা মন। তাকে দেখেই একগাল হেসে বলল,—'আরে মশায়, কাল নাকি আপনি এক কাণ্ড করেছেন।'

'কী কাণ্ড?' অবিনাশ সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল।

বিভুতোষ তেমনি হাসতে হাসতে বলল,—'কাণ্ড নয় আবার? এক হাঁটু জল ডিঙিয়ে বিশাখাকে রিকশা'তে তুলে ছবি দেখতে গিয়েছিলেন—।'

অবিনাশ লজ্জা পেল। কথাটা অস্বীকার করবার উপায় নেই। অথচ মেনে নিতেও কেমন সঙ্কোচ হয়। কিন্তু জবাবে কী বলা যায়? হঠাৎ একটা চিন্তা মনে আসতেই সে পাল্টা প্রশ্ন করল,—'ছবি দেখতে গিয়েছিলাম, একথা কার কাছে শুনলেন? বিশাখা বলেছে?'

—'রিকশা'তে উঠে দুজনে কোথায় গিয়েছিলেন সেটা কেউ বলতে পারেনি। তবে বিশাখাকে জিজ্ঞাসা করতেই সমস্ত ব্যাপারটা জানা গেল।' আগের মতো হেসে ফের মন্তব্য করল,—'তা মশায় আপনার বাহাদুরি আছে। ওই এক হাঁটু জলের মধ্যে রিকশা'তে করে ছবি দেখতে যাওয়ার একটা দারুণ থ্রিল, কী বলুন?'

বিকেলে চন্দনা তাকে খোঁচা দিতে ছাড়ল না। বলল, 'অবিনাশ, আমার কাছে সব চেপে যাচ্ছ। এটা কিন্তু ভালো হচ্ছে না।'

—'কী আবার চেপে গেলাম?' অবিনাশ নিপাট ভালোমানুষের মতো তাকাল।

—'আহা! উট পাখির মতো বালিতে মুখ গুঁজে দিয়ে ভাবছ কেউ কিছু টের পায়নি।'

অবিনাশ ধরা পড়েও সাধু সাজবার ভান করল।

চন্দনা ভুরু নাচিয়ে চোখ ঘুরিয়ে বলল,—'জানো মেয়েমহলে একেবারে ঢি ঢি পড়ে গেছে। তুমি নাকি এক হাঁটু জলের মধ্যে রিকশা দাঁড় করিয়ে পর্দা-ঢাকা সেই রিকশা'তে বিশাখাকে তুলে কোন সিনেমা হলে গিয়েছিলে?'

অবিনাশ মুচকি হেসে বলল,—'বেশ, আমি না হয় ব্যাপারটা চেপে গেছি। কিন্তু বিশাখা, সেও তো তোমাকে কিছু বলেনি?'

—'মেয়েরা কী এসব কথা সহজে চলতে চায়?' চন্দনা একটা টিপ্পনি কাটল। ফের আড়াচোখে অবিনাশের দিকে এক পলক তাকিয়ে বলল,—'না, এবার তুমি সকলকে টেক্কা দিয়েছ। একথা মানতেই হবে।'

—'কী বলতে চাও তুমি?' অবিনাশ সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করল।

চন্দনা ফিসফিস করে বলল,—'হাঁদারাম, পুরুষমানুষের মনে একটা জেলাসি হয়,—তাও বোঝ না? ব্যাপারটা এতক্ষণে নিশ্চয় অরূপ চৌধুরির কানে পৌঁছে গেছে। ব্যস্ বাছাধন এবাব প্রেম করার মজা টের পাক।'

চন্দনার ওই কথা শুনে সেদিন অবিনাশও এক বিজাতীয় আনন্দ অনুভব করেছিল। আসলে অরূপ চৌধুরির সম্বন্ধে তার মনে কখন যে একটা বিরাগ সৃষ্টি হয়েছে তা সে আগে বুঝতে পারেনি। তাই ইউনিভার্সিটি থেকে বাড়ি ফেরার সময় অবিনাশের বারবার মনে হতে লাগল, কম্পিটিশনে দাঁড়িয়ে এই বোধ হয় প্রথম অরূপ চৌধুরির বিরুদ্ধে সে একট প্লাস পয়েন্ট সংগ্রহ করতে পেরেছে। সম্ভবত সে কারণে চন্দনা আজ তাকে বাহবা দিয়েছে। বলেছে, সে নাকি এবার সকলকে টেক্কা দিয়ে এগিয়ে গেছে।

দিনগুলো এইভাবেই তরতর করে কেটে যাচ্ছিল। মাসে দু'বার নির্ধারিত স্থানে শনিবারের আসর। কখনও পড়ন্ত বেলায় কফিহাউসে বসে নির্ভেজাল আড্ডা। বিশাখার সঙ্গে কোনোদিন ইউনিভার্সিটির লনে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা হত। মাঝে মাঝে বাড়ি ফেরার সময় মির্জাপুর স্ট্রিট ধরে খানিকটা হেঁটে বিশাখাকে আমহার্স্ট স্ট্রিট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছে।

ইতিমধ্যে ফিফথ্ ইয়ার সাঙ্গ করে তারা সিকসথ্ ইয়ারে উঠল। ফেলে আসা ক্লাসঘরে এখন নবাগত ছেলেমেয়ের ভিড়। করিডোরে, গেটের কাছে নতুন মুখ। একনজর তাকালেই বোঝা যায় বিশ্ববিদ্যালয়ে এরা নবীন আগন্তুক।

তারপর হঠাৎ একদিন বিকেল বেলায় চন্দনা সেই খবরটা নিয়ে এল। প্রায়

হাঁপাতে হাঁপাতে বলল,—'এই, শুনেছ?'

অবিনাশ জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। শুধোল,—'ব্যাপার কী?'

—'এম, এ'র রেজাল্ট তো বেরিয়ে গেছে।' চন্দনা একগাল হেসে জানাল। বলল,—'অরূপদা এবারও ফার্স্ট, মানে গোল্ড মেডালিস্ট।'

—'তাই নাকি?' অবিনাশ ভ্রূ কোঁচকাল।

—'হ্যাঁ। একটু আগে তো রেজাল্ট ওয়াল-আপ করে দিয়েছে।'

চন্দনা জোরে নিশ্বাস ফেলছিল। মুচকি হেসে বলল,—'খবর শুনে বিশাখা আনন্দে ডগমগ। ওদিকে সবাই মিলে অরূপদাকে চেপে ধরেছে। শনিবারের আসরের সব মেম্বারকে খাওয়াতে হবে। তা অরূপদা রাজি। কিন্তু বিভুতোষের এক কথা। পার্ক স্ট্রিটের কোনো নামি রেস্তোরাঁ ভিন্ন সে অন্য কোথাও খেতে যাবে না।'

অবিনাশ অন্যমনস্কের মতো কী চিন্তা করছিল।

চন্দনা বলল,—'তা সে ব্যবস্থাও একরকম হয়ে গেছে। সামনের রবিবার বিকেল চারটেয় এভ্‌রিবডি ইনভাইটেড। অরূপদার শুধু পাত্তি দিলেই চলবে। সব ম্যানেজমেন্ট বিভুতোষের। রেস্তোরাঁ, মেনু সমস্ত কিছু সে ব্যবস্থা করবে।'

আনন্দ দূরে থাক, খবরটা শুনে অবিনাশের কেমন যেন অবসন্ন লাগল। মনে হল কম্পিটিশনে অরূপ চৌধুরি তাকে টেক্কা দিয়ে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এখন সে প্রায় নাগালের বাইরে।

চন্দনা বলল,—'রবিবার বিকেল চারটেয় কিন্তু ফ্রি থেকো। অবশ্য অরূপদা নিজেই ইনভাইট কবতে আসবে।'

অবিনাশের মুখ দিয়ে হঠাৎ ফস্‌ করে বেরিয়ে গেল,—'কিন্তু আমি তো বাড়ি যাচ্ছি।'

—'কবে?'

—'কাল কিংবা পরশু।' অম্লান বদনে সে মিথ্যাভাষণ করল।

চন্দনা চালাক মেয়ে। বোধহয় তার মনোভাব আঁচ করতে পেরে বলল,—'বাড়ি তো নেকসট্‌ উইকেও যেতে পার।'

—'না—না। জরুরি কাজ আছে। পরের সপ্তাহে গেলে চলবে কেমন করে?'

চন্দনা বাঁকা হেসে বলল,—'তোমার ব্যাপার অবশ্য তুমি ভালো বুঝবে। কিন্তু অরূপদা আর বিশাখা দুজনেই আসবে। সঙ্গে বিভুতোষও থাকতে পারে। দেখা যাবে এদের সকলকে তুমি কেমন করে এড়িয়ে যাও।'

সমস্যা একটা দেখা দিতে পারে ভেবে অবিনাশ পরদিন রসুলপুর রওনা হয়ে গেল। তবে সাত-তাড়াতাড়ি বেস্পতিবার সকালে তার দেশে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু পাছে বিশাখা আর অরূপ চৌধুরি পরদিন তাকে পাকড়াও করে এবং সকলের অনুরোধ এড়াতে না পেরে পার্ক স্ট্রিটে সেই রেস্তোরাঁয় যেতে

হয়, তাই ভোর না হতেই হাওড়া স্টেশনে গিয়ে টিকিট কেটে ট্রেনে উঠে পড়ল।

বাড়ি থেকে ফিরে অবিনাশ এবার নিজেকে গুটিয়ে নিল। শুধু ক্লাস আর লাইব্রেরি ছাড়া বড় একটা কোথাও যেত না। শনিবারের আসরেও বেশ কয়েকবার অনুপস্থিত থাকল। এই নিয়ে অবশ্য কেউ কিছু বলেনি। অনেকেই ভেবেছে, পরীক্ষা এগিয়ে এল। তাই অবিনাশ বোধহয় পড়াশুনো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

চন্দনা একদিন বলল,—'ব্যাপার কী অবিনাশ? এখনও তো এগজামিনেশনের দেরি আছে। এরই মধ্যে এমন দিনরাত পরিশ্রম শুরু করলে—'

—'এ ছাড়া উপায় কী? পড়াশুনো তো কিছুই হয়নি। অবিনাশ একটা কৈফিয়ত দিল।

—'তাহলে আমাদের কি দশা হবে?' চন্দনা হতাশ ভঙ্গি করে তাকাল। ফের যেন চিমটি কেটে বলল,—'চেষ্টা করে দেখো। যদি অরূপ চৌধুরির থেকে বেশি নম্বর পাও। তাহলে হয়তো মুখরক্ষে হবে।'

খোঁচাটা অবিনাশ নিঃশব্দে হজম করল। একথার কোনো জবাব দিল না।

বিশাখার সঙ্গে গায়ে পড়ে ঘনিষ্ঠতা করতে সে আর যায়নি। চন্দনার মাধ্যমে মাঝে মাঝে খবর পেত অরূপ চৌধুরি নাকি কলকাতার কোন কলেজের লেকচারার। তবে অ্যাকাডেমিক লাইনে থাকার তার ইচ্ছে নয়। সে একটা কম্পিটিটিভ পরীক্ষা দেবার চেষ্টা করছে। ওরা দুজনে গ্লোবে একদিন ছবি দেখতে গিয়েছিল। হল থেকে বেরিয়ে অরূপ চৌধুরি আবার রেস্তোরাঁতে নিয়ে গিয়ে প্রচুর খাইয়েছে।

মনে মনে অবিনাশ একটা প্রতিজ্ঞা করেছিল। এম. এ. পরীক্ষার রেজাল্ট না বের হওয়া পর্যন্ত আর কলকাতায় আসবে না। ঠারে ঠোরে চন্দনাকে প্রায় তেমন একটা ইঙ্গিত দিয়েছিল। যদি ফার্স্ট হতে পারে তাহলেই আবার এসে দেখা করবে। তখন সকলকে সঙ্গে নিয়ে পার্ক স্ট্রিটের কোনো নামি রেস্তোরাঁয় যাবে। এই তার ইচ্ছে।

চন্দনা শুনে বলেছিল,—'আমরা তাই আশা করব। পরীক্ষা যখন ভালো হয়েছে তখন রেজাল্ট অবশ্য ভালো হবে।'

কলকাতা ছেড়ে আসার আগে বিশাখার সঙ্গে একবার কথা হয়েছিল। লাইব্রেরিতে একটা বই ফেরত দিয়ে অবিনাশ দ্রুত পায়ে নামছিল। করিডোরে দাঁড়িয়ে বিশাখাকে একটি মেয়ের সঙ্গে সে গল্প করতে দেখল।

তাকে দেখে বিশাখা কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল,—'পরীক্ষা কেমন দিলেন?'

—'মোটামুটি।' অবিনাশ প্রশ্নটা যেন এড়িয়ে যেতে চাইল।

—'উঁহু!' বিশাখা সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে বলল,—'চন্দনার কাছে শুনেছি আপনি খুব ভালো পরীক্ষা দিয়েছেন।'

—'তেমন কিছু নয়।' অবিনাশ নিরুচ্ছ্বাস কণ্ঠে জবাব দিল।

বিশাখা হেসে বলল,—'এখন বোধহয় বাড়ি যাবেন?'

—'হ্যাঁ।' অবিনাশ ছোট্ট উত্তর দিল। এক মুহূর্ত ভেবে ফের বলল,—'এখানে থেকে আর কী করব?'

—'কলকাতায় এলে নিশ্চয় দেখা কববেন, কেমন? আমি কিন্তু আশা করে থাকব।' কয়েক মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে ফের হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে বিশাখা চলে গেল।

অবিনাশ শ্লথগতিতে নামছিল। বিশাখার শেষের কথাগুলি তার মনের মধ্যে বাববার ধ্বনিত হতে লাগল। কলকাতায এলে অবিনাশ যেন অবশ্য তার সঙ্গে দেখা করবে। কিন্তু পরীক্ষার বেজাল্ট বেবোতে তো অনেক দেরি। বহু আকাঙ্ক্ষিত সেই সুখববটি পেলেই বিশাখার কাছে বিজয়ী বীরের মতো সে গিয়ে দাঁড়াতে পারে।

পাঁচ

কিন্তু এম. এ. পরীক্ষার ফল তাকে সম্পূর্ণ হতাশ করল। ফার্স্ট ক্লাস দূরে থাক, সেকেণ্ড ক্লাসেও তিনজনের নীচে নাম। অবশ্য ফার্স্ট ক্লাস মাত্র একজন পেয়েছে। আর অবিনাশ সেকেন্ড ক্লাস ফোর্থ। রেজাল্ট বেরোবার দিন দুই আগে সুকোমল তাকে চিঠি দিয়েছিল। ওর কোন এক আত্মীয় ট্যাবুলেশনের কাজে বয়েছে। তার সূত্রেই সুকোমল গোপনে খবরটা জানতে পারে।

এই রেজাল্ট নিয়ে কারও সামনে দাঁড়াবার মুখ নেই। দেখা করতে গেলে চন্দনা হয়তো সমবেদনা জানাবে,—'আহা! তুমি তো আর চেষ্টার ত্রুটি করনি। দিনরাত্তিব কী পরিশ্রম না করলে। কিন্তু কপালে নেই। তাই ফালতু মন খারাপ করে কী লাভ? বরং ভাগ্যকেই মেনে নাও।'

বিশাখা বড়জোর আর একটু সহৃদয় হতে পারে। সে বলবে,—'ভাগ্যে নেই, এমন একটা দোহাই হয়তো দেওয়া চলে। কিন্তু আসলে আমাদের দেশের এগজামিনেশন সিসটেমটাই কেমন গোলমেলে। নইলে অবিনাশবাবুর মতো ভালো ছেলের নিশ্চয় ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া উচিত ছিল।'

শেষ পর্যন্ত অবিনাশ মনঃস্থির করে ফেলল। কলকাতায় আর কোনোদিন যাবে না। বাকি জীবনটা মফস্বলেই কাটিয়ে দেবে। চেষ্টা-চরিত্র করলে হয়তো কলকাতার কলেজে একটা চাকরি জুটত। কিন্তু ইচ্ছে করেই অবিনাশ আর মহানগরীর ধারেকাছে ঘেঁষল না। বরং খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে চাকরির দরখাস্ত পাঠাতেই চটজলদি বাঁকুড়া থেকে ইনটারভিউয়ের চিঠি এল। তারপর মাসখানেকের মধ্যেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট। অবিনাশ বিলম্ব না কবে জিনিসপত্র গুছিয়ে চাকরিতে জয়েন করল।

পুরো দুটি বছর বাঁকুড়াতে প্রফেসরদের মেসে কাটল। পুজোর ছুটিতে বাড়ি ফিরতেই সুহাসিনী ছেলের ওপব প্রায় চড়াও হল। কোমরে কাপড় জড়িয়ে রীতিমতো রাগের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল,—'আয়নাতে নিজের চেহারাখানা একবার দেখেছিস্?'

অবিনাশ আচমকা ঠিক এমন একটা প্রশ্নের মোকাবিলা করতে না পেরে শুধোল,—'কেন, কী হয়েছে?'

—'কী হয়নি বরং তাই জিজ্ঞেস কর্।' সুহাসিনী ঝাঁজের সঙ্গে জবাব দিল। ফের বলল,—'তোর কণ্ঠার হাড় দুটো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। চোখ দুটো বসে

যাবার জোগাড়। হঠাৎ কেউ দেখলে ভাববে বোধহয় একটা শক্ত ব্যামো থেকে উঠেছিস।'

মা যে কী বলতে চায় তা বুঝতে অবশ্য অসুবিধে হয় না। কিন্তু অবিনাশ নানা অজুহাতে কোনোদিন তাকে এ ব্যাপারে আমল দেয়নি। কিন্তু সুহাসিনী নাছোড়বান্দা। প্রতিবার সে বাড়িতে এলেই একটা ছলছুতো করে এই প্রসঙ্গটা তুলবে। অবিনাশও সমান প্রতিপক্ষের মতো মায়ের কৌশলকে পাল্টা নানা যুক্তি দেখিয়ে এড়িয়ে গেছে। কিন্তু সুহাসিনী এবার আটঘাট বেঁধে তৈরি। তলে তলে সব ব্যবস্থা পাকা করে ছেলের সামনে এসে হাজির হয়েছে। অবিনাশ তাই কোনো জবাব না দিয়ে ভ্রূ কুঁচকে মায়ের মুখের দিকে তাকাল।

একগাল হেসে সুহাসিনী আসল কথাটা পাড়ল। 'এবার তুই আর আপত্তি করিস্‌নি অবু। মেসের ওই ছাইভস্ম গিলে তোর যা ছিরি হচ্ছে দিন দিন। আর শোন্‌, মেয়েটিকে আমি বর্ধমানে গিয়ে দেখে এসেছি। বি. এ. পাশ। চমৎকার মুখশ্রী। আমি বলছি ওর সঙ্গে বিয়ে হলে তুই সুখী হবি।'

পৃথিবীতে বোধহয় সময়ের মতো আশ্চর্য আর কিছু নেই। শুকনো ফুটিফাটা, চৌচির হয়ে যাওয়া মাটির বুকে প্রথম বর্ষার স্নিগ্ধ স্পর্শ যেমন ত্বরিৎ সবুজের ছোঁয়া নিয়ে আসে, তেমনি সময় মানুষকে সব দুঃখ-কষ্ট ভুলিয়ে ফের সেই সতেজ প্রবর্ধমান জীবনের লাবণ্যে ভরে তোলে। মায়ের প্রস্তাব খণ্ডন করবার মতো জোরালো যুক্তি অবিনাশ আর খুঁজে পেল না। তাছাড়া এই দু-বছরে বন্দর ছেড়ে আসা জাহাজের মতো অবিনাশ বহুদূরে ভেসে এসেছে। পোস্টগ্র্যাজুয়েট ক্লাসের সেই সুখ-দুঃখের দিনগুলো ক্রমেই যেন দিগন্তে পরিদৃশ্যমান নীল অরণ্যানির মতো ঝাপসা মনে হয়। তবু কলকাতার মেয়ে শুনে অবিনাশ একটু আপত্তি করেছিল। তা সুহাসিনী সে কথা হেসে উড়িয়ে দিল। বলল,—'চেতলায় ওর বাবা একটা ছোট্ট বাড়ি করেছে। কিন্তু দেশ তো এই বর্ধমানে। জ্যাঠা-খুড়ো সব তো এখানেই বাস করে।'

বিয়ের আগে অবিনাশ মেয়ে দেখেনি। বৌদি শুনে বলল,—'পরে কিন্তু আমাদের দোষ দিও না ভাই। সাত পাক দুজনে একসঙ্গে হাঁটলেই সারা জীবনের সম্বন্ধ হয়ে গেল। এ তো আর বাজারের জিনিস নয় যে, পছন্দ হয়নি বলে ফের পাল্টে নিয়ে আসবে।'

কিন্তু অবিনাশের এক কথা। মা যখন পছন্দ করেছে তখন তার দেখার কোনো প্রয়োজন নেই। তাছাড়া চাক্ষুষ না হলেও মেয়ের ছবি তো সে দেখেছে। অপছন্দের কথা একবারও বলেনি।

শুভদৃষ্টির সময় মালতীকে দেখে অবিনাশের ভালো লাগল। বোধহয় বিয়ের সাজে সব মেয়েকেই এমনি মধুর লাগে। কপালে কনেচন্দন, পরনে বেনারসি, মাথায় ছোট্ট মুকুটখানি। গালের দুপাশে সুন্দর একটুখানি নকশা। ঠোঁটে সলজ্জ

হাসি। মালাবদল করতে গিয়ে অবিনাশ দু-চার সেকেন্ড বউয়ের মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

ফুলশয্যার রাত্তিরে মালতী তাকে বলেছিল,—'আচ্ছা, তুমি নাকি কলকাতার মেয়ে শুনে বিয়ে করতে আপত্তি করেছিলে? তার কারণ?'

কথার জবাব দিতে গিয়ে অবিনাশ সামান্য নার্ভাস বোধ করল। তার কেমন সন্দেহ হল ব্যাপারটা তাহলে কি ফাঁস হয়ে গিয়েছে? কিন্তু তাই কখনও সম্ভব? তবে এমনও তো হতে পারে মালতীদের কোনো আত্মীয়টাত্মীয় পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ক্লাসে একই সময়ে তার সহপাঠী ছিল? যদি সে কিছু বলে থাকে? বউয়ের মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে এক নজর তাকিয়ে অবিনাশ কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হল। না, সেরকম তো কই মনে হয় না। একটা ঢোক গিলে জিভটাকে ফের সচল করে নিয়ে সে বলল,—'ইয়ে মানে তেমন কোনো কারণ নেই। তবে আমরা হলাম মফস্‌সলের লোক। আধা-শহর আধা-গ্রামে থাকি। কলকাতার মেয়ে যদি এখানে না মানিয়ে নিতে পারে!'

বিয়ের মাস তিন বাদেই মা এরকম জোর করে মালতীকে তার সঙ্গে পাঠিয়ে দিল। অবিনাশ প্রথমে মৃদু আপত্তি করেছিল,—'এত তাড়াতাড়ি ওকে পাঠানোর কী দরকার বল তো? কিছুদিন তোমার কাছে থেকে কাজকর্ম শিখে নিক। তারপর না হয় বাঁকুড়া যাবে।'

কিন্তু সুহাসিনী তাকে মোটে আমল দিল না। ছোট্ট একটু ধমক দিয়ে বলল, —'তুই থাম দিকি অবু। বৌমা সব কাজকর্ম জানে। আর ওকে রসুলপুরে রেখে তুই সেই মেসে পড়ে থাকবি এরকম নিশ্চয় আমি চাইনি।'

দুপুর বারোটা নাগাদ দুজনে বাসে উঠল। ট্রেনে যেতে অনেক ঝামেলা। দুর্গাপুর স্টেশনে নেমে বাস কিম্বা মিনিবাস ধরতে হয়। তার আগে আর এক হাঙ্গামা। রসুলপুর স্টেশনে সব ট্রেন থামে না। বর্ধমানে গিয়ে ফের দুর্গাপুরের গাড়িতে উঠতে হবে।

বিকেল তিনটে নাগাদ বাস বেলেতোড় পিছনে ফেলে এগিয়ে চলল। বাঁদিকে হঠাৎ একটা পাহাড় দেখা দিল। নীলবর্ণ, হাতির পিঠের মতো পাহাড়। যেন আকাশে হেলান দিয়ে আরামে চোখ বুজে আছে।

পাশাপাশি দুটি সিট। জানালার ধারে মালতী বসে। পাহাড়টা দেখতে পেয়ে সে প্রায় ছেলেমানুষের মতো চেঁচিয়ে উঠল,—'ওগো দেখো, কী সুন্দর পাহাড়টা।'

এতকাল কলকাতাতেই মানুষ। বোঝাই ট্রাম-বাস, হৈ-হৈ সিনেমা-থিয়েটার, অগুনতি মানুষের ভিড়, কলকোলাহল,—এই দেখে এসেছে। এমন উদার উন্মুক্ত প্রকৃতি, অসীম নীলাকাশ, দিগন্তে পরিদৃশ্যমান বনপাহাড় তার চোখে পড়েনি। তাই স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে অবিনাশের মমতা হল। ফের হেসে বলল,—'পাহাড়টার কী নাম জান?'

—'কী?' মালতী জিজ্ঞাসু চোখে শুধোল। অবিনাশ বলল,—'শুশুনিয়া। বাঁকুড়া থেকে ওটা পনেরো-ষোল মাইল হবে। ওখানে অতীতের রাজাদের কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে। শীতকালে আমাদের কলেজের ছেলেরা ওই পাহাড়ে পিকনিক করতে যায়।'

—'তাই?' মালতী খুশি হয়ে বলল,—'এই, এবার পিকনিকের সময় তুমিও ওদের সঙ্গে চলো না!'

—'তারে মানে?' অবিনাশ অবাক হয়ে তাকাল।

—'বারে! তুমি গেলে আমিও সঙ্গে যেতাম।' চোখ ঘুরিয়ে ফিক করে হেসে মালতী যেন আবদার রাখল।

বাঁকুড়া শহরে বাস ঢুকতেই অবিনাশ ব্যস্ত হয়ে উঠল। স্ত্রীকে বলল,—'চটপট গুছিয়ে নাও। এখানেই নামতে হবে। নইলে বাস স্ট্যান্ড তো সেই ধ্যাড়ধ্যাড়া গোবিন্দনগরে। সেখান থেকে আসতে অন্তত পাঁচটি টাকা রিকশা ভাড়া গচ্চা যাবে।'

প্রতাপবাগানে একটা ছোট্ট বাড়ি অবিনাশ ভাড়া নিয়েছে। মাত্র দুখানি ঘর, একটুখানি রান্নার জায়গা। বাথরুম, ডাইনিং স্পেস সবই আছে। তবে বাড়িতে কল নেই। সামনে বেশ খানিকটা জায়গা। একপাশে কুয়ো, প্রয়োজন মতো সেখান থেকে জল নেওয়া যায়। তবে ব্যবস্থা করলে বাইরে কল থেকেও জল পৌঁছে দিয়ে যাবে।

কম্পাউন্ড ঘেরা একমানুষ উঁচু দেয়াল। গেট ঠেলে ভিতরে ঢুকেই মালতী সহর্ষে বলে উঠল,—'চমৎকার বাড়ি।'

রিকশা থেকে মালপত্র নামিয়ে অবিনাশ শুধোল,—'তোমার পছন্দ হয়েছে? মাত্র দুটি ঘর কিন্তু।'

—'তা হোক। দুজনের পক্ষে দুটো ঘর যথেষ্ট।' বলেই মালতী সমস্ত বাড়িটা বেশ ভালো করে পর্যবেক্ষণ শুরু করল।

মালপত্র ঘরের একপাশে রেখে অবিনাশ একটা চেয়ার টেনে আরাম করে বসল। কদিন আগেই সে মেস থেকে এখানে উঠে এসেছে। তার জিনিসপত্র বলতে একটা খাট, তার ওপরে বিছানা পাতা। দুটো চেয়ার, পড়াশুনো করবার টেবিল। ডাঁই করে রাখা একগাদা বইখাতা। কোণের দিকে একটা অ্যাসট্রেতে বোধহয় তিন মাসের ছাই জমে আছে। বিবর্ণ ময়লা একটা নীল রঙের মশারি কেউ গুটিয়ে বিছানার একপাশে রেখেছে।

চারদিকে নজর বুলিয়ে মালতী বলল,—'ইস্! কী নোংরা বিছানা তোমার? চাদরটা কতদিন কাচতে দাওনি বল তো?'

—ইয়ে, মানে গত সপ্তাহে যেন একবার দিয়েছিলাম।' অবিনাশ আমতা আমতা করল।

—'মিথ্যে কথা। অন্তত একমাস ধরে এই চাদরটা তুমি বিছানায় পেতে রেখেছ।' স্বামীকে প্রায় ধমকাল মালতী। ফের বলল,—'আচ্ছা, এই নোংরা ময়লা বিছানায় তুমি ঘুমোতে কেমন করে?'

অবিনাশ মুচকি হেসে বলল,—'চাদরটা কি খুব ময়লা হয়ে গেছে?'

—'হয়নি?' মালতী প্রায় চেঁচিয়ে উঠল। ফের মুখ নামিয়ে বলল,—'ছি ছি। তুমি এত নোংরা থাকতে পারো। দাঁড়াও—বলেই টান মেরে চাদরটা মালতী ঘরের মেঝেতে ফেলে দিল। পরে স্বামীকে উদ্দেশ করে বলল,—'যাও, মুখহাত ধুয়ে এস। জিনিসপত্র সব গুছিয়ে রাখতে হবে। খাটটা ওই দক্ষিণ দিকে পাতব ভাবছি। তখন আমাকে একটু সাহায্য করবে।' ঘণ্টাখানেক বাদে ঘর দুখানার চেহারা মোটামুটি ভদ্রগোছের হল। স্টোভে জল বসিয়ে দু-কাপ চা বানাল মালতী। সুহাসিনী রাত্তিরে খাবার মতো ছেলে-বউ দুজনের লুচি-তরকারি টিফিন বাক্সে ভরে দিয়েছিল। নতুন জায়গা, আজ পৌঁছে রান্নাবান্নার হাঙ্গামা করার প্রয়োজন নেই। তার থেকেই খান কয়েক লুচি বের করে স্বামীকে সে খেতে দিল।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে অবিনাশ বলল,—'সংসারে যা জিনিসপত্র লাগবে তার একটা লিস্ট করে ফেল। কাল সকালেই সব কিনে আনব।'

মালতী চোখ তুলে এক পলক স্বামীকে দেখল। ফের হাসিমুখে বলল,—'অন্য কয়েকটা জিনিসও কিন্তু তাড়াতাড়ি দরকার।'

—'অন্য জিনিস আবার কী?' অবিনাশ শুধোল।

মালতী বলল,—'ঘর-সংসার করতে গেলে এগুলো চাই। তবে সব একসঙ্গে না হোক, ধীরেসুস্থে কিনে দিলেই চলবে।'

—'কী জিনিস চাই, তা-ই তো এখন বলনি।'

মালতী চোখ ঘুরিয়ে মেয়েলি ঢং করে বলল,—'প্রথমে ধরো, এই জানালা-দরজার পর্দার কাপড়। ক'টা জানালা আর দরজা আগে দেখে নিতে হবে। তার মাপ চাই। দোকানে গিয়ে বেশ ডিপ্ কালারের ওপর প্রিন্ট দেখে কাপড় পছন্দ করব, বুঝলে?'

—'হুঁ। তারপর—'

—'বেতের সোফা সেট। তার কুশন, কভার সবই লাগবে। এ ছাড়া একটা শো-কেস, একটু লম্বা নতুন ধরনের। কলকাতায় আজকাল যেমন লোকে কিনছে।'

গালে হাত রেখে অবিনাশ নির্দেশ দিল,—'থামলে কেন? বলে যাও—'

—'ভালো একটা ক্লক চাই আমার। আর গোটা দুই সুন্দর ওয়াল ডিজাইনার। বেশ ল্যান্ডস্কেপের ছবি-টবি থাকবে, কেমন?' এক মুহূর্ত থামল মালতী। কী ভেবে নিয়ে বলল,—'আচ্ছা, আপাতত এই। এখন আর কিছু চাইব না।'

অবিনাশ হতাশ হয়ে বলল,—'ওরে বাবা! এ যে হাজার টাকার ধাক্কা।'

—'তা হাজার টাকা লাগবে বৈকি।' মালতী অম্লানবদনে উত্তর দিল। ফের বলল, —'সংসার করতে গেলে এসব চাই, বুঝলে মশায়? নইলে তুমি কি ভেবেছ এই

ঘরদোরকে সেই মেসবাড়ি বানিয়ে রাখবে?'

চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়িয়ে মালতী তার পরিকল্পনার কথা ব্যক্ত করল। বলল,—'শোনো, মোটামুটি একটা প্ল্যান আমি ভেবে রেখেছি। পেছনের ওই দক্ষিণ খোলা ঘরখানা, ওটা হবে বেডরুম। আর সামনের ঘরটা ড্রইং রুম কিংবা তোমার স্টাডি হিসেবেও ব্যবহার করতে পাব। এছাড়া একটা আইডিয়া কিন্তু আমার মাথায় এসেছে।'

—'কী আইডিয়া? অবিনাশ কৌতূহলী হল।

মালতী বেশ উৎফুল্ল হয়ে বলল,—'সামনের এই জায়গাটায় আমি বাগান করব। নানারকম ফুলের গাছ থাকবে। এই ধরো—গাঁদা, জিনিয়া। বর্ষাকালে দোপাটি। গেটেব পাশে দুটো পাতাবাহাবের ঝোপ। এ ছাড়া স্থলপদ্ম, জবা আর শিউলিগাছও লাগাতে পারি। আর শোবার ঘবের পিছনে একটুখানি জায়গা আছে দেখেছ? ওখানে একটা কিচেন গার্ডেন করলে কেমন হয়?'

—'খুব ভালো।' বলেই অবিনাশ হাত বাড়িয়ে দুষ্টুমি করে বউয়ের ফর্সা গাল দুটো টিপে দিল।

—'যাও, অসভ্য কোথাকার!' মালতী তার হাতের নাগালের বাইরে গিয়ে কপট বাগের সঙ্গে বলল,—'আব কখনও তোমাকে কিছু বলছিনে, বুঝলে?'

তাবপব বেশ কিছুদিন মালতী সংসার নিযে মেতে উঠল। কাজকর্মে সাহায্যেব জন্য অবিনাশ একটি মেযেকে রেখেছিল। বছর পনেবো-ষোলো বয়স তার। দিনমান সে বাড়িতে থেকে নানা কাজে মালতীকে সাহায্য কবত। ছোট সংসার। মোটে দুখানি ঘর। তবু ওরই পিছনে মালতী যেন সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে দিল। দিন পনের ধবে ঝেড়ে-মুছে ঘর দুটোকে সাজিয়ে গুছিয়ে যেন স্বর্গ বানিয়ে দিল। আর শুধু ঘর নয়; কম্পাউন্ডে বাড়ির সামনে যে জমিটা পড়েছিল, কুয়ো থেকে বালতি-বালতি জল তুলে সেখানে মাটি তৈরি করল। নানারকম ফুলের সব গাছ লাগাল। মাস দুই না যেতেই সেই গাছে চমৎকার ফুল ফুটল। পরের বছর বর্ষার শুরুতেই একটা শিউলি গাছ এনে পুঁতল। আর আশ্বিনের প্রথমে সেই গাছে অজস্র কুঁড়ি এল। অবিনাশের মনে আছে, তখন কী যেন এক দুর্নিবার অন্ধ আকর্ষণে কলেজ থেকে সে মালতীর কাছে চলে আসত। বিকেলবেলা বাড়ি ফিরে দেখত গা ধুয়ে পরিষ্কার একটি কাপড় পরে মালতী তার জন্য অপেক্ষা করে আছে। মুখে অল্প প্রসাধনের চিহ্ন। তাকে দেখেই হেসে বলত,—'জানো, আজ তোমার জন্যে কী খাবার করেছি?'

—'কী?' অবিনাশ জিজ্ঞাসা করত।

দুষ্টুমিভরা চোখে তার দিকে তাকিয়ে মালতী হাসত। বলত,—'উঁহু, এখন নয়। আগে হাতমুখ ধুয়ে এসো। তারপর খাওয়ার সময় দেখো, তুমি নিজেই কীরকম অবাক হয়ে যাবে।'

ছয়

বছর খানেক না যেতেই সেই ঘটনা।

আচমকা একদিন অজ্ঞান হয়ে গেল মালতী। মাত্র দু-তিন মিনিটের জন্য। কী যেন কাজ করছিল। হঠাৎ টলে গিয়ে মাটির ওপর পড়ে যেতেই অবিনাশ ছুটে এল। চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিতেই জ্ঞান ফিরল। রাস্তার মোড়ে ডাক্তার ঘোষের চেম্বার। খবর পাঠাতেই ভদ্রলোক তখুনি এলেন। দেখেশুনে পরীক্ষা করে শুধু বললেন,—'তেমন কিছু বোঝা গেল না। আবার এ রকম হয় কি না ওয়াচ করতে হবে।'

সেই সূত্রপাত। মাসখানেক পরে একদিন রাত্তিরবেলায় মালতী ফের অজ্ঞান হয়ে গেল। এবার শুধু ডাক্তার ঘোষ নয়; মেডিক্যাল কলেজের একজন বড় ফিজিশিয়ানকেও কল দেওয়া হল। তিনি নাড়ি টিপে, বুকে স্টেথোস্কোপ বসিয়ে আর রক্তচাপ মেপে ক্ষান্ত হলেন না। সমস্ত কিছু পরীক্ষার জন্য একটি ফিরিস্তি দিয়ে গেলেন। সেই মতো সব এগজামিনেশন, শেষে হার্টের একটা ইলেকট্রোকার্ডিয়োগ্রাফ পর্যন্ত করতে হল।

রিপোর্টগুলো দেখে স্পেশালিস্ট বললেন, —'দিস ইজ এ কেস অফ প্যারোক্সিমল টেকিকার্ডিয়া। এখন থেকে খুব সাবধানে থাকতে হবে। বেশি পরিশ্রম বারণ। যেন কোনো উত্তেজনা না হয়। তবে হার্টের প্যালপিটেশন একটু বেড়ে গেলেও ভয় পাবার মতো কোনো কারণ নেই। ইট উইল নট বি ফেটাল।'

এ রোগে হয়তো সদ্য মৃত্যু নেই। কিন্তু এ যেন জীবন্মৃত হয়ে থাকা। সে কথা মালতী হাড়ে হাড়ে টের পেল। মাস ছয়-এর মধ্যেই রোগ আরো দু-তিনবার তার শরীরে হানা দিয়ে গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই হাত-পা ঠান্ডা। অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার আগে মালতী শুধু বলল,—'ভীষণ বুক ধড়ফড় করছে। ওগো, তুমি শিগগির ডাক্তার-বাবুকে ডাকো।'

অবস্থাটা সম্যক বুঝতে বেশি দেরি হল না। ডাক্তার ঘোষ তাকে পরিষ্কার বললেন,—'স্যরি প্রফেসর। কিন্তু কোনো উপায় নেই। স্ত্রীর সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্কের কথা আপাতত ভুলে যান। রিমেমবার, এ স্ট্রং একসাইটমেন্ট মে এন্ড উইথ এ ফেলিওর অফ হার্ট।'

এমন অসহনীয় পরিস্থিতিতে তাকে পড়তে হবে অবিনাশ কোনোদিন স্বপ্নেও

ভাবেনি। একটা জলজ্যান্ত যুবতী মেয়ের পাশে সমস্ত রাত্তির কাঠের পুতুলের মতো নিশ্চেষ্ট হয়ে শুয়ে থাকা, এর চেয়ে কঠিন, অকল্পনীয় কাজ আর কী হতে পারে? নিজেকে স্থির এবং সংযত রাখবার জন্য অবিনাশ একটা অন্য উপায় ভেবেছিল। মালতীর কাছেই এক পৃথক শয্যা। কিন্তু রোগ বেশিদিন দেহে থাকলে তা বোধ হয় মনেও সংক্রামিত হয়। স্বামীকে আলাদা বিছানায় শুতে দেখে মালতী প্রায় চিমটি কেটে বলল,—'এক বিছানায় ঘুমোতে বুঝি ভয় করে? পাছে আমার নিঃশ্বাস লেগে ওই রোগ তোমার শরীরে ছড়িয়ে যায়।'

ব্যাপারটা আরো গুরুতর আকার ধারণ করতে পারে ভেবে অবিনাশ তখুনি স্বস্থানে ফিরে এল। সমস্ত রাত্তির নিজের সঙ্গে যুদ্ধ। একটা রক্তমাংসের মেয়েমানুষের পাশে ক্লীবের মতো পড়ে থাকা। দেহে কিলবিল করা কামনার পোকাগুলোকে কোনোমতে দমিয়ে রেখে অবশেষে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়া। ফের রাত্তির হলেই মনে হয় একটা ভারি পাথর বুঝি তার মাথার ওপর চেপে বসেছে।

দাম্পত্যজীবনে একটা ছন্দপতন। কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া যে এমন ভয়াবহ হয়ে উঠবে, অবিনাশ তা ভাবতে পারেনি। একটা বাদ্যযন্ত্র বিকল হলে যেমন বেসুরো আওয়াজ বেরোয়, স্ত্রীব হাবেভাবে, কথাবার্তায় তেমনি জ্বালা আর বিরক্তি প্রকাশ পেল। একদিন সে স্পষ্ট বলল,—'এভাবে বেঁচে থেকে কোনো লাভ নেই। তোমার মুখেব দিকে তাকালে নিজেকে অপরাধী বলে মনে হয়। তার চেয়ে আত্মহত্যা করে বরং তোমাকে মুক্তি দিয়ে যাই।'

—'আত্মহত্যা? কী বলছ তুমি?' অবিনাশ বিস্মিত হল।

—'ঠিকই বলছি। নিজেকে এখন একটা বোঝা বলে মনে হয়। আর তোমার সুস্থ সম্পূর্ণ জীবনকে আমি মরুভূমির মতো শুকনো করে রেখেছি।'

—'কী যা-তা বকছ?' মৃদু হেসে অবিনাশ ব্যাপারটা লঘু করবার চেষ্টা করল। বলল,—'তুমি সুইসাইড করলেই সমস্যা মিটে যাবে? এই নিয়ে থানা-পুলিশ হবে, সেটা জান?'

—'কিছু হবে না।' মালতী যেন ঘোষণা করল,—'আমি একটা স্টেটমেন্ট রেখে যাব। আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়।'

আশ্চর্য! দিন কয়েক পরে টেবিলের ওপর তেমনি একটা জবানবন্দি দেখে অবিনাশের বুকটা ভয়ে কেঁপে উঠেছিল। ঘুম থেকে উঠে চশমা হাতড়ে ওই লেখাটা পড়ে তার মাথা ঘুরে গেল। প্রায় চিৎকার করে মালতীর নাম ধরে ডাকল সে। কিন্তু না,—যা ভয় করেছিল তা নয়। মালতী বেঁচে; চ্যাঁচামেচি শুনেই দিব্যি জলজ্যান্ত সামনে এসে দাঁড়াল। স্বামীর হাতে কাগজটা দেখে ঈষৎ গম্ভীর মুখে বলল,—'ওটা তোমার কাছে রেখে দাও। হঠাৎ আত্মহত্যা করবার সময় যদি লিখে যেতে ভুলে যাই।'

অবিনাশ ব্যাপারটা চেপে রাখেনি। কলেজের বন্ধু দ্বিজেন, তার ফ্যামিলি

ফিজিশিয়ানের কাছেও গল্প করেছিল। শুনে ডাক্তার ঘোষ বললেন,—'একটু সাবধানে থাকবেন মশায়। মেয়েরা বড় সেন্টিমেন্টাল। ঝোঁকের মাথায় কী করে বসে।' ফের কী ভেবে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন,—'বাড়িতে বিষ-টিস নেই তো?'

—'বিষ? অবিনাশ যেন আকাশ থেকে পড়ল।

—'ভয় পেলেন নাকি?' ডাক্তার ঘোষ হাসলেন। ফের ব্যাপারটা বোধগম্য করবার জন্য ওষুধের আলমারির দিকে ইঙ্গিত করে বললেন,—'ওই যে শিশিটা, ওর ভিতরে সাদা গুঁড়োর মতো বস্তু দেখেছেন? ওর নাম হায়োসিন। চায়ের কাপে কিংবা দুধের গ্লাসে সামান্য একটু হায়োসিন মিশিয়ে দিলেই আপনার স্ত্রীর হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া সম্পূর্ণ বন্ধ হতে পাঁচ মিনিটও লাগবে না। আর ওই যে আরও একটা শিশি রয়েছে। এর ভিতরে মার্‌কিউরিক ক্লোরাইড, দ্যাট ইজ অলসো এ ডেঞ্জারাস পয়জন।'

—'কী সাংঘাতিক!' অবিনাশ এবার সত্যি ভয় পেল।

জীবনটা হয়তো মরুভূমির মতো ঊষর হয়ে উঠত, যদি বর্ধমানে বিশাখার সান্নিধ্য মৌসুমি মেঘের মতো কিছুক্ষণের জন্য তাকে না ছায়া বিছিয়ে দিত। অবশ্য বিশাখার সঙ্গে বর্ধমানে তার প্রথম সাক্ষাৎ এমন আকস্মিক যে অবিনাশ নিজেও কম আশ্চর্য হয়নি। বাঁকুড়ায় থাকতে নানা কাজে তাকে বর্ধমানে আসত হত। পরীক্ষার খাতা নেওয়া, ফের সেই খাতা জমা দেওয়া, এমন কত রকমের কাজ সারা বছর ধরেই আছে। একদিন গোলাপবাগে ইউনিভার্সিটি থেকে বেরোতেই বিশাখার সঙ্গে দেখা। একগাল হেসে সে বলল,—'কী আশ্চর্য! আপনি এখানে?'

—'আমিও তাই ভাবছি।' অবিনাশ স্মিত হাসল।

বিশাখা বলল, —'আপনি তো বাঁকুড়া কলেজে আছেন, তাই না?'

—'কেমন করে জানলেন?' অবিনাশ শুধোল।

—'যেমন করেই হোক খবর পেয়েছি।' ফের এক চিলতে হেসে যোগ করল, —'আপনি না জানালেও আমরা সব খবর রাখি।'

অবিনাশ শুধোল,—'আপনি হঠাৎ এখানে কেন?'

—'বারে! বছরখানেক হল উইমেন্স কলেজে চাকরি নিয়েছি যে।' বিশাখা উত্তর দিল। তারপর উপলবিকীর্ণ ঝর্ণার কলধ্বনির মতো সুমিষ্ট হাসির তরঙ্গ তুলে বলল, —'ফের ইউনিভার্সিটিতে এসে দেখা, তাই না?'

চার-পাঁচ বছর পরে পোস্টগ্র্যাজুয়েট ক্লাসের বান্ধবীকে কাছে পেয়ে অবিনাশের মনে একটা আনন্দঘন অনুভূতির সৃষ্টি হল। মানুষ বোধহয় তার অতীতকে স্বার্থপরের মতো ভালোবাসে। কৈশোরে শৈশবের কথা তার প্রায় মনে পড়ে যৌবনে বাল্যের চপলতা তাকে চঞ্চল করে তোলে। আর প্রৌঢ়ত্বের সীমানায় পা দিয়ে প্রথম বসন্তের হাসিতরল দিনগুলির স্মৃতি সে একাকী নিভৃতে রোমন্থন

করে। গোলাপবাগে হঠাৎ বিশাখার মুখোমুখি হতেই উদাসী ফাল্গুনের এক ঝলক হাওয়ার মতো একটা চঞ্চল শিহরণ তার দেহ মনে ছড়িয়ে গেল। পুরানো বান্ধবীকে দেখছিল অবিনাশ। না, বিশাখা একই রকম আছে। ডিমালো মুখ, টানা টানা চোখ। তার ভিতরে সাদা অংশটায় ঈষৎ নীল আভা। দৃষ্টিতে তেমনি লাজুক ছেলেমানুষি। সেই হাসি। সামান্য পরিবর্তন শুধু দেহে। চার-পাঁচ বছরে একটু মোটা হয়েছে বিশাখা।

পোস্টগ্র্যাজুয়েট ক্লাসে বিশাখার সঙ্গে তার যে একটা পূর্বরাগের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তা নয়। তবে মনের মধ্যে মেঘলা দিনের রোদ্দুরের উঁকিঝুঁকির মতো একটা দুর্বল প্রেমের চিন্তা প্রায় চঞ্চল করে তুলত। তার হাবেভাবে, ব্যাকুলতায় ব্যাপারটা নিশ্চয় চন্দনার কাছে ধরা পড়েছিল। কিন্তু ভীরু, প্রেমিক, তাই কোনোদিন সাহস করে মনের কথা বলতে পারেনি। অবশ্য এর একটা কারণ ছিল। বিশাখার সঙ্গে শুধু তার একার পরিচয় নয়, আরও অনেকের রীতিমতো বন্ধুত্ব এবং ঘনিষ্ঠতা। তারা সকলেই সম্পদে, কৃতিত্বে অবিনাশের চেয়ে অনেকখানি এগিয়ে। তার চেয়ে এক বছরের সিনিয়র অরূপ চৌধুরি অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। এম. এ. তে গোল্ড মেডেল। আর বিভুতোষ? বালিগঞ্জে প্রাসাদোপম অট্টালিকা। চকচকে সুন্দর একটা গাড়ি হাঁকিয়ে ক্লাসে আসত। কফিহাউসে বসে একাই বন্ধু-বান্ধবদের বিল মেটাত। তার মানিব্যাগের অভ্যন্তর থেকে বাদলা পোকার মতো পকেটের টাকা বাতাসে উড়ে যেত। এই সব রুই-কাতলার কাছে রসুলপুরের অবিন।শ দত্ত তো নিতান্ত চুনোপুঁটি। তবু মাঝে মাঝে তার সন্দেহ হত, বিশাখা বোধহয় তাকে পছন্দ করে। এমন কি চন্দনাও তাকে একবার যেন তাই বলেছিল—তার সম্বন্ধে বিশাখার একটু দুর্বলতা আছে। শেষ পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপারটা শুধু কল্পনাবিলাস হয়ে রইল। বাস্তবে রূপ নেয়নি।

সেই বিশাখা। গোলাপবাগে এখন তার সামনে দাঁড়িয়ে। অথচ এই ক'বছরে ওর কথা তো সে ভুলতে বসেছিল। আসলে সময়ের এটাই কেরামতি। ইরেজারের মতো পরিচয়ের রেখাগুলিকে পুরাতন হলেই ধীরে ধীরে মুছে ফেলে। আর মনে হলেও কী ভাবত অবিনাশ? কবে বিয়ে হয়ে গেছে বিশাখার। হয়তো অরূপ চৌধুরি কিংবা বিভুতোষ মিত্তিরের সঙ্গে। অথবা অন্য কেউ। কিন্তু বিশাখার শুকনো সিঁথি তাকে বেশ আশ্চর্য করল। পরে ভাবল পৃথিবীর সব কিছু কি হিসেব মতো মেলে? জীবনে কত গরমিল থেকে যায়।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে বিশাখা হেসে বলল, —'খুব সারপ্রাইজড্ হয়েছেন মনে হচ্ছে?'

অবিনাশ প্রশ্ন করল,—'চাকরি করতে এতদূরে কেন? কলকাতা কী দোষ করল?'

সলজ্জ হেসে বিশাখা উত্তর দিল,—'চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু হয়নি। তাছাড়া

এম. এ.-তে মাঝারি সেকেন্ড ক্লাস। বর্ধমানে যে লেকচারারের কাজ পেয়েছি, সেই ঢের।'

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। তারপর বিশাখা হঠাৎ বলল,—'এতদিন পরে দেখা। দাঁড়িয়ে এভাবে গল্প হয় না। চলুন আমার বাসায়, অবশ্য যদি আপনার হাতে সময় থাকে।'

অবিনাশ একটু অবাক হয়ে শুধোল,—'এখানে বাড়ি ভাড়া করে আছেন নাকি?'

—'নইলে থাকব কোথায়?'

—'না, মানে অনেকেই তো ডেলি প্যাসেঞ্জারি করেন।'

বিশাখা বলল, —'আমিও ক'দিন সেই চেষ্টা করেছি। কিন্তু শরীরে সইল না। তাই অগত্যা দুজন অধ্যাপিকা মিলে কার্জন গেটের কাছে এই বাড়িটা ভাড়া নিলাম। একটি ভালো কাজের লোকও পেয়েছি। বয়স্ক মেয়ে, আমাদের সঙ্গেই থাকে।'

—'তাহলে তো আপনার সমস্যা মিটে গেছে।' অবিনাশ মন্তব্য করল।

-'হ্যাঁ।' বিশাখা ম্লান হেসে বলল, —'এতদিন কোনো অসুবিধে হয়নি। প্রতিমাদির সঙ্গে বেশ ছিলাম। কিন্তু দিন পনেরো আগে উনি হঠাৎ এখানের চাকরিতে রিজাইন দিয়ে চলে গেলেন।'

—'কেন?'

—'কলকাতার যোগমায়া কলেজে প্রফেসরি পেলেন, তাই।'

—'তার মানে ওই বাড়িতে এখন আপনি একা থাকেন?'

—'না, ঠিক একা নয়। ওই কাজের লোকটি তো আমার সঙ্গেই থাকে। তবে মন খারাপ হলেই কলকাতার ট্রেনে উঠে পড়ি। দু-একদিন বাড়িতে থেকে আবার ফিরে আসি।'

কার্জন গেটের বাড়িতে বসে চায়ের কাপ হাতে দুজনে পুরানো দিনের গল্পে মত্ত হল। অবিনাশ শুধোল, —'আপনার সেই শনিবারের আসর নিশ্চয় উঠে গেছে?'

—'হ্যাঁ।' বিশাখা ঠোঁট ফাঁক করে ঈষৎ হাসল। বলল,—'বন্ধুবান্ধব সব কে কোথায় ছিটকে পড়েছে। আসর আর হবে কেমন করে?'

পুরানো ক্লাস-ফ্রেন্ডদের খোঁজ খবর অবিনাশ আদৌ জানে না। এম. এ. পরীক্ষার পর স্রেফ কাজেকর্মে দু-একবার কলকাতা গেছে। এক নিঃশ্বাসে কাজ সেরেই আবার ঘরমুখো। ইচ্ছে করেই কারও সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করেনি। নইলে দু-একজনের ঠিকানা সে জানত। আর যে পথটা বিশাখাদের বাড়ির দিকে গেছে, সেটা তার নখদর্পণে ছিল।

একগাল হেসে বিশাখা শুধোল, —'চন্দনার খবর জানেন?'

—'না।' অবিনাশ মাথা নাড়ল।

—'পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোবার মাস তিন পরেই চন্দনার বিয়ে হয়ে গেছে।' বিশাখা জানাল। ফের আড়চোখে তাকিয়ে বলল,—'আগে থেকেই সম্বন্ধ ঠিক হয়ে ছিল।'

অবিনাশ জিজ্ঞাসা করল, —'বিয়েতে নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলেন নিশ্চয়?'

—'হ্যাঁ-হ্যাঁ। আমরা দল বেঁধে হৈ-হুল্লোড় করেছি। জানেন, ছেলে ইনকাম ট্যাক্সের উকিল, বয়স নাকি একটু বেশি। তাই এ বিয়েতে চন্দনা প্রথমে খুব আপত্তি করেছিল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য বিয়ে হয়ে গেল।'

—'তারপর?'

—'তারপর আবার কী?' বিশাখা চোখ নামিয়ে কথা কইল,—'বিয়ের পর সব ঠিক হয়ে গেছে। হনিমুন করতে দুজনে কাশ্মীর গিয়েছিল। পহলগাঁও, সোনমার্গ, গুলমার্গ আরও কত জায়গা বেড়িয়ে এসেছে। অজস্র ছবি তুলেছে। অনেক কেনাকাটি করে তবে বাড়ি ফিরেছে!'

অবিনাশ শুধোল,—'চন্দনার সঙ্গে আপনার দেখা হয়?'

—'কেন হবে না? এই তো গত পুজোর সময় গড়িয়াহাটায় একটা দোকানে শাড়ি কিনছিল। দেখা হতে বলল, ওর নাকি সতেরোখানা শাড়ির দরকার। জা-ননদ, ভাসুর-ঝি, ভাই-ঝি, বোন-ঝি সকলকেই পুজোয় একখানা করে কাপড় দিতে হবে। তাই বেলা বারোটা থেকে পাঁচ-ছ ঘণ্টা ধরে দোকানে ঘুরে ঘুরে শুধু শাড়ি দেখে বেড়াচ্ছে।'

অবিনাশ জিজ্ঞাসা করল, —'আচ্ছা, বিভুতোষ মিত্তিরের খবর কী?

সেই যে বালিগঞ্জে যাদের মস্ত বাড়ি।'

—'ও বাবা!' বিশাখা প্রায় চোখ গোল করে বলল, 'বিভুতোষ এখন একজন বড় বিজনেসম্যান, তিনটে কোম্পানির ডিরেক্টর।'

—'বলেন কী?'

—'হ্যাঁ, এই তো মাসখানেক আগে স্টেটসে এবং আরও কোন কোন দেশে যেন ঘুরে এল। খবরের কাগজে সে খবর ছাপা হয়েছিল।'

অবিনাশ বলল, —'বিভুতোষের সঙ্গে আপনার দেখা হয়?'

—'হ্যাঁ। একদিন চৌরঙ্গিপাড়ায় সিনেমা দেখতে এসেছিল। তখন হঠাৎ দেখা। বলল, বিজনেসে ঢুকে নিশ্বাস ফেলার সময় নেই। শিগগির স্টেটসে এবং আরও কোন কোন দেশে যেন বিজনেস ট্যুরে যাচ্ছে। আমাকে পার্ক স্ট্রিটে একটা হোটেলে নিয়ে গিয়ে খুব খাওয়াল। যাবার সময় বলল,—কলেজে লেকচার দিয়ে কেন মিছিমিছি সময় নষ্ট করছ? বরং তাড়াতাড়ি একবার ফরেন ঘুরে এসো। বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কিংবা কোম্পানি সেক্রেটারিশিপের একটা সার্টিফিকেট নিয়ে আসতে পারলে এদেশে তোমার ভাগ্য খুলে যাবে।'

শুনে অবিনাশ হা-হা করে হেসে উঠল।

অরূপ চৌধুরির প্রসঙ্গ বিশাখা যেন সন্তর্পণে এড়িয়ে গেল। অবিনাশ এটা লক্ষ করেছিল, কিন্তু কোনো মন্তব্য করেনি। অনেকক্ষণ পরে সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, —'আচ্ছা, অরূপ চৌধুরি এখন কোথায়?

প্রশ্নটা শুনে বিশাখার ঈষৎ ভাবান্তর হল। পরে মুখটা অন্য দিকে ফিরিয়ে সে জবাব দিল,—'এখন কোথায় আছেন তা বলতে পারব না। তবে উনি পরীক্ষা দিয়ে ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিস পেয়েছেন। প্রথমে শুনেছিলাম ম্যানিলায় ইন্ডিয়ান এমব্যাসীর সেকেন্ড সেক্রেটারি। তারপর আর খোঁজ খবর জানি না?'

অবিনাশ আর কোনো প্রশ্ন করল না। অরূপ চৌধুরির সম্বন্ধে বিশাখার এই অনাসক্তি তাকে আশ্চর্য করল। দুজনের সম্পর্কের মধ্যে কোথায় যেন একটা জট পাকিয়ে গেছে, সেটা আগেই সন্দেহ হয়েছিল। এখন বিশাখার মুখের দিকে তাকিয়ে সেটা যে সম্পূর্ণ সত্যি, অবিনাশ তা স্পষ্ট বুঝতে পারল।

তারপর বিশাখার সঙ্গে আরও কয়েকবার দেখা হয়েছে। কার্জন গেটের কাছে ওর বাড়িতে গিয়েছে অবিনাশ। চায়ের কাপ হাতে নিয়ে দুজনে মুখোমুখি বসে অনেকক্ষণ গল্পগুজব করল। বাঁকুড়ায় দাম্পত্যজীবনে যে ছন্দপতন হয়েছিল, বিশাখার সান্নিধ্যে তা ফের এক নতুন রাগিণীর মীড়-গমক-মূর্ছনায় অবিনাশের অন্তরকে হিল্লোলিত করল।

তবে অবিনাশ বুদ্ধিমান। বিশাখার গল্প সে মালতীর কাছে করেনি। মেয়েরা শুধু স্বামীর পাশে কেন, তার ধারে কাছে কোনো রমণীকে সহ্য করতে পারে না। আর এ তো জলজ্যান্ত একটা বান্ধবী, পোস্টগ্র্যাজুয়েট ক্লাসের সহপাঠিনী। তাছাড়া একটা ব্যাপারে অবিনাশ নিশ্চিন্ত। বর্ধমানের টুকরো আলাপ আর মিষ্টি হাসির রেশ হাওয়ায় ভেসে বাঁকুড়ার প্রতাপবাগানের বাড়িতে পৌঁছবে না। তবু স্বামীর বিষয়ে মেয়েদের যেন একটা সিকস্থ সেন্স থাকে। মানুষটার চালচলন হাবভাব আর মুখের দিকে তাকিয়ে অন্তর্যামীর মতো তারা অনেক কিছু আন্দাজ করে।

একদিন বর্ধমান থেকে ফিরতেই মালতী জিজ্ঞাসা করল,—'কী ব্যাপার বল তো? ইউনিভার্সিটি থেকে এলেই তোমাকে বেশ হাসিখুশি লাগে।'

—'তাই নাকি?' অবিনাশ মুচকি হেসে বলল,—'অন্য সময় আমি বুঝি মুখ গোমড়া করে থাকি?'

—'তা নয়। তবে বর্ধমান থেকে ফিরলেই দেখি তুমি গুনগুন করে গান করছ। এতখানি রাস্তা বাসে এলে। অথচ তোমাকে একটুও ক্লান্ত লাগে না। দিব্যি ঝরঝরে, চনমনে দেখায়।'

—'ও কিছু নয়।' অবিনাশ ইচ্ছে করেই আলোচনা এড়িয়ে গেল।

মালতী বলল, —'শরীর ভালো থাকলে আমিও একদিন বর্ধমান যেতাম। সারাদিন ঘরের মধ্যে মুখ বুজে থাকি। একটুও ভালো লাগে না।'

মালতীর দেহ যে আর কোনোদিন সুস্থ হবে না অবিনাশ তা একরকম ধরে নিয়েছে। হয়তো মালতী নিজেও সেটা বুঝতে পারে। তবু প্রথমদিকে স্ত্রীর এই অসুখের জন্য অবিনাশের রীতিমতো কষ্ট হত। বেচারি! বিয়ের পর যেদিন প্রথম প্রতাপবাগানের বাড়িতে সংসার করতে এল, সেদিন কী উৎসাহ ওর! কিন্তু তারপর এই দু-তিন বছরে ঘর-সংসারের কী হাল হয়েছে। একটা কাজের লোক আছে বাড়িতে। ঝাঁটপাট, ঘরমোছা, আরো সব ভারী কাজ সেই করে। মালতীর শরীর খারাপ থাকলে রান্নাঘরেও তাকে ঢুকতে হয়। ডাক্তার ঘোষের কথামতো মালতী কোনো পরিশ্রমের কাজ করে না। প্রায় সারাক্ষণ বিছানায় শুয়ে গল্পের বই-টই পড়ে। একদিন অবিনাশ বলেছিল, কলকাতায় মায়ের কাছে বরং কিছুদিন থেকে এসো। মনটা ভালো হবে। কথাটা বলে শুধু বেকুব হতে বাকি। মালতী কান্নায় ভেঙে জবাব দিল, —'অসুস্থ শরীর। তাই বুঝি আর সহ্য করতে পারছ না? মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে বোঝা নামাতে চাইছ?'

শেষ যেদিন বিশাখার সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল, সেদিন রাত্তিরেই দুর্ঘটনা হল। ইউনিভার্সিটিতে পরীক্ষার খাতা জমা দিয়ে কার্জন গেটের কাছে বিশাখার বাড়িতে গিয়েছিল অবিনাশ। দরজা খুলে বিশাখা উৎফুল্ল হয়ে বলল, —'আসুন আসুন। ক'দিন থেকেই শুধু আপনার কথা ভাবছি। প্রায় মাসখানেক হল এ পথ মাড়াননি।'

অবিনাশ উত্তর দিল, —'এতদিন পরীক্ষার খাতা দেখছিলাম। শেষ না হলে বর্ধমানে আসি কেমন করে?'

বিশাখা মুচকি হেসে বলল, —'তা ঠিক। কাজ না থাকলে বর্ধমানে আসবেন কেন?'

অবিনাশ ভ্রূ কোঁচকাল। কথায় যেন একটা মিষ্টি অভিমান লুকিয়ে আছে। তবু একটু ইতস্তত করে সে বলল, —'আজ কিন্তু হাতে বেশি সময় নেই। ইউনিভার্সিটি থেকে বেরোতেই তিনটে বেজে গেল। ওদিকে সওয়া পাঁচটায় আমার বাস।'

বিশাখা হঠাৎ তার মুখের দিকে তাকিয়ে যেন অনুরোধ করল,—'নেক্সট বাসে গেলে হয় না?'

নেকস্ট বাস মানে রাত ন'টা। অর্থাৎ বাঁকুড়া পৌঁছতে বারোটা বাজবে। অবিনাশ দোটানায় পড়ল। অসুস্থ স্ত্রীর ম্লান মুখখানা এক মুহূর্তের জন্য মনে ভেসে উঠল। সামনে বিশাখার চোখের তারায় সনির্বন্ধ অনুরোধ। মৃদু হেসে সে শুধোল, —'কী ব্যাপার বলুন তো? নেক্সট বাসের কথা উঠছে কেন?' বিশাখা সলজ্জ ভঙ্গিতে বলল, —'তেমন কিছু নয়। মানে আজ আমার জন্মদিন। বার্থ ডে সেলিব্রেট করা বহুদিন বন্ধ করে দিয়েছি। তবু আজ যখন আপনাকে পেয়ে গেলাম, তখন ভাবছি একটু সেলিব্রেট করি।'

ভোরবেলায় দেখা একটি মিষ্টি স্বপ্নের মতো সন্ধেটা ভারি মধুর মনে হল। বিশাখা তাকে প্রায় পেট ভরে খাইয়ে ছাড়ল। অবিনাশের অনুরোধে সে দু-তিনটি

গান করল। অনেকদিন আগে শনিবারের আসরে বিশাখা যেন এমনি একটা গান করেছিল। সে কথা বারবার অবিনাশের মনে উঁকি দিতে লাগল। ইতিমধ্যে একফাঁকে বেরিয়ে অবিনাশ একগুচ্ছ গোলাপ আর একটা বই কিনে এনেছিল। নাম লিখে বইটা হাতে দিতেই বিশাখা ঈষৎ আবক্ত হয়ে বলল,—'কবি!

অবিনাশ বুঝতে পারল, সেই দুপুরবেলার কথা বিশাখা আজও ভোলেনি। একদিন জল থইথই কলুটোলা স্ট্রিটের ওপর দিয়ে পর্দা-ঢাকা রিকশ'তে করে তারা দুজনে কাছেই একটা সিনেমা হলে এই ছবিটা দেখতে গিয়েছিল।

অবিনাশ হঠাৎ বলল,—'আচ্ছা, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করব?'

—'হ্যাঁ নিশ্চয়।' বিশাখা সম্মতি দিল।

—'চন্দনা বলেছিল, আপনার সম্বন্ধে অরূপ চৌধুরির একটা দুর্বলতা আছে। হয়তো পরে আপনারা বিয়ে করবেন।' অবিনাশ মুখ নিচু করে ঘরের মেঝের দিকে তাকাল।

ম্লান হেসে বিশাখা বলল,—'চন্দনা ঠিক বুঝতে পারেনি। আসলে পোস্টগ্র্যাজুয়েট ক্লাসে ছেলে-মেয়ে একটু মেলামেশা করলেই অনেক কথা রটে যায়। তার বেশির ভাগ সত্যি নয়। তাছাড়া মিঃ চৌধুরি ইজ আউট অ্যান্ড আউট এ কেরিয়রিস্ট। একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষ নিষ্প্রয়োজনে কখনও কারও সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে না।'

অবিনাশের হঠাৎ সিপাহি বিদ্রোহের প্রথম নায়কের মতো নিজেকে অসমসাহসী মনে হল। একদিন যে কথাটা বলতে পারেনি, ভীরু প্রেমিকের মতো মনের কোণে শুধু সযত্নে লালন করেছে, আজ সন্ধ্যায় সেটা মুখ ফসকে বেরিয়ে গেলে কী দোষের হবে?

মুখ নিচু করে সে এবার নিজেকে প্রকাশ করল,—'জানেন, একটা কথা আপনাকে কোনোদিন বলা হয়নি।'

—কী কথা?' কৌতূহলী চোখে বিশাখা জিজ্ঞাসু হল।

অবিনাশ গাঢ়স্বরে বলল,—'এম. এ. পড়বার সময় কথাটা আপনাকে অনেকবার বলব ভেবেছি। হয়তো এতদিন পরে এখন আর বলার কোনো মানে হয় না।'

—'কী কথা?' বিশাখা উৎকর্ণ, সহাস্যে তাকিয়ে।

অবিনাশ বলল,—'ভাদ্রের ভরা নদীর বুকে জ্যোৎস্নার আলো পড়লে যেমন ভালো লাগে, তেমনি আপনাকে দেখেও একদিন আমার মন আনন্দে পাখা মেলে নেচেছিল। ইচ্ছে করত, সে কথা আপনাকে বলি।'

ঘরের মধ্যে আশ্চর্য নিঃস্তব্ধতা। গোলাপ ফুলের মিষ্টি সুবাস প্রতিটি বায়ুকণায় ছড়িয়ে গেছে। বিশাখা ব্রীড়াবনত চোখে মাটির দিকে তাকিয়ে। অনেকক্ষণ পরে সে দুর্বল কণ্ঠে বলল,—'এই কথাটা জানাতে এত দেরি করলেন কেন?'

দেরি! অবিনাশ নিরুত্তর। কোনো জবাব দিতে পারেনি।

বিশাখা তেমনি চোখ নামিয়ে বলল,—‘এমনও তো হতে পারে এই কথাটা শোনার জন্য আমি বহুদিন অপেক্ষা করেছি!’

সমস্ত দেহে একটা শিহরণ ছড়িয়ে গেল। কী এক অব্যক্ত উত্তেজনা। শিরায়, ধমনীতে প্রতিটি লোহিত কণিকায় যেন ভূমিকম্পের দোলা। বাঁকুড়া যাওয়ার পথে বাসের মধ্যে তিনঘণ্টা অবিনাশ একটা ঘোরে কাটাল। তার কানের কাছে কে যেন ফিসফিস করে বলছিল,—‘এই কথাটা জানাতে এত দেরি করলেন কেন? দেরি করলেন কেন? কেন?....’

প্রতাপবাগানের বাড়িতে পা দিতেই মালতী যেন প্রতিহিংসার জ্বলে উঠল, —‘এত রাত্তির পর্যন্ত কোথায় ছিলে? সত্যি করে বল দেখি বর্ধমানে কে আছে তোমার? কার সঙ্গে দেখা করতে এত ঘন ঘন সেখানে যাও?’

এক মুহূর্তেই স্ত্রীর প্রতি মনটা বিষিয়ে উঠল। অবিনাশের ইচ্ছে করছিল আরও জোরে চিৎকার করে মালতীর কণ্ঠস্বরকে ছাপিয়ে যায়। কিন্তু রাত দুপুরে মিছিমিছি কেলেঙ্কারি। চেঁচামেচি শুনে পাশের বাড়ির লোকজন হয়তো ছুটে আসবে। তাই একটি কথাও না বলে অবিনাশ নিশব্দে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল।

মালতী মরিয়া, তেমনি উত্তেজিত কণ্ঠে বলল,—‘আমি খবর পেয়েছি, বর্ধমানে তোমার একজন পিরীতের বান্ধবী রয়েছে। তার সঙ্গে দেখা করতে এত ঘন ঘন সেখানে যাও। ছি, ছি! এর পরও আমাকে বেঁচে থাকতে হচ্ছে। যমের অরুচি হলাম।’

বেগতিক দেখে স্ত্রীকে শান্ত করবার জন্য অবিনাশ অনুনয় করল,—‘চুপ করো মালতী। মিছিমিছি এত চিৎকার করলে আজ রাত্তিরেই তোমার অসুখ বাড়বে।’

—‘হ্যাঁ, তাই যেন বাড়ে। আমি সেটা চাই।’ মালতী প্রায় হাঁপাচ্ছিল। বলল, —‘তোমার মতো চরিত্রহীন লম্পট স্বামীর সঙ্গে ঘর করার চেয়ে মৃত্যু অনেক ভালো জানবে।’

বেশিক্ষণ লাগেনি। মিনিট দশ পরেই মালতীর বুকের যন্ত্রণা শুরু হল। হার্টের প্যালপিটেশন অসম্ভব বেশি। হাত-পা ঠান্ডা। অবিনাশ এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে তাড়াতাড়ি পায়ে চটি গলিয়ে ডাক্তারের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল।

অত রাত্তিরে ডিসপেনসারির দরজা বন্ধ। ডাকাডাকি করতে যে লোকটি ভিতরে শোয়, সে কপাট খুলে বেরিয়ে এল। অবিনাশকে সে চেনে। তাকে ডিসপেনসারি ঘরে অপেক্ষা করতে বলে তিনতলায় ডাক্তারবাবুকে খবর দিতে গেল। স্বল্পালোকিত এই ঘরটায় বসে অবিনাশ চারপাশের দেয়াল, উঁচু সিলিং, কপাট ও ওষুধের খোলা আলমারির দিকে বারবার তাকাচ্ছিল। মাঝে মাঝে একটি মিষ্টি সন্ধ্যা, বিশাখার গান, ফিসফিস করে বলা তার কথাগুলো মনের মধ্যে অনুরণিত হচ্ছিল।

মিনিট দশ পরে সেই লোকটিকে সঙ্গে নিয়ে ডাক্তার ঘোষ নেমে এলেন। সব শুনে বললেন,—‘চিন্তার তেমন কোনো কারণ নেই। হঠাৎ উত্তেজনার জন্যই

এরকম হয়েছে। একটা ঘুমের ওষুধ দিচ্ছি, গিয়ে খাইয়ে দিন। আর একটু গরম দুধ কিম্বা হরলিকস্।' দুঃখ করে ফের মন্তব্য করলেন,—'টেকিকার্ডিয়া মে নট বি ফেটাল। বাট আই ফিল ফর ইউ প্রফেসর। জীবনের ভালো দিনগুলো বোধহয় এমনি ভাবেই কাটবে।'

সেদিন রাত্তিরেই সমস্ত ব্যাপারটা কেমন যেন ওলটপালট হয়ে গেল। সারাদিন ধরে নানা ঘটনাবলি। সকালে বাসে বর্ধমান। ইউনিভার্সিটিতে খাতা জমা দেওয়ার পর কার্জন গেটের কাছে বিশাখার বাড়িতে যাওয়া। সন্ধ্যায় ওর জন্মদিন। অবিনাশ এতদিন যা বলতে পারেনি, হঠাৎ তাই কেন প্রকাশ করতে গেল? উত্তরে বিশাখার সেই ফিসফিস করে বলা—এই কথাটা জানাতে এত দেরি করলেন কেন? শেষে লাস্ট বাস ধরে ক্লান্ত দেহে বাঁকুড়ায় ফেরা। তারপর মালতীর ওই বিশ্রী ধরনের কটূক্তি। সব শুনে ডাক্তার ঘোষ বললেন, জীবনের ভাল দিনগুলো বোধহয় এমনিভাবেই কাটবে।

হঠাৎ চোখের সামনে দাউ দাউ অগ্নিশিখা। সেই মুহূর্তে মস্তিষ্কের ভারসাম্যটা বুঝি হারিয়ে গেল। অবিনাশ শুধু প্রাণপণে চিৎকার করে উঠেছিল,—'আগুন, আগুন।' সে দরজা খুলতেই প্রতিবেশীরা সকলে ছুটে এলো। কিন্তু ততক্ষণে নাটকের শেষ। কোরোসিনে ভেজা মালতীর শাড়িখানা লেলিহান অগ্নিশিখা সম্পূর্ণ গ্রাস করেছে।

সাত

গযা স্টেশনে নেমে অবিনাশ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের আশ্রমে এসে উঠল। স্টেশনের কাছেই একটা ছোট অফিস থেকে মাইকে করে সেবাশ্রম সঙ্ঘে ওঠার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছিল। তাছাড়া ভট্‌চায্‌ মশায় মাকে বলে ছিলেন, এখানেই সুবিধে। নইলে গয়া জায়গা ভালো নয়। পাণ্ডাদেব উৎপাত, অত্যাচার আছে। আর নতুন লোক হলে দৌরাত্ম্য বেশি। অথচ আশ্রমেব অফিস থেকে সব ব্যবস্থা কবে দেয়। চেনাজানা অনেক পাণ্ডা আছে। পারলৌকিক কাজে তারাই সহায়তা করে।

অবিনাশ দেখতে পেল পিণ্ড দিতে সে একা আসেনি। অফিস-ঘরে তার মতো অন্তত পনের-কুড়িজন যাত্রী। বাইবের বারান্দায় লাইন দিয়ে পাণ্ডারা বসে।

কার্তিকের শুরু। কিন্তু গয়াতে এখনও তেমন ঠান্ডা পড়েনি। আকাশ নির্মেঘ নীল,..আশ্রমের বাগানে তিন-চারটে গাঁদা গাছে বড় বড় ফুল ফুটেছে।

মালতী অগ্নিদগ্ধ হযে মারা গেছে শুনে তার পাণ্ডা কিন্তু ভুরু কোঁচকাল। বলল, পিণ্ড দিতে আপনাকে প্রেতশিলায় যেতে হবে বাবুজী।'

—'প্রেতশিলা?' অবিনাশ অস্ফুটে শুধোল,—'সেটা কোথায়?'

—'এখান থেকে মাইল আষ্টেক দূর। একটা টাঙা ভাড়া করে নিন। সঙ্গে লোক দিচ্ছি। প্রেতশিলায় আমার ভাই আছে। সব কাজ সেই করিয়ে দিতে পারবে।'

অবিনাশ তবু বলল,—'পিণ্ড দিতে প্রেতশিলায় যেতে হবে কেন? গয়াতে হয় না?'

পাণ্ডা গম্ভীর মুখে উত্তর দিল,—'কেমন করে হবে বাবুজী? আপনার পরিবার আগুনে পুড়ে আত্মহত্যা করেছেন। তাহলে এটা অপঘাতে মৃত্যু হল। তাই শাস্ত্রমতে প্রেতশিলাতেই পিণ্ডদান সিদ্ধ। নইলে আত্মার মুক্তি হবে না।' একটু হেসে সে ফের বলল,—'যদি রোগে-অসুখে মারা যেতেন, তাহলে অন্য কথা ছিল; ফল্গু নদীতে পিণ্ডদান করে ফিরে যেতেন।'

মাথার উপর নীল আকাশ। উন্মুক্ত, উদার। শহর ছাড়িয়ে খানিকটা যেতেই চারপাশে নির্জন মাঠ। পথে কাকবল্লী, রামশিলা। পাণ্ডাব লোক বলল,—'প্রেতশিলা থেকে ফেরার পথে এখানে নামতে হয়।' টাঙা একটা নদীর পুল পেরোতেই কিছুদূরে রেলের লাইন চোখে পড়ল। মাঝে মাঝে ছোট-বড় পাহাড় দেখা যাচ্ছে। এক পাল ভেড়া নিয়ে একজন মেষপালক কোথায় যেন চলেছে। ভেড়ার পালকে

পিছনে ফেলে টাঙা সামনের দিকে ছুটে চলল।

টাঙাওয়ালা হঠাৎ বলল,—বাবুজী ওই তাকিয়ে দেখুন। প্রেতশিলা পাহাড় দেখা যাচ্ছে। ওর উপরে উঠে আপনাকে পিণ্ডদান করতে হবে।'

অবিনাশ লক্ষ করল, খানিকটা দূরে একটা ন্যাড়া পাহাড়। গাছপালা প্রায় নেই বললেই চলে। থাকলেও তা খুবই কম। পাহাড়টা কত উঁচু হবে? এক হাজার কিম্বা দেড় হাজার ফুট? হয়তো তার চেয়েও বেশি হতে পারে। তবে পাহাড়টা খুব দূরে নয়। টাঙাতে যেতে বড়জোর মিনিট পনেরো লাগবে।

পাণ্ডার ভাইয়ের নাম দেওকীনন্দন। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। রোদপোড়া তামাটে গায়ের রং। তীক্ষ্ণ নাসিকা। মাথার চুলগুলি লম্বা। ব্যাকব্রাশ করা। পরনে ধুতি, ঊর্ধ্বাঙ্গে নীল রঙের সার্ট। কাঁধের উপর পরিষ্কার সাদা উড়ুনি।

দেওকীনন্দন ভারি অমায়িক। তাকে আপনজনের মতো অভ্যর্থনা করল। বলল, —'আসুন বাবুজী। মেহেরবানি করে ভরসা রাখুন। কোনো তকলিফ হবে না। দু-ঘণ্টার মধ্যে আমি সব শেষ করে দিচ্ছি। তারপর আপনি টাঙাতে চেপে গয়া ফিরে যান।'

বেলা প্রায় দশটা বাজে। পাহাড়ের সানুদেশ, তাই এখানে ঠান্ডা বেশি। শনশনে শীতের বাতাস মাঝে মাঝে কাঁটার মতো বিঁধছে।

নিচে একটা ছোট মন্দির। তাব কাছেই কুণ্ড। পাণ্ডা বলল,—'এর নাম ব্রহ্মকুণ্ড। প্রথমে এখানে স্নান করে নিন বাবুজী। তারপর মন্ত্রপাঠ করে পিণ্ড হাতে নিয়ে উপরে চলুন।'

কোনোমতো একটা ডুব দিয়ে স্নান সেরে নিল অবিনাশ। তারপর মন্ত্রপাঠ। এবার পিণ্ড হাতে নিয়ে পর্বতারোহণ। দেওকীনন্দন শুধু পাণ্ডা নয়, চমৎকার কথা বলতে পারে। একটু আগে তার ঠিকানা, আদি নিবাস, জেলা, গ্রাম, এমন কী কোন থানা পর্যন্ত জেনে নিয়েছে। তারপর নিজেই বলল,—'তিন পুরুষ ধরে এই কাজ আমাদের। এখন থানা আর গ্রামের নাম দেখেই বলে দিতে পারি লোকটির পাণ্ডা কে আছে।'

কৌতূহল হতে অবিনাশ জিজ্ঞাসা করল,—'ওয়েস্ট বেঙ্গলের সব জেলা থেকেই কি আপনাদের কাছে লোক আসে?'

দেওকীনন্দন হাসল। বলল,—'আলবত আসে। আর শুধু ওয়েস্ট বেঙ্গল কেন বলছেন বাবুজী? ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, গুজরাট, হরিয়ানা, অন্ধ্র, সব জায়গা থেকেই আমাদের কাছে লোক আসছে। ধরুন ওড়িশার কটক, পুরী, গঞ্জাম, বালেশ্বর, কালাহাণ্ডি, তারপর ইউ.পি.র বেনারস, আজমগড়, ফৈজাবাদ, লখনউ, হরদৌ, এম. পি-র রায়পুর, বিলাসপুর, দ্রুগ, রঘুনন্দনগাঁও, —এমন কত জেলা রয়েছে।'

পিণ্ড হাতে নিয়ে পাহাড়ে উঠছিল অবিনাশ। দেওকীনন্দন আগে, সে পিছনে।

এতক্ষণ পর্বতের পাদদেশে দাঁড়িয়ে বেশ শীত-শীত করছিল। কিন্তু আরোহণের সময় আর যেন ঠান্ডা নেই। তার কারণ দুটো, প্রথমত পাহাড়ে ওঠার পরিশ্রম। দ্বিতীয়ত পর্যাপ্ত উজ্জ্বল রোদ্দুর। দেওকীনন্দন বলছিল, প্রায় চারশো সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে হবে। আর সিঁড়িগুলো বড় বড় পাথরের চাঁই। এক ফুট থেকে সওয়া ফুট উঁচু। তাই কিছুক্ষণ পরেই হাঁটু দুটো ব্যথায় টনটনিয়ে ওঠে।

অবিনাশ একা নয়,... আরও দশ-বারো জন যাত্রী তার আগে পিছনে উঠছে। প্রত্যেকের হাতে পিণ্ড। যাদের উদ্দেশে এই পিণ্ডদান করা হবে, তারা সকলেই নিশ্চয় অপঘাতে মারা গিয়েছিল। অর্থাৎ আগুনে পুড়ে, উদ্বন্ধনে অথবা বিষপান করে। কিংবা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে প্রাণ হারিয়েছে।

দেওকীনন্দন জিজ্ঞাসা কবল,—'বাবুজী, আপনার পরিবার তো আত্মহত্যা করেছেন, তাই না?'

অবিনাশ পরের সিঁড়িটায় পা বাড়াবার আগে এক মুহূর্ত থামল। পরে বলল, —'হ্যাঁ।'

—'কীসে মৃত্যু হয়েছিল?'

অবিনাশ মুখ তুলে ফের তাকাল। বলল,—'আগুনে পুড়ে।'

'অগ্নিদগ্ধ!' দেওকীনন্দন স্বগতোক্তির মতো শব্দটা আর একবার উচ্চারণ করল।

অবিনাশ সন্দিগ্ধকণ্ঠে শুধোল,—'একথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন?'

দেওকীনন্দন বলল,—'অপঘাতে মৃত্যু হলে পিণ্ডদানের আলাদা আলাদা মন্ত্র। যেমন গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করলে এরকম, আবার আগুনে পুড়ে মারা গেল তার ভিন্ন মন্ত্র। তাই আপনার পরিবারের কীসে মৃত্যু হয়েছিল সেটা জেনে নিচ্ছি।'

ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভাঙছিল অবিনাশ। প্রায় অর্ধেকটা পথ সে উঠে এসেছে। বাকিটা উঠতে হবে। কপালে, ঠোঁটের নিচে স্বেদবিন্দু। পর্বতারোহণ যে এমন কষ্টসাধ্য ব্যাপার অবিনাশ তা উপলব্ধি করেনি। অন্যমনস্কের মতো কিছু ভাবতে গিয়ে পাণ্ডাকে উদ্দেশ্য করে সে হঠাৎ বলল, 'আচ্ছা, প্রেতশিলায় পিণ্ডদান করলে আমার স্ত্রীর আত্মার সদ্গতি হবে, তাই না?'

—'নিশ্চয় হবে বাবুজী।' দেওকীনন্দন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কথা কইল। 'মুক্তি না হলে প্রতি বৎসর এত লোক এখানে আসবে কেন?'

দেওকীনন্দন ফের বলল,—'জানেন বাবুজী, যুগ যুগ ধরে লোকে গয়াতে পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে পিণ্ডদান করতে এসেছে। ত্রেতাযুগে স্বয়ং রামচন্দ্র এসেছিলেন রাজা দশরথকে পিণ্ড দিতে। গয়াধাম বহু পুরাতন তীর্থ। একদিন এই ফল্গু নদীতে অমৃতধারা বইত। মা জানকীর অভিশাপে সেই ফল্গু অন্তঃসলিলা হয়ে গেল।'

পাহাড়ের উপরে উঠে অবিনাশ ধপ করে বসে পড়ল। এখন সে রীতিমতো হাঁপাচ্ছে। পাহাড়ের উচ্চতা দেড় হাজার ফুট নিশ্চয় হবে। আর এই পাথরের

সিঁড়িগুলো কী বিশ্রী উঁচু। হাঁটু দুটো ব্যথায় টনটন করছে।

তার পূর্ববর্তী যাত্রীরা মন্ত্রোচ্চারণ করে একটা কালো পাথরের উপর পিণ্ড ফেলে দিচ্ছে। মা বলেছিল, যার উদ্দেশ্যে পিণ্ড দেওয়া হয়, সেই সময় পাথরের বুকে তার মুখটা নাকি ভেসে ওঠে। নেহাত গালগল্প। অবিনাশ বিশ্বাস করেনি। অনেকদিন আগে কার কাছে যেন শুনেছিল পিণ্ড দেওয়ার সময় পাহাড়ের মাথায় একটা আশশ্যাওড়া গাছ সবেগে দুলতে থাকে। তার অর্থ, সেই প্রেতাত্মা পিণ্ড গ্রহণ করতে উপস্থিত হয়েছে।

এই সূর্যকরোজ্জ্বল দিবসে প্রেতশিলা পাহাড়ে পিণ্ডদান করবার পূর্ব মুহূর্তে তার মনে কেমন একটা অস্বস্তির সঞ্চার হল। অথচ দেওকীনন্দন সামনে দাঁড়িয়ে, আশেপাশে আরও অনেক লোক। কিন্তু পিণ্ডদানের সময় যদি কালো পাথরের বুকে মালতীর সেই অগ্নিদগ্ধ প্রেতিনীর মতো দাঁত বের করা মুখখানা দেখা দেয়? তাহলে অবিনাশ নিশ্চয় আবার মূর্ছা যাবে। কিন্তু তাই কি সম্ভব? কখনও হতে পারে?

দেওকীনন্দন জিজ্ঞাসা করল,—'বাবুজী, আপনার পরিবারের নাম-গোত্র কী?'

অবিনাশ ধীরে ধীরে নাম-গোত্র জানাল।

দেওকীনন্দন ফের বলল,—'বাবুজী, আপনার পরিবারের কীসে মৃত্যু হয়েছিল?'

অবিনাশ ভ্রূ কুঞ্চিত করল। একটু আগেই তো সে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে। তাহলে? দাঁতে দাঁত চিপে সে জবাব দিল,—'আগুনে পুড়ে।'

—'তাহলে মন্ত্র বলুন।' দেওকীনন্দন নির্দেশ দিল,—

অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে
কেচিন্নগ্নিদগ্ধাস্তথা পরে
তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্।

গলা শুকিয়ে কাঠ। কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসছে। মন্ত্র উচ্চারণ করতে গিয়ে অবিনাশ বেশ কয়েকবার ঢোক গিলল। তারপর প্রায় চোখ বুজে কালো পাথরের উপর পিণ্ডটা ফেলে দিয়ে তাড়াতাড়ি পিছন ফিরল।

দেওকীনন্দন তার সঙ্গে নীচে নেমে এল। টাঙাওয়ালা অপেক্ষা করছিল। তাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে পাণ্ডা বলল,—'নমস্তে বাবুজী। প্রেতশিলায় পিণ্ড দিলেন। আপনার পরিবারের আত্মার আজ মুক্তি হয়ে গেল। এই পৃথিবীর সঙ্গে আর কোনো বন্ধন রইল না।'

সূর্য প্রায় মাথার ওপরে। শীতের আমেজ কেটে গেছে। বরং এখন একটু গরম লাগছে। অবিনাশ টাঙাতে উঠে বসতেই গাড়ি চলতে শুরু করল।

সেই পথ। নির্জন দ্বিপ্রহর। মাঝে মাঝে ছোট-বড় পাহাড়। টাঙা কিছুদূর যেতেই অবিনাশ আয়েস করে গা এলিয়ে দিল। এখন নিজেকে হালকা, সহজ ভাবতে সে চেষ্টা করছিল। মালতীর আত্মার তো সদ্গতি হয়েছে। এই পৃথিবীর সব বন্ধন

কাটিয়ে—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেছে। কিন্তু অবিনাশের মনের অস্বস্তিটা তো দূর হল না। গলার কাছে মাছের কাঁটার মতো কী যেন একটা বস্তু আটকে আছে। কই সেটা তো যায়নি? অথচ মা বলেছিল গয়াতে পিণ্ডদান করলেই ভয়-টয় সব কেটে যাবে। পাণ্ডাও বলেছে, এই পৃথিবীর সঙ্গে মালতীর আর কোনো বন্ধন নেই। তাহলে?

স্ত্রীর মৃত্যুর পর অবিনাশ যেন একটা আতঙ্কে ভুগছে। রাত বেশি হলেই মনের মধ্যে সেই অস্বস্তিটা খচখচ করে। গলার কাছে কী যেন আটকে যায়। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। মাঝরাত্তিরে হঠাৎ চমকে উঠে ঘুম ভেঙে যায়। অথচ কেন যে এমন হয় সে স্পষ্ট বুঝতে পারে না। মা একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল,—'হ্যাঁরে, রাত্তিরে বৌমাকে দেখতে-টেখতে পাস্?'

কিন্তু না। মৃতা স্ত্রীর ছায়া পর্যন্ত অবিনাশ কোনোদিন দেখেনি।

কলকাতার চাকরি নেবার পর বিশাখার সঙ্গে হঠাৎ একদিন দেখা হয়ে গেছল। বিবেকানন্দ রোড আর বিধান সরণির ক্রশিঙে নেমে অবিনাশ মানিকতলার দিকে যাচ্ছে। ডাফ স্ট্রিটের কাছে দুজনের দেখা। বিশাখা অবাক হয়ে বলল,—'অবিনাশবাবু! একি চেহারা হয়েছে আপনার?'

অবিনাশ ম্লান হাসল। কোনো জবাব দিল না।

বিশাখা বলল,—'আমি সব শুনেছি। সেদিন রাত্তিরে আপনার স্ত্রী সুইসাইড করেন। তারপর বাঁকুড়া কলেজের চাকরি ছেড়ে দিয়ে আপনি চলে এলেন।'

অবিনাশ ঢোক গিলে বলল,—'ইয়ে, আপনি সব শুনেছেন তাহলে?'

—'হ্যাঁ। অনেকদিন ভেবেছি আপনি হয়তো আসবেন। এতসব ঘটনা তখন জানতাম না। শেষে এক ভদ্রলোকের কাছে খোঁজ নিতে সব শুনলাম।'

অবিনাশের কেমন নার্ভাস লাগছিল। সে কোনো জবাব দিল না।

বিশাখা জিজ্ঞাসা করল,—'এখানে কোথায় আছেন?'

অবিনাশ ইচ্ছে করেই তার পুরো ঠিকানা জানাল না। অস্পষ্টভাবে বলল, —'বৌবাজারের কাছে একটা ছোট ফ্ল্যাট পেয়েছি।'

বিশাখা মুখ নীচু করে কী ভাবল। ফের মৃদুস্বরে বলল,—'রবিবার সকালে একদিন আমাদের বাড়িতে আসুন না! বেশি তো দূরে নয়।'

অবিনাশ কী জবাব দেবে বোধহয় তাই চিন্তা করল। অনেকক্ষণ পরে বলল, —'ইয়ে, মানে, যদি সময় করতে পারি তাহলে—।'

'হ্যাঁ আসবেন।' বিশাখা যেন এবার অনুনয় করল। ফের মৃদুস্বরে জানাল, —'সেদিন রাত্তিরে আপনি যা বলেছেন, তার জবাবে আরও কিছু কথা হয়তো বলতে পারি।'

সেদিন রাত্তিরে? চিন্তাটা মনে আসতেই মাথাটা হঠাৎ বোঁ করে ঘুরে গেল। বাঁ চোখটা ঈষৎ ক্ষুদ্র করে অবিনাশ যেন অতীতের অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছিল।

তার চোখেমুখে সেই অস্বস্তির ভাবটা ফুটে উঠল। মনে হল গলার কাছে মাছের কাঁটার মতো কী যেন খচখচ করছে। বুকের ভিতরটা হিম-হিম। চোখ বুজলেই মালতীর সেই আগুনে পুড়ে মরার দৃশ্যটা এখুনি দেখতে পাবে।

তার অবস্থা বুঝতে পেরে বিশাখা প্রায় চেঁচিয়ে উঠল,—'অবিনাশবাবু, কী হল? কী হল আপনার?'

মুহূর্তে অবিনাশ ফের নিজেকে ফিরে পেল। বিশাখার দিকে তাকিয়ে শুধু বলল, —'ও কিছু নয়। আচ্ছা, এখন আসি।'

অবিনাশ আর দাঁড়াল না। সে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলল। বিশাখা পিছনে, অনেক পিছনে। কিন্তু সাহস করে অবিনাশ একবারও ফিরে তাকাতে পারল না।

দুপুরবেলায় আহারের পর সে একটা ঘরে চুপচাপ শুয়েছিল। সন্ধে সাতটায় ট্রেন। বেলা একটু পড়লেই টাঙা নিয়ে স্টেশনে যাবে। হঠাৎ তার মনে হল মালতী, সামনে দাঁড়িয়ে আছে। একটা বাঙ্গালোর সিল্কের শাড়ি ওর খুব পছন্দ, সেটাই পরনে। বোধহয় অবিনাশ ওটা বিয়ের পর ওকে কিনে দিয়েছিল। শরীর অনেক ভালো। শীতের মরা নদীর মতো মুখে শীর্ণতা নেই। বরং দৃষ্টি উজ্জ্বল, ঠোঁটে প্রফুল্ল হাসি।

অবিনাশ অবাক হয়ে বলল,—'কী গো, তুমি কখন এলে?'

'কেন?' মালতী হাসল। 'আমি তো সঙ্গেই এসেছি।'

অবিনাশ ঈষৎ চিন্তা করে বলল,—'কিন্তু আমি যে প্রেতশিলায় পিণ্ড দিতে এসেছিলাম। পাণ্ডা বলছিল, তোমার মুক্তি হয়ে গেছে। এই পৃথিবীর সঙ্গে আর কোনো বন্ধন নেই।'

'বন্ধন নেই?' মালতী কেমন অদ্ভুত হাসল। বলল,—'কিন্তু মুক্তি হবে কেমন করে?'

—'কেন? আমি যে পিণ্ড দিয়ে এসেছি।'

—'তাই বুঝি? কিন্তু কী বলে পিণ্ড দিলে?' বলেই মালতী ফের খিলখিল করে হাসল। সেই মুহূর্তে অবিনাশ চিৎকার করে উঠল। তারপর দিনের আলো, মনুষ্যকণ্ঠ কানে যেতেই কিঞ্চিৎ ধাতস্থ হল। এই শীতের দুপুরেও সে বেশ ঘেমে উঠেছে। বিছানায় শুয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়ল বুঝতে পারেনি। কিন্তু এইমাত্র মালতী যে তার সামনে দাঁড়িয়েছিল! বলছিল, পৃথিবীর সঙ্গে বন্ধন ঘোচেনি।

ঘড়িতে প্রায় চারটে বাজে। শীতের বেলা। সূর্য অস্ত যেতে দেরি নেই। দুপুর ফুরোতেই পাহাড়ের গায়ে ঘন ছায়া পড়েছে।

টাঙা থেকে অবিনাশকে নামতে দেখে দেওকীনন্দন ছুটে এল। 'নমস্তে বাবুজী। আপনি ফের এলেন যে? কিছু ফেলে গিয়েছেন?'

অবিনাশ মাথা নাড়ল।

—'তাহলে?' পাণ্ডা তার মুখের দিকে তাকাল। অবিনাশ বলল,—'আমি আর

একবার পিণ্ড দিতে চাই।'

—'আবার পিণ্ড দেবেন?' দেওকীনন্দন ভ্রূ কোঁচকাল,—'কেন?'

অবিনাশ কী উত্তর দেবে বোধহয় তাই চিন্তা করছিল।

পাণ্ডা জানাল,—'সূর্যাস্তের পর পিণ্ডদান সিদ্ধ নয়। অথচ বেলা ডুবতেও দেরি নেই বাবুজী।' একটু থেমে সে ফের বলল,—'সন্ধের পর এই পাহাড়ে কেউ থাকে না। লোকজন যে যার ঘরে ফিরে যায়।'

অবিনাশকে উদ্বিগ্ন এবং বিমর্ষ দেখাল। সে অস্থিরভাবে বলল,—'কিন্তু আমাকে যে পিণ্ড দিতেই হবে।'

দেওকীনন্দন বলল,—বাবুজী, বরং কাল সকালে আসুন। এই অবেলায় ফের স্নান করলে ঠান্ডা লেগে আপনার অসুখ করবে।'

'কাল সকালে?' অবিনাশ যেন স্বগতোক্তি করল। তাহলে আজ রাতটা গয়াতে থাকতে হয়। কিন্তু নিশীথে মালতী যদি ফের সামনে এসে দাঁড়ায়? খিলখিল করে হেসে বলে—'কই, এখনও তো আমার মুক্তি হয়নি!'

অবিনাশ তাড়াতাড়ি বলল,—'না-না। আমার কোনো অসুখ-বিসুখ করবে না। আপনি পিণ্ডদানের ব্যবস্থা করুন।' বলেই সে পকেট থেকে একটা একশো' টাকার নোট বের করে পাণ্ডার হাতে গুঁজে দিল।

একশো' টাকা! পাণ্ডা এতটা আশা করেনি। এই বাঙালি বাবুটা পাগল নাকি? কাল সকালে একবার এলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হত? পাণ্ডাকে দশ টাকার বেশি দক্ষিণা দিতে লাগত না।

স্নান করে পিণ্ড হাতে নিয়ে অবিনাশ পাহাড়ে উঠছিল। দেওকীনন্দন সামনে, সে পিছনে। বেলা যায়-যায়। সূর্য বেশ হেলে পড়েছে। রোদ ম্লান, নিরুত্তাপ।

প্রেতশিলা পাহাড়ের চূড়ায় এখন তারা দুটি প্রাণী। এই অবেলায় পিণ্ডদান করতে কে পাহাড়ে উঠবে? চারধারে সুগভীর নির্জনতা। নীচে থেকে মনুষ্যের কলকণ্ঠ ওপরে পৌঁছয় না।

অবিনাশ তাকিয়ে দেখল, দেওকীনন্দন কী ভাবছে! হয়তো সন্ধের আগে বাড়ি ফেরার জন্য সে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

পাণ্ডা বলল,—'আর দেরি নয় বাবুজী। সূরয়নারায়ণ এবার অস্ত যাবেন। পাথরের সামনে দাঁড়িয়ে যার পিণ্ড দিচ্ছেন, তার নাম-গোত্র, কেমন করে অপঘাতে মৃত্যু হয়েছিল তাই বলুন।'

পিণ্ড হাতে নিয়ে অবিনাশ কাঠগড়ার আসামির মতো দাঁড়িয়ে। মনে হল এই প্রেতপাহাড়ের মাথায় সমগ্র প্রেতলোক তার স্বীকারোক্তি শোনার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করছে। সেদিন রাত্তিরে মালতীর কেমন করে মৃত্যু হয়েছিল সেই ঘটনা তাকে বলতে হবে।

গলার কাছে এতদিন যা আটকে ছিল, দূষিত রক্ত এবং গলিত পুঁজের মতো

কণ্ঠ থেকে তা নিঃসৃত হল। অবিনাশ চাপা গলায় বলল,—'সেদিন রাত্তিরে ডিসপেনসারি ঘরে একলা বসে আমি শুধু বিশাখার কথা ভেবেছি। বিশাখা অধ্যাপিকা, সুন্দরী। আমাকে ভালোবাসে। অথচ মালতী রুগ্‌ণ, অসুস্থ,—দাম্পত্যজীবন পালনে অক্ষম। আর কোনোদিন সে ভালো হয়ে উঠবে না। ডাক্তার ঘোষ বলেছিলেন, সামান্য একটু হায়োসিন দুধ কিংবা চায়ের সঙ্গে মিশিয়ে দিলেই আমার স্ত্রীর হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হতে দেরি হবে না। এই কুমতলব নিয়ে আলমারির ভিতরের শিশি থেকে গোপনে একটু হায়োসিন সংগ্রহ করলাম। বাড়ি ফিরে দুধের কাপে সেই বিষ মিশিয়ে দিয়েছি। তারপর মালতীর দেহ নিঃস্পন্দ হলে ওর শাড়িতে কেরোসিন ঢেলে দেশলাই জ্বেলে দিই। শেষে আগুন দেখে ছল করে চেঁচিয়ে ওঠার আগে ওর পুরোনো জবানবন্দিটা টেবিলের উপর রেখে দিতে ভুল করিনি।'

দেওকীনন্দন অভ্যাস মতো প্রশ্ন করল—'বাবুজী, কীসে মৃত্যু হয়েছিল বলুন!'

অবিনাশ উত্তর দিল,—'বিষক্রিয়ায়।'

পাণ্ডা নির্দেশ দিল,—'তাহলে মন্ত্র পড়ুন বাবুজী,

--বিষশস্ত্রহতাশ্চ যে
আত্মোপঘাতিনো যে চ
তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্।'

এই শীতের অপরাহ্নে ব্রহ্মকুণ্ডের ঠান্ডা জলে সদ্য স্নান করেও কলকল করে ঘামছিল অবিনাশ। পা দুটো কাঁপছে। সমস্ত দেহ, মাথাটা আশ্চর্য হালকা...

পাণ্ডা তাগাদা করল,—'পিণ্ডদান করুন বাবুজী। তাহলেই আত্মার মুক্তি হবে।'

মুক্তি? অবিনাশ বিড়বিড় করল। হ্যাঁ, মুক্তি তাকে পেতেই হবে। বাড়ি ফিরে মা এবং তারপর বিশাখার কাছেও সমস্ত কথা সে অকপটে স্বীকার করবে।

আর তাহলেই মুক্তি শুধু মালতীর নয়; এক অব্যক্ত অস্বস্তি এবং অপরাধ-যন্ত্রণার গুরুভার থেকে অবিনাশ নিজেও হয়তো রেহাই পাবে।

অবৈধ



আচমকা দেখা হয়ে গেল।

অমন হয়, কলকাতায় হতেই পারে। দূর দূব জায়গা থেকে কত লোক আসছে। কাজে-কর্মে নানা প্রয়োজনে হামেশা আসতে হয়। হয়তো আট-দশ বছর কিংবা তারও বেশি দেখা-সাক্ষাৎ নেই। কবে সেই স্কুল কলেজে গাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। তখন একবেলা দেখা না হলে মনটা ছটফট করত। তারপর যা হয়, ছাড়াছাড়ি। স্রোতের নৌকোর মতো নদীতে ভাসতে ভাসতে একদিন দুজনে দুই গঞ্জের বাঁকে মিলিয়ে গেল।

আর খোঁজ-খবর নেই।

শেষে হঠাৎ কলকাতায় বৌবাজারে, হাইকোর্ট পাড়ায় কিংবা কলেজ স্ট্রিটের রেলিং-এর ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আচমকা দেখা। সে বলল, 'আরি বাস্‌' তুই? আমি তো চিনতে পারিনি।'

বন্ধু বলল, 'চিনতে কি আমিও পাবতাম? অনেকক্ষণ তোর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। একবার মনে হল সে-ই, আবার ভাবলাম অন্য কেউ হবে। শেষে কপালের ওই কাটা দাগটা চোখে পড়তেই চিনেছি।'

বন্দর ছেড়ে মহাসমুদ্রে একবার ভেসে পড়লে জাহাজের দুই ক্যাপ্টেনেব নাকি আর চট করে দেখা হয় না। ইংরেজিতে যাকে বলে হেইলিং ডিসট্যান্স, তার মধ্যে আসবার আগে হয়তো অনেক—অনেকগুলি বছর কেটে যায়। আবার সাক্ষাৎ হলেই যে এক লহমায় দুজনে পরস্পরকে চিনতে পাববে, তাই কখনও জোর করে বলা চলে?

অরিন্দমকে দেখে বিনয়ের প্রথমে সেই অবস্থা। মানুষটা চেনা, খুব চেনা। কোথায় যেন আলাপ। তারপর সিনেমা হলে সাদা পর্দায় ছবি ফুটে ওঠার মতো নামটা মনে এল।

'আরে! অরিন্দম না?' বিনয় প্রায় সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠেছিল।

অরিন্দম শুধু অবাক নয়, বিস্ময়ে থ। অস্ফুটে তার মুখ দিয়ে শুধু বেরিয়ে এল, 'বিনয়, তুই? ইস! কতকাল পরে দেখা।'

ডালহৌসি পাড়ায় বিনয়ের একটা কাজ ছিল। শেয়ালদা থেকে ট্যাক্সি নিয়ে ক্রিক রো ধরে দিব্যি আসছিল। কোনো অসুবিধে নেই। কিন্তু সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউয়ের কাছে এসেই বিপত্তি। মস্ত এক মিছিল চলেছে পদাতিক সৈন্যদলের মতো, সামনে তিন-চারখানা ফেস্টুন সাজিয়ে। অন্তত বিশ মিনিটের আগে এই মিছিল ফুরোবে

বলে মনে হয় না। ইতিমধ্যে যা যানজট হয়েছে তাতেই পথঘাট চারদিকে বন্ধ। ট্যাক্সি ড্রাইভার তো সাফ বলে দিল, 'এইটুকু রাস্তা হেঁটে চলে যান, বরং তাড়াতাড়ি পৌঁছোবেন। আমি গাড়িটা ঘুরিয়ে অন্যদিকে যেতে চেষ্টা করি।'

ট্যাক্সিটা না ছাড়লে অরিন্দমের সঙ্গে দেখা হত কি না সন্দেহ। ওর অফিস এদিকেই। টিফিনের সময় ঘর থেকে বেরিয়ে অরিন্দম যাচ্ছিল তাদের কোম্পানির এক ক্লায়েন্টের কাছে। টেলিফোনে বার দুই-তিন চেষ্টা করে সাড়া মেলেনি। ডায়াল করতেই শুধু এনগেজড্ টোন। মাঝে একবার গুবরে পোকার আওয়াজের মতো শব্দ। কলকাতা টেলিফোনের আরেক নাম বোধহয় হতাশা। রিসিভারটা নামিয়ে রেখে অরিন্দম তাই নিজেই মক্কেলের দরজায় যেতে মনস্থ করল।

বিনয়ের কাঁধে হাত রেখে অরিন্দম বলল, 'এখানে দাঁড়িয়ে কী করবি? চল আমার সঙ্গে'।

'কোথায়'? বিনয় মুচকি হাসল।

'আমার অফিসে।'

'তোর অফিসটা কোথায়?' বিনয় সাগ্রহে তাকাল।

'কেন, এই তো কাছেই। ম্যাঙ্গো লেনের ভিতরে। নতুন যে ম্যানসনটা হয়েছে, ওরই তিনতলায়।'

'ম্যাঙ্গো লেন?' বিনয় জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

অরিন্দম মুচকি হাসল। বলল, 'বুঝেছি, তুই কলকাতার লোক নস্। মাঝে মধ্যে এসে বড়জোরে এক-আধ রাত্তির থাকিস্। নইলে সারাদিন কাজ-কর্ম সেবে ডেলি-প্যাসেঞ্জারের মতো সন্ধের দিকে চলে যাস। কলকাতার পথঘাটে, ম্যানসন-বিল্ডিং, এ সবের দিকে নজর দেবার অবসর নেই।'

বিনয় স্বীকার করল। বলল—'আসলে কী জানিস? কলকাতায় এলে এসপ্ল্যানেড, ধর্মতলা আর ডালহৌসি ঘুরেই সময় কেটে যায়। বড় রাস্তা ছেড়ে গলিঘুঁজির মধ্যে কখনও পা দিইনি।'

'আই সি!' অরিন্দম মুচকি হেসে জিজ্ঞাসা করল.—'কলকাতায় এলে উঠিস্, কোথায়? কোনো আত্মীয় স্বজনের কাছে'?

'নেভার।' বিনয় সজোরে মাথা নড়াল। বলল,—'কোম্পানির কাজে আসতে হয়। হোটেলে থাকি। টি এ বিলের সঙ্গে ভাউচার সাবমিট করলেই দিব্যি পাস হয়ে যায়। মিছিমিছি কাউকে ডিসটার্ব করবার কোনো মানে হয়?'

'তা ঠিক।' অরিন্দম সায় দিল।

আগের কথা জের টেনে বিনয় বলল,—'তাছাড়া এখানে আমার নিয়ার রিলেশন কেউ থাকে না। শুধু এক মামাতো ভাই আছে,—দমদমে নাগের বাজারে। অতদূরে থাকলে এক-আধবেলায় আর কাজকর্ম হয়ে উঠবে না।'

সে কথা সত্যি। অরিন্দম বলল,—'তোর হাতে সময় কোথায়?'

মুখখানা ঈষৎ কুঁচকে বিনয় বলল,—'ধুর! তোদের এই কলকাতা আমার একটুও ভালো লাগে না। নেহাত কাজে-কর্মে আসতে হয়, তাই।'

মুচকি হেসে ফের যোগ করল—'বড়জোর দুদিন কিংবা আড়াই দিন থাকি। কখনও তে-রাত্তির কাটাইনি।'

অরিন্দম কৌতুক বোধ করছিল। মফস্বলের লোকেরা এরকম হয়। লোকজন, ভিড়ভাট্টা সহ্য করতে পারে না। মহানগরীতে এলেই পালাই-পালাই ভাব। তার এক দিদি বলেছিল, কলকাতায় ঢুকলেই যেন নিশ্বাসের কষ্ট হয়। হইচই, গণ্ডগোল দম বন্ধ হয়ে আসে।

বিনয় নিজেই বলল,—'সময় কাটাতে একটা সিনেমা কিংবা থিয়েটার দেখি। ইচ্ছে, হলে ভালো রেস্তেরাঁতে ঢুকে ডিনার খাই। বিকেলে একটু আউটরাম ঘাটে, গঙ্গার ধারে কিংবা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কাছে বেড়াই। আবার কোনোদিন কাজ শেষ হলেই সোজা স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরি।'

প্রায় এক যুগ পরে ক্লাস-ফ্রেন্ডের সঙ্গে দেখা। অরিন্দম খুব খুশি হয়ে বলল, —'আমি কিন্তু ভাবতেও পারিনি এমনি হুট করে তোর সঙ্গে দেখা হবে।'

বিনয় মুচকি হাসল।

অরিন্দম খানিকটা স্মৃতিচারণার ঢঙে বলল,—'বাঁকুড়া কলেজে বি.এসসি পড়ার সময় তো তুই ইঞ্জিনিয়ারিং-এ চান্স পেয়ে কোথায় যেন চলে গেলি?'

'অনেক দূর,—নাগপুরে।' জবাব দিয়ে বিনয় পালটা শুধোল,—'আর তুই?'

'আমি বি, এসসি, কমপ্লিট করে কলকাতায় এলাম সি এ. পড়ব বলে। সেই থেকে এখানেই। পাশ করে মরিসন ব্রাদার্সের অডিট ফার্মে চাকরি নিয়ে আছি।'

'ভেরি গুড।' বিনয় সহাস্যে বলল,—'তোর সেই অডিট-ফার্ম বুঝি ম্যাঙ্গো লেনে?'

'হ্যাঁ।' অরিন্দম এক মুহূর্ত বন্ধুর মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, —'তুই আছিস্ কোথায়?'

'বোকারোতে।'

'বোকারো স্টিল?'

'হ্যাঁ। আগে ছিলাম একটা অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিতে। কিন্তু সেটা বড্ড দূরে। তাই বোকারোতে চান্স পেয়ে চলে এলাম।'

অরিন্দম বলল, 'রাস্তায় দাঁড়িয়ে এভাবে কথা হয় না। তোর বরং কাজকর্ম থাকলে সেরে আয়। এই নে, আমার কার্ডটা রাখ্। সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত অফিসে আছি। তার মধ্যে এলেই হবে। দুজনে একসঙ্গে বেরিয়ে পড়ব।'

বিনয় বলল, 'হ্যাঁ, সেই ভালো। তুইও কোনো কাজে বেরিয়েছিস্ মনে হচ্ছে।'

অরিন্দম জবাব দিল, 'সেটা এমন কিছু নয়, সামান্য ব্যাপার। অডিট করতে গিয়ে কোম্পানির খাতাপত্রে দু-একটা এনট্রির ছোটখাট গোলমাল দেখছি। অথচ

ব্যাপারটা ঠিক বোঝা গেল না। পার্টিব কাছ থেকে এর একটা জবাব নিতে হবে। টেলিফোনে কিছুতেই পেলাম না, অগত্যা নিজে যাচ্ছি।' ঘড়ির দিকে একবার তাকাল সে। তারপর বলল, 'এখন আড়াইটে বাজে। সওয়া তিনটের মধ্যে নিশ্চয় ফিরে আসব।'

বিনয় সানন্দে রাজি। বলল, 'তাহলে যাই। চট করে আমার কাজটাও সেরে আসি।' ফের হেসে মন্তব্য করল, 'বলছি বটে, তবে ফিরে আসাটা ঠিক আমার ইচ্ছের ওপর নয়, ওটা বাবুদের মর্জি। সরকারি অফিসের ব্যাপার তো, যদি সিটে পেয়ে গেলাম, তাহলে কাজ হাসিল হতে বড়জোর একঘণ্টা লাগবে। আর সিটে না পেলেই ভোগান্তি। দাঁড়িয়ে থাকো, যতক্ষণ না তিনি স্বস্থানে ফিরছেন। তবে কাজ হোক, আর না হোক—পাঁচটার মধ্যে তোর কাছে নিশ্চয় আসছি। দ্যাট ইজ সার্টেন।'

বিনয় চলে যাবার পর অরিন্দমও এগোল। তার গন্তব্যস্থল কাছেই, সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউয়ের ওপরে এক বহুতল বাড়ির সাততলায়। মাথা ঘুরিয়ে অরিন্দম একবার চারপাশের বাড়ি ঘর, উঁচু উঁচু স্কাইস্ক্র্যাপারগুলো পর্যবেক্ষণ করে নিল। না, আলো আছে। মনে হয় এই এরিয়াতে এখন লোডশেডিং নেই। ঈশ্বরের অশেষ করুণা, নইলে সিঁড়ি ভেঙে ওই সাততলায় উঠতে হত।

হাঁটতে হাঁটতে বিনয়ের মুখখানা তার ফের মনে পড়ল। সত্যি এভাবে রাস্তায় একদিন ওর সঙ্গে দেখা হবে, অরিন্দম যেন তা চিন্তাও করেনি। গত চার-পাঁচ-বছরে বিনয়ের কথা সে প্রায় ভুলে গিয়েছিল। অবশ্য তাই হয়। সময়ের স্রোতে একবার দূরে ছিটকে পড়লে পুরাতনকে আর মনে থাকে না। বর্তমানের সঙ্গে অতীতের ঠিক সতীনের সম্পর্ক। একবার কাছে টেনে নিলে সোহাগী নতুন বউয়ের মতো মানুষকে সে নবজীবনের নানা স্বাদে তুষ্ট করে। দুয়োরানি অতীতকে সেখানে ঠাঁই দেয় না।

অথচ বাঁকুড়া কলেজে পড়ার সময় বিনয়কে না দেখে বোধহয় তার একটা বেলাও কাটেনি। সহপাঠীরা ঠাট্টা করে বলত জিগরী দোস্ত। অঙ্কের প্রফেসর মিঃ মজুমদার নাম দিয়েছিলেন, ভার্টেক্স অ্যান্ড ফোকাস। ক্লাসে তারা পাশাপাশি বসত। একদিন কী কারণে বিনয় কলেজে আসেনি। তার দিকে তাকিয়ে প্রফেসর মজুমদার হঠাৎ বললেন, 'কী ব্যাপার, মিঃ ভার্টেক্স শুধু একা? হোয়্যার ইজ ইয়োর ফোকাস?'

ক্লাস যুদ্ধ ছেলেমেয়ে হো-হো করে হেসে উঠল।

বাঁকুড়া কলেজের সেই হাসিখুশি দিনগুলোর কথা ভাবতে অরিন্দমের এখন খুব ভালো লাগছিল। একটু আগে বিনয়ের সঙ্গে দেখা হবার পর থেকেই মনটা হালকা, দেহটাও যেন মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মতো লঘু হয়ে গেছে। সম্ভবত হৃদয়জনিত যন্ত্রণায় পুরোনো স্মৃতি মলমের মতো ভালো কাজ দেয়। কিছুদিন ধরেই অরিন্দমের মনটা ভালো নেই, সর্বদাই কেমন ভারী হয়ে থাকে। কারণটা একান্ত ব্যক্তিগত।

আসলে ব্যাপারটা এখনও ঠিক চাউর হয়নি। শ্বশুববাড়ির সম্পর্কে যারা আত্মীয়-কুটুম্ব, তারা হয়তো কেউ জানতে পারে, তবে এই নিয়ে কথা ছড়ায়নি। আর অরিন্দমের রক্তের সম্পর্কের লোকেরা কলকাতায় থাকে না। এক দিদি রয়েছে পুরুলিয়ায়, কালেভদ্রে কলকাতায় তাব বাড়িতে আসে। ছোট বোনের বিয়ে হয়েছে ধানবাদে। নিজের ঘর-সংসার নিয়ে সদা ব্যস্ত। কলকাতায় দাদার বাড়ির খোঁজখবর নিতে তার ফুরসত নেই। তবে এরপর হয়তো জানাজানি হবে। এমন রসালো ঘটনা পাঁচকান হলেই দ্রুত চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তে দেরি হবে না।

ঘটনা তার স্ত্রীকে নিয়ে। আজ কয়েক মাস হল ইন্দ্রাণী বাড়ি থেকে চলে গেছে। বলাবাহুল্য এ বিষয়ে তাকে আগে থেকে কিছু জানায়নি। তবে এসব ক্ষেত্রে জানাবার কথা ওঠে না। শুধু একটা চিরকুটে কয়েক লাইন লেখা। তার শেষে ছিল,—'দোহাই তোমার, বউ পালিয়েছে বলে যেন আবার থানা-পুলিশ করে কেলেঙ্কারি বাড়িও না।'

শেষ পর্যন্ত ইন্দ্রাণী যে এরকম একটা কাণ্ড করবে কিছুদিন আগেও অরিন্দম তা চিন্তা করতে পারত না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অবশ্য কোনোদিন বনিবনা হয়নি। তার জন্য দায়ী ইন্দ্রাণীর নাকউঁচু ভাবভঙ্গি। বড়লোকের মেয়ে, মেজাজটা সর্বদা ঈষৎ চড়া। সম্ভবত মধ্যবিত্ত স্বামীর বাঁধা মাইনের সংসারে ইন্দ্রাণী ঠিক মানিয়ে নিতে পারেনি। তাছাড়া মেয়েদের স্বভাবের মধ্যে যে নম্রতা থাকলে মানায়, ইন্দ্রাণীর আচরণে তার ছিটেফোঁটাও ছিল না। আরো একটা বিষয় আবিষ্কার করে অরিন্দম প্রথমদিন স্তম্ভিত হয়েছিল। স্ত্রীর মুখের যেন আগল নেই। কোন কথাটা কখন বলা শোভন তা বিচার করবার শক্তি ঈশ্বর তাকে দেননি। ঠোঁটের ডগায় যা এলো অপরপক্ষকে সেটা ছুঁড়ে মারলেই ইন্দ্রাণী সম্ভবত হালকা বোধ করে।

বিয়ের আগে মেয়ে দেখতে সে একবার ইন্দ্রাণীদের বাড়িতে গিয়েছিল। তার সঙ্গে এক বন্ধু। তবে সেটা ওই যাকে বলে নিছক সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার। অরিন্দম বিশেষ কোনো প্রশ্ন করেনি। এমনি আলগোছে ছুঁড়ে দেবার মতো দু-একটা কথা। তার বন্ধু বরং ফিল্মের গল্প—ইন্দ্রাণী কী ধরনের ছবি দেখতে ভালোবাসে তাই নিয়ে আলোচনা শুরু করল। আর অরিন্দম তখন নির্বাক শ্রোতা। আসলে অনাত্মীয় মেয়েদের সামনে এলেই তার কেমন নার্ভাস লাগে। কিছুতেই জড়ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পারে না। তখন আসর থেকে পালিয়ে আসতে পারলে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। মেয়ে দেখার আগে ইন্দ্রাণীর ছবি সে দেখেছিল। দেশের বাড়ি থেকে বাবা তার ঠিকানায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ছবি দেখে অরিন্দমের অপছন্দ হয়নি। কিন্তু সামনাসামনি চাক্ষুষ দর্শনের পর অরিন্দমের মনে হল ছবির থেকেও ইন্দ্রাণী মনোহারিণী,—অনেক ভালো দেখতে।

বিয়েটা হয়ে গেল। প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে এমন কোনো কারণই ছিল না। অরিন্দমের মেয়ে পছন্দ। আর দেনা-পাওনা? সে বিষয়ে ইন্দ্রাণীর বাবার

কোনো কার্পণ্য নেই। বরং প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশি তিনি দিয়েছেন।

রং-মাটি ধুয়ে গেলে প্রতিমার যেমন খড়ের কাঠামোটা বেরিয়ে আসে, ফুলশয্যার রাত্তিরে ইন্দ্রাণীর আসল রূপটা তেমনি ধীরে ধীরে প্রকাশ পেল। কলকাতায় নয়, বিয়েটা দেশের বাড়ি থেকে হয়েছিল। দোতলায় একটা ঘরে বর কনের শোবার ব্যবস্থা। বাইরে অন্ধকার, ঝিঁঝি ডাকছে, আকাশে অজস্র বুনো ফুলের মতো একরাশ তারা। পিছনের বাগানে হাস্নুহানার মাতাল গন্ধ বহুদূর পর্যন্ত ভেসে গেছে। তখন কত রাত্তির অরিন্দমের খেয়াল নেই। এগারোটা কিংবা হয়তো আরও একটু বেশি হবে। ঘরের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে সে দেখল জানালার পাশে ইন্দ্রাণী চুপ করে দাঁড়িয়ে। পা টিপে টিপে নববধূর কাছে গিয়ে গাঢ়স্বরে নাম ধরে ডাকতেই ইন্দ্রাণী তার মুখোমুখি হল।

স্ত্রীর চোখের দিকে তাকিয়ে অরিন্দম থমকে দাঁড়াল। সে ভেবেছিল ব্রীড়াবনত ভঙ্গি, নরম সলজ্জ, দৃষ্টি—ইন্দ্রাণীর এই রূপটা সে দেখবে। কিন্তু মুখের চেহারা ঠিক উলটো। ভ্রূ কোঁচকানো, শক্ত কাঠ-কাঠ ভঙ্গি। বিরক্তির সঙ্গে সে বলল,—'এ কোন হতভাগা জায়গায় তোমাদের বাড়ি।'

প্রথম সম্ভাষণটা এত রূঢ় হবে অরিন্দম বোধহয় ভাবতেও পারেনি। এর একটা শক্ত জবাব ঠোঁটের ডগায় এসে গিয়েছিল। কিন্তু কোনোমতে নিজেকে সংযত করে সে ধীরে ধীরে বলল, '—মফস্‌সল-শহর কী এর চেয়ে ভালো আশা করেছিলে?'

'শহর বোলো না।' ইন্দ্রাণী যেন ব্যঙ্গ করল। 'এটা একটা এক্সটেন্ডেড ভিলেজ। বাব্বা! চারদিকে কী ঘুটঘুটে অন্ধকার। একটু আগে বাড়ির পিছনে শেয়াল ডাকছিল। এখানে মানুষ থাকে?'

অরিন্দম আর এগোল না, বরং পিছিয়ে এল। বিছানার ওপর নিভাঁজ চাদর পাতা, খাটের বাজুতে ফুলের মালা জড়ানো। পাশাপাশি দুটি বালিশের ওপর শুভ্র গোড়ের মালিকা। ফুলের গন্ধে গোটা ঘরটা ম-ম করছে। একটা হতাশ ভঙ্গি করে বিছানার এককোণে সে বসে পড়ল।

ইন্দ্রাণী এগিয়ে এসে বলল, '—যা একখানা জায়গা। ভাগ্যিস তত্ত্বের সঙ্গে বাবা এক ঝুড়ি ফুল পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। নইলে বোধহয় ফুলশয্যের খাট সাজাতে এখানে ফ্লাওয়ার কিংবা গারল্যান্ড কিছুই পাওয়া যেত না।'

অরিন্দমের ইচ্ছে করছিল ওর এই মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করে। কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে প্রথম রাত্তিরেই বচসা? তাই কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব মোলায়েম করে সে বলল,—'তা কী করা যাবে? এই ছোট জায়গায় অত ফুল পাওয়া কি সম্ভব?'

মাত্র দু-রাত্তির কাটিয়ে বর-কনে কলকাতায় ফিরল। শ্বশুর বিজনেসম্যান, ধুরন্ধর ব্যক্তি। তলে তলে সব বন্দোবস্ত ঠিক ছিল। মেয়ে-জামাইয়ের জন্য বেলেঘাটা লেকের কাছে দোতলায় একটা তিন কামরার ফ্ল্যাট। সামনে বারান্দায়

দাঁড়ালেই লেকের জল, গাছপালা, ঘরবাড়ি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তবে ভাড়া নিতান্ত কম নয়। মাস গেলে ন'শো টাকা। অঙ্কটা শুনে অরিন্দম প্রথমে একটু খুঁতখুঁত করেছিল। ইন্দ্রাণী খিঁচিয়ে বলল,—'এর চেয়ে সস্তায় বাড়ি পাওয়া যায়? আজকাল একটা গ্যারেজের ভাড়া কত লাগে জান?' তার মুখের ওপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে ফের যোগ করল,—'তবু তো বাবা আন্ডারহ্যান্ড আড়াই হাজার টাকা সেলামী দিয়েছেন। সে কথা তোমাকে বলেননি। নইলে ভাড়া আরও বেশি হত।'

অরিন্দম চুপ করে রইল, কোনো জবাব দিল না।

প্রসঙ্গে জের টেনে ইন্দ্রাণী বলে গেল,—'আমার তো ইচ্ছে ছিল সাউথে থাকি। বাবা একটা বাড়িব খোঁজও পেলেন। কিন্তু ভাড়া অনেক—'

অরিন্দম মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করল,—কত?'

'পনেরো'শো টাকা।' তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে ইন্দ্রাণী যেন কথাটা তার দিকে ছুঁড়ে দিল। ফের যোগ করল,—'মা শুনে কী বলল জান?'

অবিন্দম ভ্রূ কুঁচকে তাকাল।

'বাবাকে বলল দেড় হাজার টাকা ভাড়া দিতে হলে তোমার মেয়ে-জামাইকে মাসের সেকেন্ড হাফে ফাস্ট করে থাকতে হবে, সে খেয়াল আছে?'

কথা নয়, যেন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে।

শাশুড়ির এই আপত্তিকর মন্তব্যের একটা প্রতিবাদ জানতে পারলে অরিন্দমের গায়ের জ্বালা মিটত। কিন্তু তার আগেই মেয়ে শুনিয়ে দিল,—'তা মা কিছু অন্যায় বলেনি। তোমার মাইনে, তো শুনি সামান্য,—তিন হাজার টাকাও নয়।'

এই বিয়েতে ইন্দ্রাণী যে সুখী হতে পারেনি সেটা বুঝতে অরিন্দমের বিলম্ব হল না। কিন্তু এ তো বাজারের সওদা নয় যে অপছন্দ বলে ফের কাল বদলে নেবে। আসল ভুলটা তার বাবা করে গেছেন। ভদ্রলোকের একটা ধারণা ছিল যে কলকাতায় মুরুব্বির জোর থাকলে ছেলের খানিকটা সুবিধে হবে। কথায় বলে ডালের মধ্যে মসুর, আর মানুষের মধ্যে শ্বশুর। তা ইন্দ্রাণীর বাবার খাতিরে কিছু সুযোগ-সুবিধা সে নিশ্চয় পেয়েছে। যেমন এই বাড়িখানা,—বেলেঘাটার লেকের ধারে এমন খোলামেলা সুন্দর একটা ফ্ল্যাটে খুঁজে বের করতে তার কালঘাম ছুটে যেত। তাছাড়া মাথার ওপর বলতে গেলে একটা ছাতার মতো আচ্ছাদন, —বিপদে-আপদে শ্বশুর খবর পেলেই ছুটে আসবে। কিন্তু ইন্দ্রাণী যা চেয়েচিল তা নিশ্চয় পায়নি। মাঝে মাঝে তার কলেজের বন্ধুদের গল্প করত। ফার্ন রোডের ঐন্দ্রিলা মজুমদার এককালে তার বুজম ফ্রেন্ড ছিল। সে এখন অটাওয়ায়। হ্যাজব্যান্ড এরোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। গত বছর হঠাৎ একদিন গড়িয়াহাটায় দেখা। ইন্দ্রাণীকে বলল,—'তুই তাহলে এখানেই রয়ে গেলি? জোব চার্নকের ক্যালকাটায়। বলেই গা দুলিয়ে খি-খি করে হাসতে লাগল। অরিন্দমের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে বলে তার

আশা-আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রয়ে গেল, স্পষ্ট ভাষায় সেটা জানিয়ে দিতে ইন্দ্রাণী এক মুহূর্তও দ্বিধা করেনি। সেজন্য মাঝে মাঝে অশান্তি, দুজনের কথা কাটাকাটি। ঝগড়াঝাঁটি করে ইন্দ্রাণী কয়েকবার বাপের বাড়ি চলে গিয়েছে। কিন্তু দু-একদিন না যেতেই শ্বশুর কিংবা শাশুড়ি নিজে টেলিফোনে তাকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেছেন। জামাই বাড়িতে এলে মেয়েকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ফের স্বামীর সঙ্গে পাঠিয়ে মা-বাপের কর্তব্য করেছেন। ফিরে আসতে প্রথমে গররাজি হলেও পরে ইন্দ্রাণী তার সঙ্গে আসতে সম্মতি জানাত। তারপর রাত্তিরের খাওয়া সেরে অরিন্দমের সঙ্গে বাবার গাড়িতে করে বেলেঘাটার বাড়িতে ফিরে এসেছে।

দুই

কিন্তু এবারকার ব্যাপাবটা ঘোরালো, কিছুটা প্রেমঘটিত বলা চলে। যেন দমকা একটা ঝোড়ো হাওয়া অকস্মাৎ তার ঘরে ঢুকে সব লণ্ডভণ্ড কবে দিয়ে গেল। সেও বছরখানেক আগের কথা। কোনো এক সন্ধ্যায হীরক সোম নামে এক ভদ্রলোক হঠাৎ তার বাড়িতে এসে হাজির। লোকটিকে সে আগে দেখেনি, চিনত না। স্ত্রীব মুখে নামও শোনেনি। বছর তিরিশ বয়স, হ্যান্ডসাম চেহারা। মাথায় ঈষৎ পিঙ্গল কোঁকড়া চুল। পরনে ব্লু রঙের প্যান্ট, গায়ে গেঞ্জির মতো একটা লাল জামা। হাতে জ্বলন্ত সিগারেট, পায়ে একজোড়া সুদৃশ্য স্লিপার।

ভদ্রলোক ঘরে ঢুকতেই ইন্দ্রাণী প্রায় ছুটে এসে তার হাত ধরল। রীতিমতো খুশির সুবে বলল, 'হীরকদা, তুমি কবে এলে?'

'পরশু রাত্তিবের ফ্লাইটে। সিগাবেটে একটা ছোট্ট টান দিয়ে ইন্দ্রাণীর দিকে তাকিয়ে সে হাসল। বলল, দিল্লিতে অবশ্য দুদিন আগে এসেছি। কথাগুলি সে কেমন চিবিয়ে উচ্চারণ করল।

আগন্তুকের সঙ্গে ইন্দ্রাণী পরিচয় করিয়ে দিল। বলল, 'হীরকদা, তার মানে মিঃ হীরক সোম। অ্যা ব্রিলিয়্যান্ট স্টুডেন্ট। এখন বড় ডাক্তার, আজ চার বছরের ওপর হল স্টেটসে আছে।'

হীরক সোম হাত বাড়িয়ে বিলিতি ঢঙে তার সঙ্গে করমর্দন করল। বলল, গ্ল্যাড টু মিট ইউ মি মুখার্জি।

ইন্দ্রাণী চোখ দুটি নাচিয়ে মুচকি হেসে জিজ্ঞাসা করল, 'আমাদের ফ্ল্যাটের ঠিকানা পেলে কোথায়?'

'হোয়াই? সেটা কি খুব ডিফিকাল্ট?' হীরক পাল্টা প্রশ্ন করল। বলল, 'গতকাল তোমাদের বাড়িতে ফোন করেছিলাম যে। মাসিমার কাছ থেকে ঠিকানা নিয়েছি।'

'তাই? ইন্দ্রাণী বিজ্ঞের মতো নিচের ঠোঁটটা ঈষৎ কামড়ে কী যেন ভাবল। তারপর বলল, 'এসেই তাহলে আমার খোঁজে ও-বাড়িতে ফোন করেছিলে?'

'তা বলতে পারো।' কাঁধ ঝাঁকিয়ে হীরক পরিষ্কার জবাব দিল। মুচকি হেসে বলল,'কলকাতাতে পা দিয়ে তোমার কথা প্রথম মনে পড়ল যে।'

অনাত্মীয় পুরুষের মুখে এমন ভাষা শুনলে যে কোনো মেয়ে লজ্জা পাবে,

বিশেষ করে স্বামী যদি সশরীরে সামনে উপস্থিত থাকে। শুধু লজ্জা নয়, বোধহয় একটা অস্বস্তিও। সেটা কাটিয়ে উঠতে ইন্দ্রাণী তাড়াতাড়ি অতিথি সৎকারের আয়োজন করবার অছিলায় ভিতরে গেল। হীরক ড্রইংরুমে বসে রইল, অরিন্দম সামনে। হাতের দগ্ধ সিগারেটটা টোকা দিয়ে নেড়ে অ্যাশ-ট্রের ওপর খানিকটা ছাই ফেলল হীরক। অরিন্দমের দিকে তাকিয়ে বলল, 'শুনলাম আপনি চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। চাকরি না প্র্যাকটিশ করছেন?'

'চাকরি।' অরিন্দম সংক্ষিপ্ত জবাব দিল।

হীরক শুধোল, 'কোথায় অফিস?'

'ম্যাঙ্গো লেনে।'

'কী নাম ফার্মের?'

'মরিসন ব্রাদারস।'

'আই সি। হীরক সিগারেট একটা ছোট্ট টান দিয়ে বলল, 'ওটা তো খুব রেপিউটেড কনসার্ন। তবে কী জানেন, এই প্রফেসনে চাকরি করে ঠিক স্যাটিফ্যাকশন হবে না। বরং নিজের একটা ফার্ম করতে পারলে, দ্য স্কাই ইজ দ্য লিমিট।'

'সে কথা হয়তো সত্যি', অরিন্দম স্বীকার করে নিয়ে বলল, 'কিন্তু একটা রিস্কও আছে। শেষ পর্যন্ত প্র্যাকটিশ যদি না জমে তখন কঠিন অবস্থা। কপালে দুঃখ আছে।'

মিনিট পাঁচ-সাত পরে ইন্দ্রাণী ফিরল। এক নয়, পিছনে পরিচারিকা। তার হাতে ট্রে, ওপরে কফির পোয়ালা। প্লেটে সন্দেশ, ক্রীম বিস্কুট আর চানাচুর।

অরিন্দম অপাঙ্গে দেখল এরই মধ্যে এক ফাঁকে শাড়িটা বদলে এসেছে ইন্দ্রাণী। মুখে হালকা প্রসাধনের চিহ্ন। কপালে চূর্ণ কুন্তল, অঙ্গে মৃদু সুবাস। সম্ভবত জামায় শাড়িতে একটু সেন্ট ঢেলেছে।

'আশ্চর্য!' হীরক তারিফ করে বলল, 'বিয়ে হলেই মেয়েরা কী তাড়াতাড়ি বদলে যায়। তুমি এমন গুছিয়ে ট্রে সাজিয়ে আনবে, তাই কি আগে কোনোদিন ভাবতে পেরেছিলাম?'

কফির পেয়ালা আর খাবারের প্লেটটা এগিয়ে দিয়ে ইন্দ্রাণী মধুর হাসল। বলল, 'কথা না বাড়িয়ে বরং এগুলোর সদ্ব্যবহার করো। মনে রেখো, আমরা বাড়িতে আজ প্রথম এলে। একটি জিনিসও যদি ফেলে রাখো, তাহলে কিন্তু ভালো হবে না।'

খাবারের প্লেটটার দিকে এক নজর তাকিয়ে হীরক প্রায় হাঁ-হাঁ করে উঠল। বলল, 'খেপেছ নাকি? একসঙ্গে চারটে সন্দেশ কেউ খেতে পারে। তবে হ্যাঁ, তোমার কফি আর চানাচুর আমি ফেলে রাখছি নে।'

আরো আধঘণ্টা পরে হীরক সেদিন উঠল। নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করে এসেছিল।

ইন্দ্রাণী তার সঙ্গে রাস্তা পর্যন্ত গেল। অরিন্দম দরজা পর্যন্ত গিয়ে আর এগোয়নি। যাবার আগে হীরক তার বাড়ির টেলিফোন নম্বরটা জানতে চাইল।

উত্তরে অরিন্দম সলজ্জ হাসল। যন্ত্রটা আছে তবে বিকল। কদিন ধরে লাইনটা খারাপ। চিঠিপত্র দিলে কোনো ফল হয় না। বরং সময় নষ্ট করে যদি টেলিফোন অফিসে লোকের কাছে ধরনা দিতে পারে তাহলে হয়তো একটা সুরাহা হয়। কিন্তু অরিন্দমের হাতে তেমন বাড়তি সময় কই? ভরসার মধ্যে টেলিফোন অফিসে তার এক বন্ধু কাজ করে। লাইন গণ্ডগোল হলে তাকে খবর পাঠালে বরং ব্যাধি দ্রুত সারে।

হীরক সোমের সঙ্গে তার স্ত্রীর যে শুধু পরিচয় নয়, একদা ঘনিষ্ঠতা ছিল, অরিন্দমের সেটা বুঝতে অসুবিধে হয়নি। কিন্তু প্রথম দিন ইন্দ্রাণীকে সরাসরি এমন একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে তার ভদ্রতায় বাধল। আর জিজ্ঞাসা করলেও ইন্দ্রাণী কি সেটা স্বীকার করত?

রাত্তিরে খাওয়ার টেবিলে বসে ইন্দ্রাণীকে অরিন্দম জিজ্ঞাসা করল, 'এই ভদ্রলোকের নাম তো আগে কখনও শুনিনি।'

'কেমন করে শুনবে?' ইন্দ্রাণী আড়চোখে তার দিকে এক পলকে তাকিয়ে বলল, 'হীরকদা কি আমাদের আত্মীয়?'

'তাহলে?'

'তাহলে আবার কী? ইন্দ্রাণী অন্যমনস্কের মতো বলল, 'আমার সঙ্গে এমনি পরিচয় হয়েছিল। তারপর বাড়িতে আসত।' শেষে ব্যাপারটা যেন কিছুই নয় এমনি একটা ভঙ্গি করে খানিকটা হেসে বলল,—'তখন এমন সব মজার গল্প করত। একবার জলপাইগুড়ির ফরেস্টে কোন ডাকবাংলাতে রাত্তিরে নাকি ভূত দেখতে পেয়েছিল।' কিন্তু ভৌতিক কাহিনি শুনতে অরিন্দম কোনো কৌতূহল প্রকাশ করল না। ইন্দ্রাণী তাই মাঝপথে থেমে গেল।

আসল প্রশ্নটার জবাব না দিয়ে স্ত্রী যে পাশ কাটিয়ে যেতে চায় সেটা বুঝতে পেরে অরিন্দম ভ্রূ কুঞ্চিত করল। কয়েক মুহূর্তে পরে নিজেই শুধোল,—'ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে তোমার ইতিমধ্যে দেখা হয়নি, তাই না?'

স্বামী যে তাকে কোণঠাসা করতে চাইছে সেটা বুঝতে পেরে ইন্দ্রাণী এবার স্বমূর্তি ধারণ করল। খোঁচা লাগলেই সে বেয়াড়া হয়ে ওঠে অরিন্দম তা জানে। মুখের আগল থাকে না। রীতিমতো চোখ পাকিয়ে ইন্দ্রাণী জবাব দিল,—'ঘটে যদি এতটুকু বুদ্ধি থাকত। দেখা হবে কেমন করে? বছর চারেক আগে সে হঠাৎ একদিন স্টেটসে চলে গেল।' এক মুহূর্ত থেমে কী মনে করে ফের বলল, 'আমার বিয়ের খবর পেয়ে একটা সুন্দর গ্রিটিংস কার্ড পাঠিয়েছিল।'

অরিন্দম আর কিছু জিজ্ঞাসা করেনি। ব্যাপারটা এমন নির্দোষ ভঙ্গিতে ইন্দ্রাণী বলে গেল যে হীরক সোমের সঙ্গে তার যে অন্য সম্পর্ক থাকতে পারে এই মুহূর্তে তা চিন্তা করা যায় না। কিন্তু নিষিদ্ধ প্রেম গোপন ব্যাধির মতো। কেমন করে যেন ফাঁস হয়ে যায়। লোকে সোচ্চার হয় না ঠিক, কিন্তু টের পায়। হীরক সোম কলকাতায় আসার পর ইন্দ্রাণীর হাবেভাবে, চলাফেরায় যে একটা দ্রুত পরিবর্তন শুরু হয়েছিল, অরিন্দমের চোখে তা এড়ায়নি। সপ্তাহে অন্তত তিন দিন অফিস থেকে ফিরে স্ত্রীকে সে বাড়িতে পায়নি। শুধু বিকেল নয়, দু-একদিন দুপুরবেলাতেও ইন্দ্রাণীকে টেলিফোন করে সে ধরতে পারেনি। অরিন্দম প্রথমে ভেবেছিল ইন্দ্রাণী বোধহয় চেতলায় বাপের বাড়ি গেছে। কিন্তু একটা জরুরি খবর ছিল। তাই শ্বশুরবাড়িতে ফোন করল। আশ্চর্য কাণ্ড! ইন্দ্রাণী সেখানেও নেই। টেলিফোনে শাশুড়ির জবাব শুনে সে তো আরও অবাক। গত পনেরো-বিশ দিনের মধ্যে ইন্দ্রাণী নাকি ও রাস্তা মাড়ায়নি।

রাত্তিরে দেখা হতেই অরিন্দম জিজ্ঞাসা করল, 'সারা দুপুর ছিলে কোথায়?'

'তার মানে?' ইন্দ্রাণী এবার সামনে ফিরে যেন রুখে দাঁড়াল।

অরিন্দম স্পষ্ট গলায় বলল, 'মানে তুমি কোথায় গিয়েছিলে তাই জানতে চাইছি।'

'কৈফিয়ত? ইন্দ্রাণী বেয়াড়া ঘোড়ার মতো ঘাড় শক্ত করে দাঁড়াল। বলল, 'এই উইমেনস লিবের যুগে তোমার মতো একজন কনজারভেটিভ হাজব্যান্ডের মুখেই এসব কথা মানায়।'

জিভের ডগায় একটা কটু কথা এসে গিয়েছিল। কিন্তু অরিন্দম বহু কষ্টে নিজেকে সংযত করল। বলল, 'কোথায় গিয়েছিলে সেটা জানতে চাওয়া বোধহয় স্ত্রী-স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা নয়। আর এর জন্য আমাকে যদি রক্ষণশীল বলো, তাহলে আমি নাচার।'

'অন্য কেউ এই প্রশ্ন করলে হয়তো মনে করতাম না। ইন্দ্রাণী এই মন্তব্যটা তার দিকে ছুঁড়ে দিল। বলল, 'কিন্তু তোমার এই জিজ্ঞাসার মধ্যে একটা প্রভুত্বের সুর রয়েছে। আজকালকার কোনো মেয়ে সেটা মেনে নিতে পারে না।'

অরিন্দম আর কিছু বলেনি। এরপর কথা মানেই বাক-বিতণ্ডা। স্ত্রীর সঙ্গে একটা কলহবিবাদ, যার পরিণতি ঘোর অশান্তি। অরিন্দম তো জানতেই পেরেছে ইন্দ্রাণী আজ দুপুরবেলা ঘরে ছিল না। চেতলার বাপের বাড়ি যায়নি। অবশ্য এমনও হতে পারে ইন্দ্রাণী সাংসারিক কাজকর্মে কোথাও বেরিয়েছিল। জিনিসপত্র কেনাকাটা সবই তার হাতে। পথেঘাটে ওর স্কুল-কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলে কখনও দাঁড়িয়ে কথা বলে। কোনোদিন তাদের বাড়িতে গিয়ে কিছুক্ষণ আড্ডা দিয়ে ফেরে। কিন্তু এক্ষেত্রে তেমন কিছু ঘটে থাকলে ইন্দ্রাণী নিশ্চয় চটে উঠত না। আসলে মানুষ যখন কোনো বিষয় গোপন রাখতে চায়, তখন সেই নিয়ে তাকে প্রশ্ন করলে

সে বিরক্ত হয়। এড়িয়ে যেতে না পারলে খেপে ওঠে।

দিন পনেরো না যেতেই কিন্তু ইন্দ্রাণী একরকম হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেল। বাথরুম থেকে বেরিয়ে অরিন্দম শুনতে পেল শোবার ঘরে টেলিফোনে ইন্দ্রাণী কার সঙ্গে কথা বলছে। আগে হলে এই নিয়ে সে আদৌ মাথা ঘামাত না। হয়তো টেলিফোন রেখে ইন্দ্রাণী নিজেই এসে তাকে সবিস্তারে সব জানাত। তাড়াহুড়ো থাকলে ব্যাপারটা চাপা পড়ে যেত। কার ফোন তাই নিয়ে কোনো প্রশ্ন উঠত না। কিন্তু সন্দেহ বড় বিশ্রী জিনিস। একবার মাথায় ঢুকলে সর্বাগ্রে বিশ্বাস নামক ভঙ্গুর আধারটিকে খান খান করে ভেঙে ফেলে। সাতসকালে স্ত্রীকে টেলিফোনে হেসে কথা বলতে দেখে সেই সন্দেহটা মুহূর্তে বিদ্যুৎ তরঙ্গের মতো তার মস্তিষ্কের কোষে কোষে ছড়িয়ে গেল। শিকারি বিড়ালের মতো পা টিপে টিপে অরিন্দম এসে দরজার বাইরে দাঁড়াল। সদ্যোস্নাত দেহ, কোমরে শুধু তোয়ালেটা জড়ানো। বাড়িতে অন্য কেউ নেই। কাজের মেয়েটিকে কয়েক মিনিট আগে ইন্দ্রাণী কী যেন আনতে বাইরে পাঠিয়েছে। অরিন্দম প্রায় স্ট্যাচুর মতো নির্বাক দাঁড়িয়ে ওর কথাগুলো শুনছিল। রিসিভারটা হাতে নিয়ে ইন্দ্রাণী তখন হাসতে হাসতে বলছিল, 'ঠিক আছে বাবা। পৌনে তিনটের আগেই আমি যাচ্ছি। হ্যাঁ, তুমি কিন্তু টাইগারের সামনে দাঁড়িয়ে থেকো। না, মেট্রোর কাছে বড় ভিড়। চেনাজানা লোক আসে যায়। কেউ জিজ্ঞাসা করলে কী জবাব দেব বলো? এদিকে আমার কর্তার মনে বোধহয় একটা কিছু ঢুকেছে। হ্যাঁ, একদিন এই নিয়ে কথা বলতে এসেছিল। আমি স্রেফ ধমক দিয়ে থামিয়ে দিয়েছি।'

ইন্দ্রাণী রিসিভারটা নামিয়ে বেডরুম থেকে বেরিয়ে আসবার আগেই অরিন্দম অন্য ঘরে গিয়ে জামা-কাপড় বদলাতে শুরু করল। অরিন্দম দেখল, ইন্দ্রাণীও এই নিয়ে কোনো কথা তুলল না। কার সঙ্গে এতক্ষণ সে কথা বলছিল সেটা জানাবার তার কোনো তাগিদ নেই।

বেলা দুটোর সময় অরিন্দম ট্যাক্সি নিয়ে টাইগার। সিনেমা হলের কাছে এসে থামল। ঘড়ির দিকে এক নজর তাকিয়ে দেখল। চারপাশে চোখ বুলিয়ে বুঝতে পারল ইন্দ্রাণী কিংবা তার প্রেমিক কেউ এখনও আসেনি। অবশ্য সময় আছে। আর আজকাল ইচ্ছে থাকলেও কি টাইমে আসা যায়? পথের মধ্যে যানজটে একবার ফেঁসে গেলেই দাঁড়িয়ে থাক।

টিকিট কাউন্টারের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে অরিন্দম পথের ওপর চোখ রাখল। নিজেকে একজন প্রাইভেট গোয়েন্দার মতো লাগছিল। এক ভদ্রমহিলা তার ঈপ্সিত পুরুষের সঙ্গে মিলিত হবে। অথচ মেয়েটির সামাজিক পরিচয় তার স্ত্রী। সেই দৃশ্যটি চাক্ষুষ দেখে অরিন্দম এতদিনের সন্দেহ, অবিশ্বাসের বিবাদভঞ্জন করতে পারবে। প্রায় তিনটে বাজতে এখনও এভাবে কাটিয়ে সে একটা সিগারেট ধরাল। পৌনে তিনটে বাজতে এখনও বেশ দেরি। অরিন্দমের হঠাৎ মনে হল, সিনেমার

টিকিট কাউন্টারের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বোধহয় উচিত হবে না। আচমকা যদি ইন্দ্রাণী তার প্রেমিকের সঙ্গে এদিকে চলে আসে, তাহলে একটা বিশ্রী পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। ওদিকের একটা দোকানের পাশে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য রাখাই ভালো।

হাতের সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অরিন্দম হেঁটে চলল। জীবনে একরম একটা পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে, অরিন্দম কি কোনোদিন তা ভাবতে পেরেছিল? অথচ বিয়ের আগে ইন্দ্রাণীর এ খবর কেউ তার কানে পৌঁছে দেয়নি। হীরক সোমের কথা তো এতদিন তার কাছে অজ্ঞাত ছিল। ইন্দ্রাণীর সঙ্গে হীরকের এই সম্পর্ক নিশ্চয় নতুন নয়। অরিন্দমের সঙ্গে বিয়ে হবার আগেই ইন্দ্রাণী হয়তো ওকে ভালবাসত। তারপর যে কোনো কারণেই হোক, হীরক হঠাৎ বিদেশে পাড়ি দিয়েছিল। এ দেশে তার ফিরে আসার কোনো সময়সীমা কিংবা স্থিরতা ছিল না। তাই হয়তো অরিন্দমের সঙ্গে বিয়ের ঠিকঠাক হতে ইন্দ্রাণী আর দ্বিমত করেনি।

জ্যৈষ্ঠের শুরু। আকাশে মেঘের ছায়া নেই। দুপুরে বেশ গরম। পরশু সন্ধের দিকে ঝড়বৃষ্টি হয়ে ছিল। আজও তার রেশ একটু রয়ে গেছে। মাঝে মাঝে এলোমেলো হাওয়া দিচ্ছে, তাই খুব একটা অসহ্য লাগছে না। রাস্তাটা পেরিয়ে আরো কিছুদুর গিয়ে অরিন্দম একটা বড় দোকানের সামনে দাঁড়াল। সিগারেটে আলতো টান দিয়ে সে এলোমেলো কত কী চিন্তা করছিল। আজ তিন বছর হল ইন্দ্রাণীকে সে বিয়ে করেছে। বড়লোকের মেয়ে বলে বন্ধুরা কেউ কেউ তাকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করেছিল। বলেছিল, বিয়েতে মত দেবার আগে ব্যাপারটা একটু তলিয়ে চিন্তা করতে। শাঁসালো শ্বশুর সুবিধে হয় ঠিক, প্রয়োজনে সাহায্য মেলে। কিন্তু তার জন্যে আবার মূল্য দিতে হয় অনেক বেশি।

অরিন্দম ভাবছিল বিয়ের পর এই তিন বছর ইন্দ্রাণীর সঙ্গে তার কী সম্পর্ক ছিল? এক ঘরে একই ছাদের নীচে বাস করেও তারা কি খুব কাছাকাছি আসতে পেরেছে? রাত্তরে এক বিছানায় স্বামী-স্ত্রী কিংবা স্ত্রী-পুরুষের মতো ঘুমিয়েছে? প্রকৃতির নিয়মে কখনও দুজনে মিলিত হয়েছে। ব্যস্, এই পর্যন্ত। সমস্ত ব্যাপারটা শুধু যান্ত্রিক, বেঁচে থাকার তাগিদে নিয়মমাফিক ঘটেছে। স্ত্রীর হৃদয়ে কিংবা মনের কোণে অরিন্দমের কোনোদিন ঠাঁই হয়নি।

টাইগার সিনেমা হলের ঠিক সামনে একটা গাড়ি এসে থামতেই অরিন্দম তাকাল। যা ভেবেছিল তাই। চকোলেট রঙের হেরাল্ড গাড়ির দরজা খুলে হীরক বেরিয়ে এল। পরনে ক্রিম রঙের প্যান্ট, গায়ে গোলাপি রঙের পলিয়েস্টারের শার্ট। এদিক-ওদিক তাকিয়ে হীরক একটা সিগারেট ধরাল। পৌনে তিনটে বাজে। তার দাঁড়ানোর ঢং, সিগারেট টানবার শ্লথ ভঙ্গি এবং উৎকণ্ঠিত ভাব দেখে মনে হলো ইন্দ্রাণী এখনও না আসতে বেচারী যথেষ্ট নিরাশ হয়েছে। খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে অরিন্দমের মনে এক মিশ্রিত ভাবের সৃষ্টি হচ্ছিল। ওই লোকটা তার স্ত্রীর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। আর স্বামী হয়েও সে কেমন নিশ্চেষ্ট, নির্বাক দর্শকের

মতো নাটকের একটি দৃশ্য দেখার প্রতীক্ষায় রয়েছে। আচ্ছা, এই মুহূর্তে অরিন্দম যদি আস্তিন গুটিয়ে ওই লোকটার দিকে তেড়ে যায়? ঘুষি পাকিয়ে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে? তারপর ইন্দ্রাণী এসে পৌঁছলে তার চুলের মুঠি ধরে হিড় হিড় করে টেনে তাকে ফের বাড়িতে নিয়ে যায়? ব্যাপারটা কল্পনা করে অরিন্দম কেমন বিজাতীয় আনন্দ অনুভব করল। কিন্তু তার মতো লোকের পক্ষে অমন একটা কাজ করা যে প্রায় অসম্ভব, এ-কথা শুধু সে নয়, ইন্দ্রাণীও বোঝে।

ঠিক তখুনি একটা ট্যাক্সি এসে গাড়িটার পিছনে দাঁড়াল। ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে ইন্দ্রাণী নামতেই হীরক হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে কী যেন বলল। ইন্দ্রাণী একগাল হেসে কিছু বোঝাতে চাইল। হীরক আর দেরি করল না। ড্রাইভিং সিটে বসে স্টিয়ারিঙে হাত রাখল। অরিন্দম দেখল বাতাসে খানিকটা পোড়া পেট্রোলের গন্ধ ছড়িয়ে চকোলেট রঙের সেই গাড়িটা সোজা বেরিয়ে গেল। ইন্দ্রাণী হেসে হেসে হীরককে কী যেন বলছিল, বক্তব্য যে মজার এবং খুশির, কথা শুনতে না পেলেও স্ত্রীর মুখের দিকে এক নজর তাকিয়ে অরিন্দম সেটা বেশ বুঝতে পারল।

ব্যাপারটা চরমে উঠল দিন কয়েক পর। অফিসের কী একটা কাজে অরিন্দম বাইরে গিয়েছিল। বাড়িতে ফিরতে রাত্তির হতে পারে এমন একটা কথা আলগোছে একবার বলেছিল। ইদানীং স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্কটা নিতান্ত আটপৌরে হয়ে গেছল। প্রয়োজনীয় দু-একটা কথা ছাড়া অরিন্দম কিছু বলত না। স্বামীর মনে যে সন্দেহ ঢুকেছে, সম্ভবত ইন্দ্রাণীও তা বুঝতে পারত। তবু যথাসাধ্য স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করেছে। কিন্তু ছোট্ট একটা ভুল কখনও বিরাট বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে। সেদিন বাড়ি ফিরে নিজের শোবার ঘরে গিয়ে অরিন্দমের মাথার রক্তে চড়ে গেল। বেডরুমে তার বিছানার পাশে জানালার ওপর ছোট্ট একটা অ্যাশ-ট্রে থাকে। রাত্তিরে কখনও সিগারেট খেতে ইচ্ছে হল দগ্ধ অংশটা ওখানেই ঝেড়ে দেয়। কী মনে হতে অরিন্দম ছাইদানিটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। একটা আধপোড়া সিগারেট। বাঁ হাতের দুটি আঙুল দিয়ে তুলে নিয়ে দেখল। এই ব্রান্ড তো সে খায় না। তাহলে? হ্যাঁ, এই বাড়িতেই আর একজনকে ওই সিগারেট খেতে দেখেছে। মুহূর্তে সমস্ত সংযম হারিয়ে ফেলল অরিন্দম। তার শোবার ঘরের ছাইদানিতে সেই সিগারেটের পোড়া অংশ কেমন করে এল? এখন সেটা অনুমান করে নিতে তার অসুবিধা হল না।

চিৎকার করে ইন্দ্রাণীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, 'শোবার ঘরে কাকে এনেছিলে?'

ইন্দ্রাণী প্রথমটা থতমত খেয়ে গেলেও চট করে নিজেকে সামনে নিল। অভিযোগ সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে জবাব দিল, 'কী যা-তা বলছ?'

'থাক, শাক দিয়ে আর মাছ ঢাকতে হবে না।' অরিন্দম ব্যঙ্গ করে হাসল। স্ত্রীর মুখের ওপর সন্ধানী আলোর মতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে কী যেন সে লক্ষ্য করছিল।

হ্যাঁ, গলার বাঁদিকে ছোট্ট একটা দংশনের চিহ্ন যেন। অরিন্দম বলল, 'ছি-ছি! একেবারে শোবার ঘরে বিছানায় এনে তুলেছিলে?'

'চুপ করো বলছি।' ইন্দ্রাণী আরো জোরে চেঁচিয়ে অরিন্দমের কণ্ঠস্বরকে ছাপিয়ে যেতে চেষ্টা করল, 'মুখ সামলে থাকবে। নইলে কিন্তু তোমাকেও ছেড়ে কথা কইব না।'

আড়াচোখে একবার স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে অরিন্দম উঠে দাঁড়াল। সিগারেটের আধপোড়া অংশটুকু দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'এই ব্র্যান্ডটা কে খায় বলতে পারো?'

মুহূর্তে ইন্দ্রাণীর মুখখানা সন্ধেবেলার লো ভোল্টেজের বাতির মতো নিষ্প্রভ দেখাল।

অরিন্দম বলল, 'ভদ্রলোককে তুমি চেনো। উনি তোমার হীরকদা, মিঃ হীরক সোম। এই ব্র্যান্ড তাঁর প্রিয়। তিনি তোমার শোবার ঘরে ঢুকে সিগারেট না খেলে নিশ্চয় এটা ছাইদানিতে আসত না।' এক মুহূর্ত থামল সে। তারপর মুখখানা ঈষৎ বিকৃত করে বলল, 'তাছাড়া আয়নায় তাকালেই বুঝতে পারবে। গলার বাঁ দিকে একটা চিহ্ন উনি রেখে গেছেন। সেটা মুছে ফেলা যায়নি।'

অকাট্য প্রমাণ। তবু ইন্দ্রাণী একটা জবাব দিতে চেষ্টা করল।

অরিন্দম বলল, 'শুধু এই নয়। গত শুক্রবার বেলা তিনটে নাগাদ টাইগারের সামনে থেকে ওই ভদ্রলোকের গাড়িতে উঠে তুমি কোথায় গিয়েছিলে? বাড়ি ফিরতে সেদিন রাত্তির আটটা বেজেছিল।'

জবাব দেওয়া দূরে থাক, ইন্দ্রাণী আর সেখানে দাঁড়াল না। গোয়েন্দার মতো অরিন্দম তার পিছনে চোখ রেখেছে! দ্রুত পায়ে অন্য ঘরে ঢুকে সশব্দে দরজা বন্ধ করে ছিটকিনি তুলে দিয়ে ইন্দ্রাণী প্রায় আত্মগোপন করে রইল। সেই থেকে দুজনের বাক্যালাপ বন্ধ। রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ল অরিন্দম। ইন্দ্রাণী খেল কি না সেটা খোঁজ নিতেও তার ইচ্ছা হয়নি।

পরদিন সকাল নটার অনেক আগেই সে অফিসে বেরিয়ে গেল। ঘুম থেকে উঠল একটু দেরিতে। কাজের ছেলেটা অন্য দিনের মতো চা দিল। কাঁধে তোয়ালে আর হাতে পেস্ট লাগানো টুথ-ব্রাশ নিয়ে অরিন্দম বাথরুমে ঢুকল। স্নান সেরে বেরিয়ে শুধু লক্ষ্য করল ইন্দ্রাণীর ঘরের দরজা খোলা। সম্ভবত বারান্দায় কিংবা অন্য কোথাও রয়েছে।

সন্ধের পর বাড়ি ফিরে অরিন্দম খবরটা শুনল। ইন্দ্রাণী চলে গেছে। সেই ছোঁড়া চাকরটা তাকে বিস্তারিত ভাবে সব জানাল, লালচে রঙের গাড়িতে করে সেই ফর্সাপানা বাবুটা আজ এসেছিল যে। বৌদিমণির সঙ্গে কতক্ষণ কথা বলল। চা খেল, সিগারেট ধরাল। তারপর সুটকেস গুছিয়ে নিয়ে বৌদিমণি গাড়িতে উঠে দুজনে হুস করে করে কোথায় চলে গেল।

অরিন্দম খুব একটা আশ্চর্য হয়নি। শেষ পর্যন্ত পরিণতি এদিকেই যে মোড় নিতে চলেছে, এটা যেন সে আগেই জানত। অবশ্য এছাড়া ইন্দ্রাণীর আর কী উপায় ছিল? বরং হীরক যদি সমস্ত কথা শুনে তাকে এড়িয়ে যেত, তাহলে ঝোঁকের মাথায় ইন্দ্রাণী যে একটা অকল্পনীয় কিছু করে বসত না, তাই বা কে বলতে পারে? অরিন্দমের মনে হল তার চেয়ে এটা বোধহয় ভালোই হয়েছে। বউ ঘর ছেড়ে অন্য পুরুষের সঙ্গে পালিয়ে গেছে শুনলে লোকে অবশ্য তাকে অনুকম্পা করবে। আড়ালে বিদ্রূপ করতেও ছাড়বে না। ঠোঁটকাটা হলে তার পুরুষত্ব নিয়ে সন্দেহের প্রশ্ন তুলতে পারে।

যাবার সময় বুদ্ধি করে ইন্দ্রাণী একটা চিঠি লিখে গেছে। এই চিঠিখানা অন্তত তাকে বহু কৈফিয়ত দেবার দায় থেকে রক্ষা করবে। ইন্দ্রাণী লিখেছে, 'এ বাড়ি থেকে চলে গেলাম। চিরদিনের মতো। এতদিন যে সম্পর্কের কথা তোমাকে নানাভাবে লুকিয়েছি, এখন জোর গলায় স্বীকাব করে যাচ্ছি। হ্যাঁ, আমরা পরস্পরকে ভালোবাসি। তবু তোমার সঙ্গে বিয়েতে কেন যে মত দিলাম, তার জবাব আমি নিজেই খুঁজে পাচ্ছি না। শুধু এটুকু জানি, সেদিন হীরকদার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হতেই আমি আবার নিজেকে হারিয়ে ফেললাম। দোহাই তোমার, বউ পালিয়েছে বলে যেন থানা-পুলিশ করে কেলেঙ্কারি বাড়িও না।'

চিঠিটা পড়ে অরিন্দমের কেমন অবসন্ন লাগল। বোধহয় এমন হয়। পরাজিত নায়কের মতো শূন্যদৃষ্টিতে সে দূর আকাশের দিকে কতক্ষণ তাকিয়ে রইল। রাত্তিরে যথারীতি খাবার টেবিলে বসল। কিন্তু খেতে ইচ্ছে করল না।

পরদিন অফিসে গিয়ে অরিন্দমের একবার মনে হল টেলিফোন করে শ্বশুরকে খবরটা জানায়। এটা কর্তব্য। হাজার হোক, ইন্দ্রাণী তাঁর মেয়ে। স্বামীর সংসার ছেড়ে সে বেরিয়ে গেছে। ব্যাপারটা তাই চেপে যাওয়া ঠিক হবে না। ঘটনার সঙ্গে অরিন্দম শুধু একাই সংশ্লিষ্ট নয়। ঘটনাটা জানতে পারলে তা মা-বাবাও উদ্বিগ্ন এবং হয়তো দুঃখিত হবেন। তবু রিসিভারটা তুলে অরিন্দম দু-একবার ইতস্তত করল। ইন্দ্রাণীর বাবাকে কী বলবে সে? তার স্ত্রী পরপুরুষের সঙ্গে গৃহত্যাগ করেছে? ছি ছি! এমন একটা কথা উচ্চারণ করতে গিয়ে তার জিভটা আড়ষ্ট হয়ে উঠবে না?

শেষ পর্যন্ত অফিস ছুটির মুখে অরিন্দম টেলিফোন তুলে ডায়াল করল। শ্বশুর একটা কোম্পানির ডিরেক্টর। মাস মাইনের কেরানিবাবুর মতো পাঁচটা না বাজতেই বাড়ির ফেরার জন্য ব্যস্ত হন না। ছুটির সময় আরও পাঁচটা কাজ হাতের কাছে আসে। টেবিল ছেড়ে ওঠার আগে টেলিফোনে দু-একটা প্রয়োজনীয় কথা সারতে হয়।

টেলিফোনে শ্বশুরের গলা শুনে অরিন্দম ভণিতা না করে বলল, 'একটা খবর ছিল।'

'কী খবর, বল?'

'খবর মানে দুঃসংবাদ বলতে পারেন।'

অরিন্দম বিষয়ানুগ হতে চাইল।

'দুঃসংবাদ? কী বলছ?' ভদ্রলেকের কণ্ঠস্বর রীতিমতো উদ্বিগ্ন শোনাল।

'হ্যাঁ', অরিন্দম এক মুহূর্ত থেমে বাকিটুকু জানাল, 'ইন্দ্রাণী কাল দুপুরবেলা বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে।'

'চলে গেছে? তারে মানে? কোথায় গেল? কই চেতলার বাড়িতে তো আসেনি?'

'টেলিফোনে এসব কথা হয় না। আপনি বরং সন্ধেবেলা আসুন। আমি যতটুকু জানি বলব।' অরিন্দম সংক্ষিপ্ত হতে চেষ্টা করল।

'হ্যাঁ, তাই যাচ্ছি। এই ধরো ছটা নাগাদ, তুমি তো বেশ চিন্তায় ফেলে দিলে।' টেলিফোনে উদ্বিগ্ন পিতার কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'আচ্ছা, পুলিশে কি খবর দিয়েছ?'

'না, তার প্রয়োজন নেই।' অরিন্দম আর কিছু না বলেই রিসিভারটা নামিয়ে রাখল।

সন্ধে ছটার একটু পরে শ্বশুর-শাশুড়ি দুজনেই এসে হাজির। অরিন্দম জানত ঘূর্ণিঝড়ের মতো এলোমেলো সব প্রশ্ন এখুনি তাকে বিপর্যস্ত করে তুলবে। তার চেয়ে বরং ইন্দ্রাণীর লেখা শেষ চিঠিখানা এগিয়ে দিলেই ঝামেলা মিটে যায়। তাকে আর ব্যাখ্যা করতে হয় না। তবে শাশুড়ি মেয়ে মানুষ, স্বামীর মুখে খবরটা শুনে ঘটনাটা যে কী তা বুঝে নিতে তাঁর অসুবিধে হয়নি। চিঠির ওপর দ্রুত নজর বুলিয়ে জামাইকে প্রায় বিদ্রূপ করে বললেন, 'আচ্ছা, পুরুষমানুষ তো তুমি, বউ আর একজনের সঙ্গে এই সব কাণ্ড করে বেড়াচ্ছে, অথচ তুমি নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছিলে, কিছু টের পাওনি?'

অরিন্দম চুপ, কোনো জবাব দিল না।

শ্বশুর অবশ্য তার পক্ষ নিয়ে বললেন, 'আহা! ও কেমন করে জানতে পারবে বলো? তোমার মেয়ের পিছনে তো আর গোয়েন্দাগিরি করেনি?'

'তুমি চুপ করবে?' স্বামীকে ধমক দিয়ে শাশুড়ি ফের বললেন, 'পুরুষমানুষকে চারদিকে নজর রাখতে হয়। হীরকের সঙ্গে ওর এক সময় বন্ধুত্ব ছিল, তুমি কি তাও জানতে না? সেই বন্ধুর সঙ্গে ফের মেলামেশা--সবই তোমার নজর এড়িয়ে গেল?'

অরিন্দম অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'নজর এড়াবে কেন? আমি তো সবই জানতাম।'

'জানতে? শাশুড়ি অস্ফুটে শুধোলেন।

'হ্যাঁ। এই তো গত শুক্রবারে টাইগারের সামনে থেকে হীরকবাবুর গাড়িতে উঠে ইন্দ্রাণীতে যেতে দেখলাম।'

'যেতে দেখলে?'

'হ্যাঁ। আমি আড়ালে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছি।'

'তুমি একটি অপদার্থ।' শাশুড়ি এবার গর্জে উঠলেন। বললেন, 'বউকে শাসনে রাখার মতো ক্ষমতা তোমার নেই। তাই সে দিব্যি এতদিন হীরকের সঙ্গে মেলামেশা করে শেষে তার হাত ধরে বেরিয়ে গেছে।'

শ্বশুর বললেন, আশ্চর্য! সব কিছু জেনেও এমন হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারলে? অন্তত আমাদের জানানো উচিত ছিল।'

অপমানটা গায়ে বিঁধলেও অরিন্দম কোনো জবাব দিতে পারল না। তবে হীরক এ বাড়িতে আসার পর ইন্দ্রাণীর হাবেভাবে কথাবার্তায় যে একটা দ্রুত পরিবর্তন শুরু হয়েছিল, অন্তত এই কথাটা সেই শ্বশুর-শাশুড়িকে জানাতে পারত। অবশ্য তাতে কোনো ফল হত কি না সন্দেহ। কারণ ইন্দ্রাণী তো চিঠিতেই স্বীকার করেছে। অরিন্দমকে কেন যে বিয়ে রাজি হয়েছিল, তার কোনো সদুত্তর এখন সে নিজেই খুঁজে পাচ্ছে না।

ইতিমধ্যে কাজের ছেলেটা বুদ্ধি করে চা এনে দিয়েছিল। চা-টুকু খেয়েই শাশুড়ি উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'আর বসে থেকে কী হবে? পোড়ারমুখী তো বাপমায়ের মুখে চুনকালি লেপে দিয়ে গেছে। এখন পাড়াপড়শি আত্মীয়-বন্ধুদের কাছে কৈফিয়ত দাও। ছি-ছি! এমন লজ্জায় পড়তে হবে কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবিনি।'

শ্বশুর বললেন, 'আচ্ছা, পুলিশে একটা খবর দেওয়া উচিত, তাই না?'

'বলিহারি বুদ্ধি তোমার', শাশুড়ি বললেন, 'তাহলেই ষোলোকলা পূর্ণ হয়। বাড়িতে পুলিশ আসুক মেয়ের খোঁজ-খবর নিতে, আর পাড়ায় একটা ঢি-ঢি পড়ে যাক।'

অরিন্দম এবার মুখ খুলল। বলল, 'আমার তো মনে হয়, এই ঘটনা কারো কাছে না জানালেও চলে। তাছাড়া ইন্দ্রাণী তো ছেলেমানুষ নয়। স্বেচ্ছায় ঘর-সংসার ছেড়ে আর একজনের সঙ্গে চলে গেছে। তার ভালোমন্দ বোঝার মতো অভিজ্ঞতা এবং বয়স দুই-ই হয়েছে।'

শাশুড়ি বললেন, 'মেয়েটা বোকা। নইলে এমন সাজানো ঘর-সংসার, এমন স্বামীকে ফেলে কেউ অনিশ্চিতের মধ্যে ভেসে পড়ে?'

'সে কথা আবার বলতে', শ্বশুর সায় দিলেন। শাশুড়ি বললেন, 'ধরো, দুদিন বাদে যদি নেশা কেটে যায়, ভালোবাসা ফিকে হয়ে আসে? তখন মেয়েটার কী গতি হবে ভাবতে পারো?'

খানিক বাদে শ্বশুর-শাশুড়ি রওনা হলেন। অরিন্দম জামাকাপড় ছেড়ে বিছানায় গড়িয়ে পড়ল। গতকাল ইন্দ্রাণী বাড়ি থেকে চলে গেছে শুনে মনটা হঠাৎ সিসের মতো ভারি হয়ে উঠেছিল, সমস্ত কিছু বিস্বাদ লাগছিল। অথচ এখন তার মনে হল সে দায়মুক্ত। ইন্দ্রাণীর মা-বাবাকে জানাবার পর আর কোনো কর্তব্য আছে বলে মনে হলো না। তবু বিছানায় শুয়ে অরিন্দম যেন বুঝতে পারছিল কোথায়

একটা ফাঁক রয়ে গেছে, বিরাট শূন্যতা। নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করেও অরিন্দম সেটা পূর্ণ করতে পারল না।

এ সমস্ত কয়েক মাস আগের কথা। তারপর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। তবু আরও কত ঘটনা মাঝে মাঝে মনে পড়ে যায়...

হঠাৎ অরিন্দমের খেয়াল হলও ঘড়ির কাঁটা তরতর করে এগিয়ে চলেছে। ইতিমধ্যে বিনয় যদি অফিসে এসে তার জন্য বসে থাকে?

তিন

বিনয় এল, তখন সাড়ে চারটে হবে। ডালহৌসি থেকে ম্যাঙ্গো লেন পর্যন্ত সমস্ত পথ হেঁটে এসেছে। গরমে বেচারার গলদঘর্ম অবস্থা। অরিন্দমের সামনে একটা চেয়ারে ধপাস করে বসে পড়ে বলল, 'তবু ভালো, এখানে লোডশেডিং হয়নি। যেখানে গিয়েছিলাম সেখানে তিনটে থেকে কারেন্ট নেই। ফাইলপত্র ফেলে কেরানিবাবুরা সব বারান্দায় হাওয়া খাচ্ছে।'

অরিন্দম মুচকি হেসে শুধোল, 'তোর নিশ্চয় কাজ হয়নি?'

কেমন করে হবে? বিনয় তাকে পালটা প্রশ্ন করল। 'প্রায় ঘণ্টাখানেক আশায় ছিলাম, যদি কারেন্ট আসে। শেষে চারটে বাজতেই অফিস ফাঁকা হতে শুরু করল। ভেবে দেখলাম, আর দাঁড়িয়ে লাভ নেই। বরং তোর এখানে চলে আসি।'

'ভালো করেছিস্', অরিন্দম হাসল। বেল টিপে বেয়ারাকে ডেকে এক পট চা দিতে বলল।

বিনয় সিগারেটের প্যাকেটটা এগিয়ে দিয়ে মুচকি হেসে জিজ্ঞাসা করল, 'কীরে, 'কিছু মনে পড়ছে তোর?'

ইঙ্গিতটা বুঝতে অরিন্দমের দেরি হল না। এই বিনয়ই তাকে স্মোক করতে শিখিয়েছিল। একদিন ক্লাসে ছুটির পর কলেজ-ট্যাংকের ধারে একটা বিরাট বটগাছের নীচে দাঁড়িয়ে বিনয় তার হাতে একটা সিগারেট গুঁজে দিয়ে বলেছিল, 'নে, খেয়ে দ্যাখ। আজ হয়তো ভালো লাগবে না। কিন্তু কিছুদিন পরে দেখবি না খেলে পেটটা গুলিয়ে উঠছে, মাথায় কিছু ঢুকছে না।'

সেদিন সিগারেট ধরিয়ে একটা টান দেবার পর অরিন্দম প্রচণ্ড কাশতে শুরু করেছিল। কাশি থামতে বিনয় তাকে ধমকে উঠল, 'আচ্ছা আনাড়ি যা হোক। বলেছি না প্রথমে একটু একটু টানতে হয়। বোকার মতো অমন লম্বা টান দিতে গেলি কেন?'

অরিন্দম তাকিয়ে দেখল বারো বছর আগের সেই সিগারেট নয়, বিনয় একটা নতুন ব্র্যান্ড ধরেছে। নিজেও এখন সে দামি সিগারেট খায়। ছাত্রজীবনে টাকাপয়সা কম। দুজনে রোনাল্ডসে হস্টেলে পাশাপাশি ঘরে থাকত ঠিক। কিন্তু বিনয়ের বাবা কোলিয়ারির ম্যানেজার,—ছেলেকে যা টাকা পাঠাতেন তাতে হাতখরচে কোনোদিন টান পড়েনি। আর অরিন্দমের বাবার জমিজমা, চন্দ্রকোণা রোডে সাবেকি দোতলা

বাড়িখানা সম্বল। মাসান্তে ছেলেকে যা পাঠাতেন তাতে বিলাসিতা দূরে থাক, শেষ সপ্তাহে তার হাতে কলসীর তলানির মতো সামান্য কিছু পড়ে থাকত।

সিগারেট ধরিয়ে বিনয় এবার ঘরোয়া কথা শুরু করল। বলল, 'তোর খবর কী? বিয়ে-থা করেছিস্ নিশ্চয়?'

'হ্যাঁ, মানে'—অরিন্দম ঢোক গিলে জবাব দিল, 'সে তো অনেকদিন হল, প্রায় তিন বছর।' ইন্দ্রাণী যে তার ঘর-সংসার ত্যাগ করে আর একজনের সঙ্গে চলে গেছে, এই লজ্জার ব্যাপারটা কিছুতেই সে বন্ধুর কাছে বলতে পারল না।

'বাঃ! খুব ভালো কথা। বিনয় পালটা প্রশ্ন করল, 'ছেলেমেয়ে হয়েছে?'

'না', অরিন্দম ম্লান হাসল।

'তুই আছিস্ কোথায়?'

অরিন্দম তার বেলেঘাটার ঠিকানা দিয়ে বলল, 'চলে আয় না একদিন। বাড়িতে বসে জমিয়ে গল্প করা যাবে।'

'এবার হবে না', বিনয় কী যেন চিন্তা করে বলল, 'কালকের দিনটা অবশ্য আছি। কিন্তু বিকেলে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট, মানে একজন আমার জন্য অপেক্ষা করবে।'

'তাহলে তো সেখানে নিশ্চয় যেতে হবে।' অরিন্দম সায় দিল।

বিনয় বলল, 'হ্যাঁ, মানে সেজন্যই এবার কলকাতায় আসা। নইলে শুধু অফিসের কাজে এই ছোটাছুটি আমার পোষায় না।'

ইতিমধ্যে বেয়ারা এসে টী-পট থেকে দুটো কাপে লিকার ঢেলে দুধ আর চিনি মিশিয়ে চা বানিয়ে দিল। পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বিনয় মন্তব্য করল, 'এখানে তো বেশ ভালো চা তৈরি করে।'

অরিন্দম বলল, 'স্পেশ্যাল টী। তাই লিকার, দুধ, চিনি সব আলাদা করে দিয়েছে। তাতে বেশ একটা ফ্লেভার হয়।'

বিনয়কে হঠাৎ কিঞ্চিৎ চঞ্চল দেখাল। চাপা গলায় বলল, 'এখান থেকে একটা টেলিফোন করতে পারি?'

'নিশ্চয়। এটা আবার জিজ্ঞাসা করতে হয়?' অরিন্দম প্রশ্নটা তার দিকে ছুঁড়ে দিল।

রিসিভারটা হাতে নিয়ে বিনয় সংশয়ের সুরে বলল, 'এখন পাব কি না ঠিক নেই। তবে পাঁচটার আগে হয়তো চলে যাবে না।'

'কাকে ফোন করবি?' অরিন্দম চোখ তুলে তাকাল।

বিনয় মুচকি হেসে জবাব দিল, 'যার সঙ্গে কাল বিকেলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছি, তাকে।'

বাচনভঙ্গি অনেক সময় মুখের কথার চেয়েও অনেক বেশি অর্থবহ হয়। টেলিফোনে বিনয় যাকে যোগাযোগ করতে চাইছে তার সঙ্গে সম্পর্কটা কী অরিন্দম

যেন এবার বুঝতে পারল। আড়চোখে অন্যদিকে একবার তাকিয়ে সে বলল, 'আমি বরং অফিসের ভেতর থেকে একটু ঘুরে আসি। তুই টেলিফোনটা সেরে ফেল।'

চট করে দাঁড়িয়ে উঠে ওর কাঁধে একটা হাত রেখে বিনয় বলল, 'পাগল হয়েছিস্? বস্, তোর সামনে ওকে টেলিফোন করতে আমার কোনো অসুবিধে নেই।'

'তাই?' অরিন্দম ভ্রূ কুঁচকে তাকাল। মৃদু হেসে শুধোল, 'নাম কী?'

'মিলি।' বিনয় সিগারেটে একটা ছোট্ট টান দিয়ে জবাব দিল।

'কত দিন আলাপ?'

'বছর দুই।'

'কলকাতার মেয়ে! আর তুই তো পড়ে আছিস্ বোকারোতে। পরিচয় হল্ কোথায়?' অরিন্দম প্রশ্ন করল।

বিনয় হেসে বলল, 'কেন, কলকাতার মেয়ে কি বোকারোতে যেতে পারে না?'

'নিশ্চয় পারে। তাহলে বল্, মিলি মাঝেমাঝে বোকারোতে যায়?'

'আগে যেত। কিন্তু বছরখানেক হল আর যায় না।'

'কেন?'

'তার কারণ, ওর মামা এখন বোকারোতে নেই। আগে ছুটিছাটা হলে মামার বাড়িতে বেড়িয়ে আসত।' বিনয় এক মুহূর্ত থামল। মুচকি হেসে বলল, 'অগত্যা আমাকেই নানা ছলছুতোয় আসতে হয়।'

'আই সি। মামা তাহলে রিটায়ার করে চলে এসেছেন?'

'একজ্যাক্টলি।' বিনয় সিগারেটটা শেষ করে ছাইদানির ভিতর পোড়া অংশটা গুঁজে দিল। বলল, 'মামাবাড়ি আসলে চন্দননগরে। গিরিজাবাবু, মানে ওর মামা এখন রিটায়ার করে ওখানেই আছেন।'

কপাল ভালো। একবার ডায়াল করতেই অপর প্রান্তে টেলিফোনটা বোধহয় বেজে উঠল। বিনয় বলল, 'কাইন্ডলি মিলি সরকারকে লাইনটা দেবেন?'

একটু পরেই মিলির কণ্ঠস্বর ভেসে এল। রিসিভারটা ধরে বিনয় বলল, 'হ্যালো মিলি? আমি বিনয় কথা বলছি। কাল তাহলে ঠিক সাড়ে চারটার সময় এসো, লাইট হাউসের সামনে। ওখান থেকেই ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে পড়ব।' একটু থেমে বিনয় বলল,—'কী হল আবার? ফের সেই ভয়? আচ্ছা, এত নার্ভাস কেন বল তো? ওখানে কে তোমাকে লক্ষ্য করবে? মনে রেখো, এটা মহানগরী। যে যার ধান্দায় ব্যস্ত। পরের ওপর নজরদারি করবার মতো সময় কোথায়? তাছাড়া একটু পরেই তো আমরা সেকেন্ড হাওড়া ব্রিজের কাছে চলে যাচ্ছি। ওখানে তোমার চেনাজানা কারো সঙ্গে দেখা হতে পারে না।'

অপর প্রান্ত থেকে মিলি বোধহয় অন্য কথা জিজ্ঞাসা করল।

একগাল হেসে বিনয় জবাব দিল, 'টেলিফোন করছি আমার এক বন্ধুর অফিস

থেকে। না-না, এখানে আর কেউ নেই। হ্যাঁ, এটা ওর চেম্বার। এই তো, আমার সামনেই বসে আছে।'

টেলিফোনে মিলি বোধহয় ঈষৎ অস্বস্তি প্রকাশ করল।

বিনয় বলল, 'তুমি ফালতু আনইজি ফিল করছ। অরিন্দম আমার ক্লাসফ্রেন্ড। বাঁকুড়া কলেজে দুজনে একসঙ্গে পড়েছি। প্রায় বারো বছর, মানে একযুগ পরে ওর সঙ্গে আজ দেখা, বুঝলে? তোমার কথা এখনও কিছু বলা হয়নি।'

আরও মিনিট দুই-তিন পরে বিনয় লাইনটা ছেড়ে দিল।

অরিন্দম বলল, 'মিছিমিছি এই কাণ্ডটা বাধালি। তোকে আগেই বলেছিলাম অফিসের ভিতর থেকে একটু ঘুরে আসি। ছি-ছি! ভদ্রমহিলা আমাকে কী ভাবলেন বল দিকি?'

'কী আবার ভাববে? আরে ওর এই স্বভাব, আমাব সঙ্গে বেরিয়েও অস্বস্তি। কেউ দেখে ফেলবে এই চিন্তায় অস্থির। আবার শহর থেকে একটু দূরে কোথাও নিয়ে চল, তখন দেখবি এই মেয়েরই বিলকুল অন্য চেহারা।'

'তাই।' অরিন্দম একটু হাসল।

বিনয় বলল, 'তুই জানিস্ না, বোকারো থেকে নিজে গাড়ি ড্রাইভ করে ওকে একবার পুরুলিয়া নিয়ে গিয়েছিলাম।'

'পুরুলিয়া? সে তো ওয়েস্ট বেঙ্গলে?'

'ইয়েস। দ্যাট ইজ ট্রু। তবে মাত্র তিরিশ মাইল বাস্তা। প্রথমে আমার সঙ্গে একা যেতে মিলি খুব আপত্তি করেছিল। কিন্তু কে ওর কথা শুনছে? তারপর গাড়ি যখন শহর ছাড়িয়ে নির্জন মাঠ-প্রান্তর দু'পাশে রেখে ছুটতে লাগল, তখন মিলি কী দারুণ খুশি! অকারণে খুব হাসছিল। শেযে একটা ডুংরি পাহাড়ের কাছে পৌছতে নিজেই গাড়ি থামাতে বলে নেমে পড়ল। তারপর ছোট্ট মেয়ের মতো আনন্দে পাহাড়টার চারপাশে ছুটোছুটি শুরু করে দিল।'

অরিন্দম হঠাৎ বলে ফেলল, 'কথা শুনে তোর গার্ল-ফ্রেন্ডের সঙ্গে তো এক্ষুনি আলাপ করতে ইচ্ছে করছে।'

'বেশ তো। তুই কাল চলে আয়, লাইট হাউসেব সামনে ঠিক সাড়ে চারটের সময়।' এক মুহূর্ত চিন্তা করে বিনয় বলল, 'কিংবা আমিও এখানে আসতে পারি। ধর, সাড়ে তিনটে নাগাদ।'

অরিন্দম সহাস্যে বলল, 'তাই কখনও হয়? তুই ঠাট্টাও বুঝিস্ না। বলা নেই কওয়া নেই, হুট করে অমনি গেলেই হল? আর ভদ্রমহিলাই বা কী মনে করবেন?'

'আহা! এতে মনে করবার কী আছে? আফটার অল উই আর ওল্ড ফ্রেন্ডস। বারো বছর পরে হঠাৎ দেখা, তোর কাছে গোপনীয় তো কিছু নেই।'

তবু অরিন্দম বলল, কিন্তু এভাবে তোর ফিঁয়াসের সামনে যেতে আদৌ ইচ্ছে করছে না। বরং আর একদিন—'

'দূর! তোর দেখি মেয়েমানুষের মতো লজ্জা। আচ্ছা, আমি তো সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। তাছাড়া মিলি তেমন মেয়ে নয়, বরং তোব সঙ্গে আলাপ করলে খুশি হবে।'

অরিন্দম বলল, 'বছর দুই তো প্রেম করছিস্। মাসে একবার নাকি কলকাতায় আসতে হয়। তাহলে ওকে বিয়ে করিস্‌নি কেন?'

প্রশ্নটা বিনয়কে যেন একটু চিন্তায় ফেলল। চোখের তারা দুটি মুহূর্তে ভাবনায় ভারী হয়ে উঠল। আলগা হেসে বিনয় বলল, 'সে অনেক কথা। তাছাড়া মিলির সম্বন্ধে এখনও তো তোকে কিছু বলা হয়নি।'

কৌতূহল বাড়ল। অরিন্দম আরও কিছু শোনার জন্য সাগ্রহে তাকাল।

হঠাৎ বিনয় শুধোল, 'বাড়ি ফেরার তাড়া আছে নাকি তোর?'

'না। কেন বল দিকি?'

'একটু দেরি করে ফিরলে গিন্নি আবার রাগারাগি করবে না তো?'

কী জবাব দেবে অরিন্দম বোধহয় তাই চিন্তা করল। কয়েক মুহূর্ত ভেবে বলল, 'না, সে ভয় নেই।'

'বুঝেছি। গিন্নি এখন বাপের বাড়িতে।' অরিন্দম কোনো কথা না বলে শুধু একটু হাসল।

বিনয় বলল, 'তাহলে চল্ আমার সঙ্গে। হ্যাঁ, বাড়িতে বরং একটা টেলিফোন কর্। আজ রান্নার হাঙ্গামা করে কাজ নেই। রাত্তিরে খেয়ে-দেয়ে ফিরবি।'

অরিন্দম আপত্তি করল না। আসলে সন্ধেবেলাটা বাড়ি ফিরে এখন যেন তার অখণ্ড অবসর মনে হয়। চা-টা খেয়ে কোনোদিন একটা বই নিয়ে বসে। ইচ্ছে করলে টিভি-টা খুলে খানিকটা সময় কাটায়। ইন্দ্রাণী চলে যাবার পর থেকে বাড়িটা কী রকম যেন ফাঁকা লাগে। সংসারের ভার সেই ছোঁড়া চাকরটার ওপর। দায়-দায়িত্ব, ঝক্কি-ঝামেলা সব তাকেই সামলাতে হয়। অরিন্দম আন্দাজে একটা থোক টাকা ধরে দিয়ে নিশ্চিন্তে বসে থাকে। পয়সা ফুরোলে ফের যখন সে হাত পাতে, অরিন্দম তখন আবার সংসারের কথা চিন্তা করে।

অফিস থেকে বেরিয়ে বিনয় একটা ট্যাক্সির জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল।

অরিন্দম হেসে বলল, 'তুই পাগল হয়েছিস্? এখানে খালি ট্যাক্সি পাওয়া যায়? অফিস ছুটির পর ট্যাক্সি তো ডুমুরের ফুল।'

অগত্যা দুজনেই হাঁটতে শুরু করল। ম্যাঙ্গো লেন ধরে খানিকটা হেঁটে সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউতে পড়ে একটা খালি ট্যাক্সি পেল।

অরিন্দম কাছে যেতেই লোকটা জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় যাবেন?'

'পার্ক স্ট্রিট।' বিনয় জবাব দিল।

ট্যাক্সিচালক ঠোঁট উলটিয়ে কেমন একটা নির্লিপ্ত ভঙ্গি করে বলল, তিনটে টাকা এক্সট্রা দেবেন?'

'এক্সট্রা কেন?' অরিন্দম শুধোল।

'বারে! সাটেল টানলে তিনটে টাকা তো নির্ঘাত পকেটে আসত।' লোকটা এমন ভঙ্গি করল যেন এটা তার হকের পাওনা।

বিনয় এগিয়ে এসে গাড়ির দরজা খুলে বলল, 'উঠে পড়্। মিছিমিছি কথা বাড়িয়ে লাভ নেই।'

লোকটা তাদের ম্যাডান স্ট্রিট ধরে ধর্মতলা স্ট্রিট পেরিয়ে লাইট হাউসের কাছে নিয়ে এল। ট্যাক্সির গতি শ্লথ করে জিজ্ঞাসা করল, 'পার্ক স্ট্রিটের কোন জায়গাটায় যাবেন?'

'এই ধরুন মাঝামাঝি।' বিনয় কী ভেবে ফের বলল, 'মানে আমরা একটা ভালো বার অ্যান্ড রেস্তোরাঁতে যেতে চাই।'

লোকটা আর কোনো প্রশ্ন করল না। ফ্রি স্কুল স্ট্রিট ধরে গাড়িটা চালাতে লাগল।

স্কার্ট ফ্রক পরা এক অ্যাংলো ইন্ডিয়ান যুবতী দ্রুত রাস্তা পেরোতে গিয়ে প্রায় চাপা পড়ে যাচ্ছিল। গাড়িটার ব্রেক কষে ট্যাক্সি ড্রাইভার তার উদ্দেশ্যে একটা অশালীন মন্তব্য নিক্ষেপ করে ফের স্টার্ট নিয়ে এগোল।

বিনয় আর অরিন্দম একটা মাঝারি গোছের রেস্তোরাঁর দোতলায় উঠে এল। কোণের দিকে নিরিবিলি টেবিল বেছে নিয়ে দুজনে বসল। প্রায় তখুনি একটা বেয়ারা এসে তাদের সামনে দুটি জলের গ্লাস রেখে গেল।

এক ঢোক জল খেয়ে বিনয় বলল, 'তোর সঙ্গে অনেক কথা আছে।'

মুচকি হেসে অরিন্দম জবাব দিল, 'বুঝতে পেরেছি। মিলির সম্বন্ধে অনেক কিছু বলতে চাস্, তাই না?'

'হ্যাঁ, মানে এই ব্যাপারে তোর সঙ্গে পরামর্শ করতে চাই।'

'পরামর্শ?'

'হুঁ। কী জানিস্, আমি একটা গাড্ডায় পড়েছি।' বিনয় মৃদুস্বরে বলল।

'গাড্ডায়?' অরিন্দম তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল 'প্রবলেমটা কী?'

বিনয় হলঘরটার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে শুরু করল, 'তখন জিজ্ঞাসা করছিলি না, দু'বছর আলাপ-পরিচয়, তবু এখনও কেন ওকে বিয়ে করিনি?'

'হ্যাঁ।' অরিন্দম ছোট্ট উত্তর দিল।

'বিয়ে কেন করিনি বল তো?'

'বারে! সে তো তুই জানিস্।' অরিন্দম ফের হাসল।

ইতিমধ্যে পেন্সিল আর ছোট্ট অর্ডার বই হাতে সাদা পোশাক পরা একজন লোক এসে সামনে দাঁড়াতেই বিনয় যেন মুখে কুলুপ এঁটে দিল।

অরিন্দম সেই লোকটার মুখের দিকে এক পলক তাকিয়ে ফের মেনু কার্ডটার

ওপর চোখ বুলোতে শুরু করল।

বিনয় আড়চোখে তাকিয়ে বলল, 'হুইস্কি। অবশ্য তোর যদি আপত্তি না থাকে।'

'হুইস্কি?' অরিন্দমের ইচ্ছে ছিল বিয়ার খায়। কিন্তু পরে কী যেন চিন্তা করে উত্তর দিল, 'বেশ তাই যখন ইচ্ছে তোর।'

খাবারের অর্ডারটা অরিন্দম মেনু কার্ড দেখে বলে গেল, মিক্সড্ ফ্রায়েড রাইস, চিলি চিকেন, ফিস ফিঙ্গার এবং গ্রেভি গোছের একটা খাবার। বিনয়ের দিকে তাকিয়ে শুধোল, 'আর কিছু নিবি?'

'না, দরকার নেই।' বিনয় প্রসঙ্গটা এখানেই শেষ করে দিতে চাইল।

মিনিট দুই-তিন পরে বয় এসে হুইস্কি সার্ভ করে গেল। মদের গ্লাসটা ঠোঁটের ওপর হেলিয়ে রেখে তারিয়ে তারিয়ে সিপ করছিল বিনয়। ডিশ থেকে দু-চারটে পোটাটো চিপ্‌স্ আঙুলের ডগায় তুলে মুখে ফেলে দিল। গ্লাসটার অর্ধেক খালি করে টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে বিনয় বলল, 'হ্যাঁ, যে কথা তোকে বলছিলাম, মিলিকে কেন এখনও বিয়ে করিনি। আসলে ব্যাপারটা এমন একটা জায়গায় আটকে গেছে যে শেষ পর্যন্ত কী হবে আমি নিজেও ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।'

হুইস্কির গ্লাসটা ঠোঁট থেকে নামিয়ে অরিন্দম জিজ্ঞাসা করল, 'বিয়ে হতে অসুবিধে কীসের? নিশ্চয়ই মিলিকে তোর পছন্দ?'

বিনয় বলল, 'আচ্ছা বোকা তো তুই! জীবনে কোনো মেয়ের সঙ্গে বোধ হয় প্রেম-ট্রেম করিস্‌নি? পছন্দ না হলে ওর পিছনে এমন ঘুরঘুর করি? দাঁড়া, কাল তোর সঙ্গে আলাপ হোক। দেখবি কী অ্যাট্রাক্টিভ চেহারা।'

'তাহলে প্রথম দর্শনেই প্রেম বল?'

'হ্যাঁ, লভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট। তা বলতে পারিস্।'

অরিন্দম জিজ্ঞাসা করল, 'তাহলে সমস্যা কীসের? চটপট দিনক্ষণ দেখে বিয়েটা সেরে ফেল। আর পাত্র হিসেবে তুই তো ফেলনা নস্। তোর হাতে মেয়েকে দিতে ওর মা-বাবার নিশ্চয় আপত্তি হবে না।'

বিনয় একবার মাথার চুলে হাত বুলোল। কৌচে হেলান দিয়ে চিন্তিতভাবে বলল, 'প্রবলেমটা অন্য ধরনের। তোকে সব খুলে বলছি, আসলে বাইরে থেকে দেখে একটা মানুষকে আমরা কতটুকু বুঝতে পারি?'

বিষয়টি যে বেশ ঘোরাল অরিন্দম তা আন্দাজ করল। কিন্তু এখন প্রশ্ন করে লাভ নেই। বিনয় যখন নিজেই মুখ খুলেছে, তখন ধীরে ধীরে সবই জানা যাবে।

তবু অরিন্দম বলল, 'মনে হচ্ছে তুই বেশ চিন্তায় পড়েছিস্?'

হ্যাঁ, কী যে করব তাও ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। তবে ডিসিসন একটা নিতেই হবে। আর দেরি করা চলে না।'

অরিন্দম কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে বলে ফেলল, 'ব্যাপারটা কী?'

তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এক নজর তাকিয়ে বিনয় মুখ খুলল, 'বলছি, তবে এটা কিন্তু আর কেউ জানে না, শুধু মিলির মা-বাবা ছাড়া।'

'তার মানে?'

'হ্যাঁ। তোকেও প্রমিস করতে হবে যা বলব তা তার কারো কাছে ভুলেও গল্প করবি না।'

'সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক্।' অরিন্দম আশ্বাস দিল।

বিনয় বলল, 'শুনলে হয়তো তোরও খারাপ লাগবে। আসলে ওর জীবনের একটা মস্ত ভুল। আর সেই ভুলের মাশুল এখন মিলিকে গুনতে হচ্ছে।'

'ভুলের মাশুল?'

আর ভণিতা করে বোধহয় লাভ নেই। বিনয় বলল, 'কুমারী অবস্থাতেই মিলি মা হয়েছে।'

'তার মানে? মিলির সন্তান আছে?'

'হ্যাঁ, একটি ছেলে।' লাইটার জ্বালিয়ে সিগারেট ধরাল বিনয়। খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে কাহিনিটা সে বলে গেল, বছর পাঁচ-ছয় আগে এই কলকাতাতেই মিলির সঙ্গে একটি ছেলের পরিচয় হয়। দিল্লিতে বাড়ি তার, ব্যাংকের অফিসার। বেশ সুদর্শন চেহারা। প্রথমে আলাপ, তারপর যা হয়। সেই সুবাদে ছেলেটি ওদের বাড়িতে আসত। স্বাভাবিক নিয়মে মিলি তার প্রেমে পড়ে। দুজনের মেলামেশায় কেউ আপত্তি করেনি। শিক্ষিত ছেলে, দেখতে শুনতে ভালো। মোটা মাইনের চাকুরে। তাই মিলির মা-বাবা ভেবেছিলেন ওরই সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবেন।

'তারপর?' অরিন্দম আগ্রহ প্রকাশ করল।

বিনয় বলল, 'দিন কেটে যাচ্ছিল। হঠাৎ একদিন মিলির সন্দেহ হল। সে মা হতে চলেছে। অথচ লজ্জায় কারও কাছে মুখ ফুটে সে কথাটা বলতে পারল না। এমন কি মার কাছেও নয়। কিন্তু আরও কিছুদিন পর ব্যাপারটা আর লুকোন সম্ভব হল না। মেয়ের কাছ থেকে সব শুনে মিলির মা-বাবা দুজনের মুখ ভয়ে শুকিয়ে এল। মুহূর্তে গোটা বাড়ির চেহারা যেন পালটে গেল। কী বিষম চিন্তা! এই দুর্ভাবনার হাত থেকে সম্মানজনক মুক্তির তো একটা মাত্র রাস্তা খোলা আছে। কিন্তু সে পথেও যে কাঁটা পড়েছে মিলির বাবা পরদিন তা খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন। সেই ছেলেটি এখানকার অফিস থেকে বদলি হয়ে দিল্লি চলে গেছে। তবু মেয়ের ও পরিবারের সম্মান বাঁচাতে খোদ রাজধানী পর্যন্ত পিতাকে ছুটতে হলো। কিন্তু গিয়ে যা শুনলেন তার কোনো জবাব নেই। ছেলেটি বিবাহিত, দুই সন্তানের পিতা।'

অরিন্দম বলল, 'শেষ পর্যন্ত আর একটা উপায় তো ছিল। তাতে অন্তত এই কলঙ্কের হাত থেকে মিলি বাঁচত।'

'তুই কী বলতে চাস্ আমি বুঝতে পারছি।' বিনয় জবাব দিল। 'কিন্তু জানাশুনো ডাক্তার না থাকলে এ সব কাজ চট করে হয় না। তাছাড়া তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল।'

অরিন্দম চুপ করে রইল। কোনো কথা বলল না।

কাহিনির বাকি অংশটুকু বিনয় তারপর শেষ করল।...

'লোকলজ্জা এড়াতে মিলিকে সঙ্গে নিয়ে ওর বাবা গেলেন বিন্ধ্যাচলে, তাঁর গুরুর আশ্রমে। সমস্ত কথা শুনে গুরুজী মিলিকে আশ্রয় দেন। কিছুদিন পর ভদ্রলোক কলকাতায় ফিরে এলেন। মিলি সেই আশ্রমে গুরুজীর তত্ত্বাবধানে ছিল। সেখানেই তার একটি ছেলে হয়।'

'ছেলে হবার পর মিলি কলকাতায় ফিরে আসে?' অরিন্দম প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ। সন্তান হওয়ার ছ-মাস পরে ওর বাবা গিয়ে মিলিকে নিয়ে আসেন।'

'তারপর?'

বিনয় একটা টোকা দিয়ে অর্ধদগ্ধ সিগারেটের ছাইটুকু ঝেড়ে ফেলে বলল, 'কলকাতায় এসে মিলি এই চাকরিটা জোগাড় করে। আজ বছর পাঁচ হল এখানেই আছে।'

'কিন্তু মিলিব সেই ছেলে, সে কোথায় রইল? গুরুজীর আশ্রমে?'

'না-না। মাত্র ছ-মাসের ছেলেকে গুরুজী কেমন করে রাখবেন? বরং মিলির সঙ্গে পরামর্শ করেই তিনি ওকে একটা শিশু-আশ্রমে রাখার ব্যবস্থা করলেন।'

'শিশু-আশ্রম মানে অনাথ ছেলেমেয়েদের যেখানে মানুষ করা হয়।'

'অনেকটা তাই। তবে কিন্তু খরচপত্র দিলে এরা খানিকটা বিশেষ ব্যবস্থা নেয়। মিলি প্রতি মাসে টাকা পাঠায় গুরুজীর নামে। তিনি আবার সেই শিশু-আশ্রমের ঠিকানায় প্রয়োজনীয় খরচ পাঠিয়ে দেন।'

'মিলি নিশ্চয় ছেলেকে দেখতে সেখানে যায়?'

'হ্যাঁ, তবে বছরে মাত্র একবার।' বিনয় একটু চিন্তা করে বলল, 'আসলে মিলির ওখানে যাওয়া গুরুজী ঠিক পছন্দ করেন না। অথচ বুঝতেই পারিস্, ছেলেকে না দেখে মায়ের মন কি প্রবোধ মানে?'

বিনয়কে গম্ভীর দেখাচ্ছিল। সমস্যাটা তাকে যে রীতিমতো চিন্তিত করে তুলেছে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে অরিন্দম তা বুঝতে পারল। সে বলল, 'মিলি যে কুমারী অবস্থায় মা হয়েছিল, এটা তুই কখন জানতে পারলি?'

'অনেকদিন পর। আসলে এই ঘটনা তো ওর আত্মীয়-বন্ধু কেউ জানে না। মিলির কাছ থেকে শুনেছি বোকারোতে ওর মামা গিরিজাবাবু পর্যন্ত এর বিন্দুবিসর্গ টের পাননি।'

'তাহলে মিলি নিজেই তোকে এই কথা বলেছে?'

'হ্যাঁ। কয়েক মাস আগে কলকাতায় এসে ওকে বিয়ের প্রস্তাব করি। সেবার

মিলির কাছ থেকে কোনো সাড়া পাইনি। পরের বার এসে ফের সেই প্রসঙ্গ তুলতেই মিলি তার জীবনের এই দুর্ঘটনার কথা পরিষ্কার জানাল।

'শুনে নিশ্চয় তোর মন খারাপ হয়ে গেল?'

'না', গলায় ঈষৎ তরল পানীয় ঢেলে বিনয় ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল,—'বরং ওর এই সৎ মনোভাবের পরিচয় পেয়ে ওকে আরও বেশি ভালো লাগল।'

অরিন্দম বলল,—'তুই যদি ব্যাপারটা মেনে নিতে পারিস্ তাহলে বিয়েতে সমস্যা কীসের?'

'সমস্যা আছে।' বিনয় ঈষৎ গম্ভীর হয়ে গেল। বলল,—'এই নিয়ে আলোচনা করব তাই টেলিফেনে যোগাযোগ করেছি। তবে মিলির সঙ্গে কোথাও দেখা-সাক্ষাৎ করার একটা মস্ত অসুবিধে আছে।'

'অসুবিধে কীসের?'

বিনয় ঈষৎ চিন্তা করে বলল,—'প্রথমে ব্যাপারটা আমার কাছেও অদ্ভুত মনে হত। পরে বুঝলাম ভয়টা ওর নিজেরই সৃষ্টি। ধরো, জানাশুনো কেউ যদি মিলির সঙ্গে আমাকে দেখতে পায়? তাহলে কথাটা নিশ্চয় ওর মা-বাবার কানে পৌঁছবে। তাঁরা ভাববেন একবার ভুল করে নিজের চরম সর্বনাশ ডেকে এনেও মেয়েটার শিক্ষা হয়নি। ফের আর একজনের সঙ্গে লুকিয়ে ফস্টিনস্টি শুরু করেছে।'

'তাহলে উপায় কী?' অরিন্দম মুচকি হাসল।

বিনয় জবাব দিল,—'মিলি প্রায় বলে বাইরে কোথাও নিয়ে গেলে ও নাকি ইজি ফিল করবে। কিন্তু আমি থাকি বোকারোতে। কলকাতায় তো-রাত্তির বাস করি না। এর মধ্যে বাইরে মানে চেনাজানার আড়ালে ওকে কোথায় নিয়ে যেতে পারি বল?'

বিনয় তার কথার খেই হারিয়ে ফেলছে দেখে অরিন্দম তাড়াতাড়ি বলল 'তোর সমস্যা তো তাহলে তেমন গুরুতর নয়। ছেলেটা সেই শিশু-আশ্রমে মানুষ হচ্ছে। ব্যাপারটা কেউ জানে না, সুতরাং যা ঘটে গেছে তা এখন বেমালুম চেপে যাবি।'

বিনয় হাত বাড়িয়ে কাঁধটা স্পর্শ করে বলল 'উহুঁ! তুই যত সহজ ভাবছিস্, আসলে ওটা তার চেয়ে অনেক বেশি কঠিন।'

'কঠিন কেন?'

বিনয় ম্লান হেসে বলল, 'তার কারণ মিলির দুটো শর্ত আছে।'

'কী শর্ত?'

'প্রথম শর্ত হল, বিয়ের আগে তার এই ছেলের কথা আমার বাড়ির সকলকে জানাতে হবে।'

'আর দ্বিতীয় শর্ত?'

বিনয় মৃদু হেসে বলল, 'দ্বিতীয় শর্ত বিয়ের পরে মিলি তার ছেলেকে এনে নিজের কাছে রাখবে।'

অরিন্দম একটু চিন্তা করে বলল, 'কঠিন শর্ত।'

'কঠিন মানে সাংঘাতিক বল্। বিনয় একটা অসহায় ভঙ্গি করল, 'এখন বাড়িতে এই কথা বললে রি-অ্যাকশনটা কী হবে চিন্তা কর।'

অরিন্দম বলল, 'এই নিয়ে মিলির সঙ্গে একটা আলোচনা করলে পারতিস?'

'কী আলোচনা করব বল? মা যদি তার সন্তানকে কাছে পেতে চায়, তাহলে সেটা অন্যায় বলতে পারি না। তবু মিলির কাছে প্রস্তাব করেছিলাম ছেলে যদি ওই শিশু-আশ্রমে কিংবা অন্য কোনো ভালো জায়গায় মানুষ হয়, তাহলে কী আপত্তি? মানে তার জন্য যা টাকা লাগে তা আমি দিতে রাজি আছি।'

'শুনে মিলি কী বলল?'

'ওর একটাই কথা। ছেলেটাকে আশ্রমে ফেলে রেখে আত্মসুখের জন্য ঘরসংসার সাজিয়ে সে একটা দিনও শান্তি পাবে না। তার চেয়ে বাকি জীবনটা একলাই কাটিয়ে দেবে। তাতে বরং বিবেকের কাছে কোনোদিন জবাবদিহি করতে হবে না। অন্তত নিজের মনকে বলতে পারবে একটা ছোট্ট ভুলের মাশুল জীবনভোরই সে দিয়ে গেছে।

অরিন্দম শুধোল, 'তাহলে শেষ পর্যন্ত কী করবি? মিলির শর্ত দুটো মেনে নিবি?'

'ওকে বিয়ে করতে হলে শর্ত দুটো স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু এখনও মনস্থির করতে পারিনি। তবে মিলিকে কথা দিয়েছি আর বড়জোর একমাস, তার মধ্যে একটা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছাতেই হবে।'

পাত্র নিঃশেষ হতেই বেয়ারা এসে টেবিলে খাবার সাজিয়ে দিল।

ডিশ থেকে একটা ফিশ ফিঙ্গার তুলে নিয়ে কামড় দিল বিনয়। বলল, 'কাল তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। লাইট হাউসের সামনে ঠিক সাড়ে চারটের সময় চলে আয়, বুঝলি?'

মিছিমিছি কেন আবার? তাছাড়া হুট করে অমনি গেলে মিলি কী ভাববে বল্ দিকি?'

'বলেছি তো, ও কিছু মনে করবে না। আরে, তেমন মেয়েই নয়।' বন্ধুর মুখের ওপর দ্রুত নজর বুলিয়ে বিনয় কী মনে করে বলল, 'আচ্ছা, বল তো, যে মেয়ের সম্বন্ধে এত কথা শুনলি, তাকে একবার চোখে দেখতে তোর ইচ্ছে করছে না?'

অরিন্দম মৃদু হেসে তাকাল। কথার প্যাঁচে সে প্রায় ধরা পড়ে গেছে। সত্যি বলতে কী, বিনয়ের কথা শুনে মিলিকে তার একবার চাক্ষুষ দেখতে ভারি ইচ্ছা হয়েছিল। তারপর এই নাটকীয় জীবনকাহিনি শোনার পর, সেই ইচ্ছাটা প্রায় অদম্য কৌতূহলে পরিণত হয়েছে।

বিনয় বলল, 'আচ্ছা, মিলিকে নিয়ে কলকাতার বাইরে কোথায় যাওয়া যায় বল তো? সে রকম একটা ব্যবস্থা করতে পারিস্?'

'তা চেষ্টা করে দেখব। তবে কলকাতা থেকে কতদূরে যেতে চাস, সেটা জানা

দরকার।'

বিনয় এক মুহূর্ত চিন্তা করে বলল, 'এই ধর্, সকাল নটা নাগাদ বেরিয়ে পড়লাম। আবার সন্ধে ছটা-সাড়ে ছটার মধ্যে ফিরে আসব। তবে জায়গাটা একটু নিরিবিলি হলে ভালো। মানে চেনাজানা কারো সঙ্গে দেখা হয়, মিলি তা আদৌ চায় না।'

অরিন্দম একটু ভেবে বলল, 'ব্যবস্থা হয়তো একটা হয়ে যাবে। আমাদের ক্লায়েন্টদের মধ্যে অনেকের বিউটিফুল গেস্টহাউস আছে।'

'গেস্টহাউস? কলকাতার কাছেপিঠে?' বিনয় ঠোঁট উলটে একটা অপছন্দের ভঙ্গি করল। বলল, 'শেষে ওর কোনো আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা হলে একটা কেলেঙ্কারি হবে।'

অরিন্দম হেসে জবাব দিল, 'ভয় পাচ্ছিস্ কেন? এমন জায়গায় ব্যবস্থা করব যে তোর এই গোপন-বিহারের কথা আত্মীয়স্বজন কেন, কাকপক্ষীতেও টের পাবে না। তবে—'

'তবে আবার কী?'

'ধর্ যদি আমাকে সঙ্গে যেতে হয়—'

'তুই যাবি?' বিনয় ভ্রূ কুঁচকে ঈষৎ চিন্তা করে বলল, 'তাতে আপত্তি নেই, যখন সবই জানলি।'

অরিন্দম বলল, 'ব্যাপারটা আর কিছু নয়। মানে ক্লায়েন্টকে তো একটা কিছু বোঝাতে হবে। ধর্, যদি বলি ফ্যামিলি নিয়ে আমি একটু বেড়াতে যাব, দু-একজন বন্ধুবান্ধব সঙ্গে থাকতে পারে, তাহলে প্রপোজালটা বেশ সহজ হয়। তবে আমি চেষ্টা করব যাতে তোরা দুজনেই শুধু যাস্।'

'যা ভালো হয় কর্। তবে ওই যা বললাম, জায়গাটা যেন একটু নিরিবিলি হয়। মানে চেনাজানা কারও সঙ্গে দেখা হলে মিলি ভীষণ আনইজি ফিল করবে।'

খাওয়ার শেষে বিল মিটিয়ে দুজনে যখন পথে নামল তখন প্রায় আটটা। আশ্বিনের শুরু। মাথার ওপর শরতের আকাশ নির্মেঘ, নীল। জ্বলজ্বলে দু-একটা তারা চোখে পড়ছে। কিছুক্ষণ আগে বোধহয় এক টুকরো জলভরা মেঘ পরিব্রাজকের মতো এই পথে যাচ্ছিল। জায়গাটা পছন্দ হতে তার ঝাঁপি থেকে জল ছিটিয়ে পথঘাট ভিজিয়ে দিয়ে গেছে। তাই বাতাসটা বেশ ঠান্ডা, হাঁটতে আরাম লাগছিল। এরই মধ্যে মহানগরীর জীবনে যেন একটা পরিশ্রমজনিত ক্লান্তির ভাব এসেছে। দোকানপাট অনেক বন্ধ, দু-একটা আধখোলা ছিল, তারাও দরজা টেনে দিচ্ছে। শুধু বার অ্যান্ড রেস্তোরাঁতে ভিড়, ভিতরে আলোর ঝলমলানি।

বিনয় বলল, 'আমি যাব সাউথে।'

'কাল তাহলে সাড়ে চারটের সময় ফের দেখা হচ্ছে, ও কে, গুড নাইট।'

'বেশ।' অরিন্দম মৃদু হাসল।

'দেরি করিস্ না যেন'। বিনয় একটা অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করে বলল, 'শুনলি তো কী রকম মেয়ে। কোথাও দু-দণ্ড দাঁড়ালেই ভীষণ ছটফট করে। আচ্ছা, চলি—'

বাড়ি ফিরে অরিন্দম বিছানায় গড়িয়ে পড়ল। শুয়ে শুয়ে সমস্ত দিনের ঘটনাগুলো আর একবার নিজের মনে নাড়াচাড়া করে দেখছিল। বিনয় আর মিলির ব্যাপারটা ভাবতে ভাবতে তার আবার ইন্দ্রাণীর কথা মনে পড়ল। সেই যে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল ইন্দ্রাণী, তারপর কোনো খোঁজখবর সে রাখেনি। প্রয়োজনও ছিল না। সে যখন স্বেচ্ছায় আর একজনের সঙ্গে বেরিয়ে গেল, তখন স্বামী হিসেবে সে আর কী করতে পারত? বড়জোর থানা-পুলিশ, আইন-আদালত। হীরকের বিরুদ্ধে ব্যভিচার এবং তার স্ত্রীকে ফুসলিয়ে ঘর থেকে বের করে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ। কিছুদিন খবরের কাগজের পাতায় একটা রসালো খবর স্থান পেত। কিন্তু অরিন্দমের তাতে কী লাভ? তার চেয়ে যেটুকু করা উচিত ছিল তা সে করেছে। ইন্দ্রাণীর মা-বাবাকে সমস্ত ঘটনা জানাতে সে আদৌ বিলম্ব করেনি। তারপর নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে।

তবু ইন্দ্রাণীর ফিরে আসার কথা একদিন সে জানতে পারল। মানে ব্যাপারটা তাকে জানানো হয়েছিল। তাও প্রয়োজনে, অরিন্দম পরে সেটা বুঝল। একদিন অফিসে বসে কাজ করছে। হঠাৎ টেলিফোন সশব্দে বেজে উঠল। রিসিভার তুলতেই পরিচিত কণ্ঠস্বরে কেউ জিজ্ঞাসা করলেন, 'অরিন্দম কথা বলছ?'

'হ্যাঁ, বলুন।' রিসিভার ধরে সে জবাব দিল।

'বুঝতে পারছ আমি, মানে ইন্দ্রাণীর বাবা।'

চেনা গলা। তবু প্রথমটা একটু সন্দেহ হয়েছিল।

টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে শ্বশুরের গলা ভেসে এল, 'তোমার সঙ্গে একটু প্রয়োজন ছিল বাবা।'

'বেশ তো, বলুন।' অরিন্দম উত্তর দিল।

'না, মানে টেলিফোনে সব কথা ঠিক বলা যাবে না।'

'তাহলে?'

'তুমি কি একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে পারবে?'

'কোথায়?'

'আমার অফিসে, এই ধরো সাড়ে পাঁচটার পর। তোমার অসুবিধে হবে?'

অরিন্দম বুঝতে পারল তার সঙ্গে ভদ্রলোকের একটা জরুরি আলোচনার প্রয়োজন আছে। এবং সেটা কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হতে পারে। গোপনীয় তো নিশ্চয়। যদিও তার শ্বশুরের আলাদা চেম্বার, তবু কাজের সময় অফিসে বসে এই ধরনের কথাবার্তায় হয়তো কোনো অসুবিধে হতে পারে ভেবেই ছুটির পর সাড়ে পাঁচটার

সময় তাকে যেতে বলা হয়েছে।

এক মুহূর্ত চিন্তা করে অরিন্দম জবাব দিল, 'না, অসুবিধে কীসের? আর আপনার অফিস তো কাছেই।'

'এসো বাবা। আমি অপেক্ষা করে থাকব।' ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বরে সনির্বন্ধ অনুরোধ।

লাইনটা ছেড়ে দিয়ে অরিন্দম অনেকক্ষণ চিন্তা করল। ব্যাপারটা কী হতে পারে? প্রায় দু-মাস বাদে ইন্দ্রাণীর বাবা হঠাৎ তাকে ডেকে পাঠালেন কেন? অবশ্য আগেও সে বহুবার শ্বশুরের টেলিফোন পেয়েছে। কিন্তু সেই সম্পর্ক এখন আর নেই। তাহলে অরিন্দমের সঙ্গে কী এমন কথা থাকতে পারে? তবে কি ইন্দ্রাণী ফিরে এসেছে? এবং সেই কারণেই তাকে প্রয়োজন? আশ্চর্য! ভদ্রলোক কেমন করে ভাবতে পারলেন যে এত কাণ্ডের পর অরিন্দম তাঁর মেয়েকে ফের স্ত্রীর মর্যাদায় ঘরে ফিরিয়ে নেবে!

চার

সাড়ে পাঁচটায় অফিস ফাঁকা।

তখনও একটা লিফট চালু ছিল। কিন্তু অরিন্দম আর লিফটের খাঁচায় ঢুকল না। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে অফিসে পা দিল। তার শ্বশুরের ঘরটা শেষ প্রান্তে। নিস্তব্ধ হলঘরে জুতোর শব্দ শুনে একজন আধাবয়সি কর্মচারী মুখ তুলে দেখল। অরিন্দম শ্বশুরের চেম্বারের সামনে এসে দাঁড়াল। দরজার সামনে একজন বেয়ারা বসেছিল। তার আসার কথা বোধহয় সে জানত। চোখাচোখি হতেই লোকটা তাকে ভেতরে যেতে ইঙ্গিত করল। অরিন্দম দরজার হাতল ঘুরিয়ে প্রায় নিঃশব্দে চেম্বারে ঢুকে গেল।

তাকে দেখে শশুর সহাস্যে অভ্যর্থনা করলেন, 'আরে এসো, এসো। ইউ আর রিয়েলি পাংচুয়াল।'

সম্পর্কের গ্রন্থিটা আগেই ছিঁড়ে গেছে। অরিন্দম তাই সংক্ষিপ্ত হতে চাইল। বলল, 'আমাকে ডেকেছেন?'

'হ্যাঁ, মানে তোমার সঙ্গে কিছু কথা ছিল, বুঝলে?' বৈষয়িক মানুষের মতো শ্বশুরের চোখ দুটি ঈষৎ তীক্ষ্ণ দেখাল। সে ভাবটা কাটিয়ে নিয়ে ভদ্রলোক আবার হাস্যময় হয়ে উঠলেন, বললেন, 'বোসো না। একটু কফি-টফি খাও। তারপর কথা হবে।'

দু-তিন মিনিট বাদেই কফির সঙ্গে ডিশে কেক আর বিস্কুট এল। অরিন্দম কোনো আপত্তি না করে সেগুলি খেতে শুরু করল। আসলে তাকে কী প্রয়োজনে তলব, সেটা জানবার জন্য সে রীতিমতো ব্যগ্র হয়ে উঠেছে। অফিস থেকে বেরোবার আগে হঠাৎ তার বিয়েতে পাওয়া গয়নাগাঁটিগুলোর কথা মনে পড়ছিল, তবে কি সেগুলি ফেরত পাওয়ার জন্য তাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে? কিন্তু সোনাদানা বাড়িতে প্রায় কিছুই থাকত না। সবই ব্যাংকের লকারে। সেটাও স্বামী-স্ত্রী দুজনের নামে। ইন্দ্রাণী নিজেই ব্যাংকে যেত, প্রয়োজন মতো গয়না তুলে আনত। আবার একদিন রেখে আসত। লকারের চাবিটাও তার কাছেই থাকত। স্ত্রী বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার পর আলমারি এবং সম্ভাব্য আরো দু-একটা জায়গায় সে চাবিটার খোঁজ করেছিল। কিন্তু পায়নি। তাই অরিন্দম ধরে নিয়েছিল, ঘর-সংসার ফেলে চলে যাওয়ার মুহূর্তেও লকারের চাবিটা সঙ্গে নিতে ইন্দ্রাণী ভুল করেনি।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে শ্বশুর ধীরে ধীরে বললেন, 'একটা কথা তোমাকে অবশ্য জানানো হয়নি। মানে তখন মনে হল ওটা জানিয়ে আর কী লাভ হবে?'

শুরুটা হেঁয়ালির মতো, অরিন্দম তাই সোজা হয়ে বসল।

শ্বশুর বললেন, 'ইন্দ্রাণী চলে যাওয়ার দিন সাত-আট পরে একটা চিঠি পেলাম। পুনা থেকে লিখেছিল। বোম্বে ঘুরে হীরকের সঙ্গে সেখানেই গিয়েছে। চিঠিতে যা লেখা ছিল, তুমি বুঝতেই পারছ, কৈফিয়ত। এতদিন বাদে কেন এমন কাণ্ড করল? তার কারণ লিখেছে, তোমার সঙ্গে বিয়েতে ও নাকি সুখী হয়নি। তোমাকে ভালোবাসতেও পারেনি। প্রায় তিনটে বছর কেমন করে একসঙ্গে কাটাল, তাই নাকি বুঝে উঠতে পারছে না।'

অরিন্দমের জিভের ডগায় একটা শক্ত কথা এসে গিয়েছিল। কিন্তু নিজেকে সংযত করে সে বলল, 'এসব আলোচনা থাক।'

শ্বশুর বললেন, 'তুমি বিশ্বাস করো, মেয়ের এই অন্যায় আচরণ আমরা স্বামী-স্ত্রী কেউ সমর্থন করি না। তবে কি জান? যতই হোক, আমরা ওর মা-বাবা। তাই মেয়েটা কোথায় গেল তা জানবার জন্য দুজনে খুব ব্যস্ত হয়েছিলাম। আর কয়েকটা দিন খবর না পেলে নিশ্চয় পুলিশের কাছে না গিয়ে থাকতে পারতাম না।'

অরিন্দম বলল, 'আপনি ঠিকই করেছেন। ওর চিঠির খবর আমাকে জানাবার কোনো প্রয়োজন ছিল না।'

শ্বশুর বললে, 'তোমার মনের অবস্থা বুঝতে পারি বাবা। যে স্ত্রী প্রায় বিশ্বাসঘাতকতা করে অন্য এক পুরুষের হাত ধরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে, তার জন্য মায়ামমতা কোনো স্বামীর হৃদয়ে থাকতে পারে না। তার কথা মন থেকে মুছে ফেলতে পারলেই বরং ভালো। তাই সেই স্ত্রীর সঙ্গে যত শীঘ্র ছাড়াছাড়ি হয়, সেটাই বোধহয় মঙ্গল।'

অরিন্দম ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারছিল না। শ্বশুরকে একজন ঝানু অঙ্কের মাস্টারমশায়ের মতো লাগছিল। যেন একটা কঠিন প্রবলেমের ভিতর ভদ্রলোক তাকে সহজ পথে নিয়ে যেতে চেষ্টা করছেন। অথচ সেই রাস্তাটার হদিস না পেয়ে সে নির্বোধের মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে।

কয়েক সেকেন্ড পরে সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কী বলতে চাইছেন?'

'তুমি বুদ্ধিমান, নিশ্চয় তা বুঝতে পারো। শ্বশুর যেন প্রশ্নটা তার দিকে ছুঁড়ে দিলেন। পরে ঈষৎ গম্ভীর গলায় বললেন—তোমাদের দুজনের ডিভোর্সের কথা ভাবছি।' শ্বশুরকে এবার বেশ সিরিয়াস মনে হল।

'ডিভোর্স?' অরিন্দম মুচকি হেসে বলল, 'সে তো হয়ে গেছে।'

'না।' শ্বশুর পরিষ্কার জবাব দিলেন। বললেন, 'অন্য একজন পুরুষের সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেই ডিভোর্স হয় না। তাকে ব্যভিচার, আই মিন অ্যাডালটারি বলতে পার। আইনের চোখে তোমরা এখনও স্বামী-স্ত্রী। অ্যান্ড ইন্দ্রাণী ইজ ইয়োর

লিগ্যাল ওয়াইফ।'

'ওয়াইফ?' অরিন্দম যেন একটা বক্রোক্তি করল, 'আপনার মেয়ের সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ কিন্তু সেদিনই হয়ে গেছে। আর আইনে কী আছে, তাই নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই।'

'ছেলেমানুষি কোরো না।' শ্বশুর তাকে একটা সস্নেহ ধমক দিয়ে বললেন, আইনের এই সম্পর্কটা বাঁচিয়ে রেখেও তো লাভ নেই। ইচ্ছে করলেই তোমরা তা মুছে দিতে পার। ফ্র্যাংকলি স্পিকিং, সেজন্যই তোমাকে আজ এখানে ডেকে পাঠিয়েছি।'

এতক্ষণে ব্যাপারটা অরিন্দমের কাছে কিঞ্চিৎ পরিষ্কার হল। মেয়ের সঙ্গে তার ডিভোর্স আইনগ্রাহ্য হয়নি বলেই ভদ্রলোক বোধহয় চিন্তিত। এখন সেটা যাতে দ্রুত সম্পন্ন হয়, সম্ভবত সেজন্যই জামাইকে ডেকে পাঠানোর প্রয়োজন হয়েছে।

শ্বশুর হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। চিন্তিত স্বরে বললেন, 'তোমাকে কিছু গোপন করতে চাই না অরিন্দম। খোলাখুলি সমস্ত ব্যাপারটা আলোচনা করব বলেই এখানে আসতে বলেছি। হ্যাঁ, আগে একটা কথা জানিয়ে রাখা ভালো। দিন কুড়ি হল ইন্দ্রাণী ফিরে এসেছে, এখন আমার কাছে তেতলার বাড়িতে আছে।'

অরিন্দম শুনল, কিন্তু কোনো মন্তব্য করল না।

খোলা জানালার ফাঁকে দিনের আলো এখনও চোখে পড়ে। শ্বশুর বাইরে আকাশের দিকে নির্নিষ্ট মনে তাকিয়েছিলেন। শ্রাবণ মাস। দীর্ঘ দিনমান। সন্ধ্যা হতে দেরি আছে। তার দিকে পিছন ফিরে শ্বশুর কথা বলছিলেন, 'জানো বাবা, একদিন অনেক আশা নিয়ে তোমার হাতে মেয়েকে সম্প্রদান করেছিলাম। ভাবতাম জীবনে সুখী হবে, ঘর-সংসার করবে। কিন্তু কোথা দিয়ে কী যে হয়ে গেল। এখন ডিভোর্স মঞ্জুর হলে শুধু তোমরা নও, আমরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই যেন বাঁচি।'

অরিন্দম হঠাৎ প্রশ্ন করল, 'আমাকে কী করতে হবে?'

শ্বশুর বললেন, 'তোমার কাছে কিছু গোপন করব না, সেকথা আগেই স্বীকার করে রেখেছি। হ্যাঁ, হীরক আর ইন্দ্রাণী বিয়ের পর স্টেটসে চলে যাবে বলে ঠিক করেছে।'

'স্টেটসে? সে তো খুব ভালো কথা?' অরিন্দম হেসে ব্যাপারটা লঘু করতে চাইল।

শ্বশুর মুখ নিচু করে বললেন,—'তোমার কাছে অপরাধের শেষ নেই বাবা।'

'আপনার অপরাধ কীসের?' অরিন্দম ভ্রূ কুঞ্চিত করল।

ভদ্রলোক কৈফিয়ত দেবার ভঙ্গিতে জানালেন,—'অপরাধ আছে বৈকি। এই যেমন ধরো হীরকের সঙ্গে ওর একটা অ্যাফেয়ার হয়েছিল সেটা তোমার কাছে চেপে গিয়েছিলাম।'

'ওটা কোনো দোষের নয়।' অরিন্দম উদারতা প্রকাশ করে বলল,—'কারণ, বিয়ের সময় তো হীরকবাবু এদেশে ছিলেন না। আর এসব কথা জানালে ইন্দ্রাণীর বিয়ে দেওয়া শক্ত হত।'

শ্বশুর বললেন,—'আসলে কী জান? ইচ্ছে করলে ইন্দ্রাণীর অমন একটা বিয়ে আমরা দিতে পাবতাম। কিন্তু একমাত্র মেয়ে চোখের আড়ালে বিদেশ-বিভুঁয়ে পড়ে থাকবে, আমরা স্বামী-স্ত্রী কেউ তা চাইনি। তাছাড়া তোমাকে দেখে খুব পছন্দ হয়েছিল অরিন্দম। অনেককাল বিজনেস নিয়ে আছি। মানুষ চিনতে সাধারণত ভুল হয় না।'

কফির কাপে চুমুক দিয়ে শ্বশুর ফের শুরু করলেন,—'বাইরের চাকচিক্যটা দেখে মেয়েরা সব ভুলে যায়। ইন্দ্রাণীর তাই হয়েছে। আমেরিকার নানা রকম গল্প শুনিয়ে হীরক ওর মনে একটা মোহের সৃষ্টি করেছে। ন্যু-ইয়র্ক থেকে মাইল চল্লিশ দূরে গ্র্যানাইট স্প্রিংসে ও থাকে। জায়গাটা নাকি সুন্দর। হীরক একটা বাড়ি কিনেছে, দুটো গাড়ি। স্টেটসে ইন্দ্রাণীর কাজ পেতে অসুবিধে হবে না। দুজনে সারাদিন কাজকর্ম করে সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরবে।'

বাপের মুখে মেয়ের ভবিষ্যত জীবনের সাত কাহন বৃত্তান্ত শুনতে অরিন্দমের ভালো লাগছিল না। তাছাড়া ইন্দ্রাণীর কোনো বিষয়েই তার এখন আগ্রহ না থাকার কথা। ব্যাপারটা সংক্ষিপ্ত করবার জন্য সে তাড়াতাড়ি বলল,—'আপনার মেয়ে এই ধরনের লাইফ চায়। মনে হয় এবার সে সুখী হতে পারবে।'

শ্বশুর বললেন,—'সবই অদৃষ্ট, বুঝলে বাবা? শেষ পর্যন্ত সেই বিদেশে ও চলে যাবে। আর ভেবে দেখলাম যা হবার তা হয়ে গেছে। ফ্যামিলির মান-সম্মান তো খুইয়ে বসে আছি। এখন কেলেঙ্কারি এড়াতে এর চেয়ে ভালো উপায় আর নেই। রেজেস্ট্রি করে বিয়েটা সেরে যদি দুজনে গিয়ে বিদেশে ঘর বাঁধে, তাহলে অন্তত দুবেলা পাঁচটা লোককে কৈফিয়ত দেবার দায় থেকে রেহাই পাব। কিন্তু মুশকিল হল আইনের চোখে ইন্দ্রাণী এখনও তোমার স্ত্রী। যতদিন না আদালত থেকে ডিভোর্সের মামলা নিষ্পত্তি হচ্ছে, ততদিন হীরকের সঙ্গে তো ওর বিয়ে হতে পারে না।'

নিমেষে সমস্ত ব্যাপারটা অরিন্দমের কাছে দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠল। সে বুঝতে পারল ইন্দ্রাণীর সঙ্গে তার ডিভোর্সের নিষ্পত্তি কেন এত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। আসলে বিবাহ-বিচ্ছেদের ডিক্রি না মঞ্জুর হওয়া পর্যন্ত হীরক আর ইন্দ্রাণীর বিয়েটা সম্পন্ন হতে পারছে না। তার ফলে দুজনের স্টেটসে যাওয়ার বিলম্ব ঘটছে।

অরিন্দমের মনে হল, এই সুযোগে ইন্দ্রাণীকে সে একটু জব্দ করে। ইচ্ছে করলে বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলাকে সে বেশ কিছুকাল জিইয়ে রাখতে পারে। কোর্ট-কাছারিতে কত মামলা নাকি জমে আছে। ঠিকমতো তারিখ ফেলতে পারলে এক-একটা

মামলার নিষ্পত্তি হতে তিন চার বছর কেটে যায়।

শ্বশুর বললেন, 'আজকাল অবশ্য ডিভোর্সের মামলা আকছার হচ্ছে। আইনও অনেক সরল হয়ে গেছে। তবু কিছুটা রীতিনীতি এবং সময়ের ব্যাপার তো রয়েছে। অবশ্য তুমি একটু সাহায্য করলে সেটা অনেক তাড়াতাড়ি হতে পারে।'

অরিন্দম গম্ভীর মুখে জানাল, 'আমাকে কী করতে হবে তাই তো এখনও বলেননি।'

শ্বশুর এবার তার দিকে ফিরে বললেন, 'বলছি বাবা, তোমার সাহায্য না পেলে তো এই ডিভোর্সের নিষ্পত্তি তাড়াতাড়ি হবে না। যদিও ব্যাপারটা আগের চেয়ে অনেক সরল, তবু কেসের নিষ্পত্তি হতে অন্তত দেড় বছর সময় লাগবে, এমন ব্যবস্থা যে আইনেই করে রেখেছে।'

অরিন্দম ব্যাপারটা না বুঝতে পেরে ভ্রূ কুচকে তাকাল।

শ্বশুর বললেন, 'স্বামী-স্ত্রী যদি আদালতের কাছে বিচ্ছেদ প্রার্থনা করে, তবে অন্তত এক বছর তাদের আলাদা বাস করতে হবে। তারপর আদালত আরও ছ-মাস পরে একটি দিন ঠিক করে কেসের শুনানি ধার্য করবেন। যদি ইতিমধ্যে দুজনের মতের পরিবর্তন হয়, তাহলে মামলা খারিজ হয়ে যাবে। আর দুজনেই বিচ্ছেদ চাইলে আদালত তা মঞ্জুর করবেন।'

অরিন্দম আইনের ব্যাখ্যা বুঝতে পারলেও কোনো মন্তব্য করল না।

শ্বশুর নরম গলায় বললেন, 'অবশ্য এই এক বছরের ব্যাপারটা ইচ্ছে করলে একদিনেই সংক্ষেপে কবে নেওয়া যায়।'

অরিন্দম মৃদু হেসে শুধোল, 'কেমন করে?'

শ্বশুর তার দিকে এক পা এগিয়ে এসে বললেন, 'যদি দুজনে আদালতের কাছে লিখিতভাবে স্বীকার কর যে গত এক বৎসর তোমরা আলাদা বাস করেছ, এক শয্যায় রাত কাটাওনি, স্বামী-স্ত্রীর কোনো সম্পর্ক তোমাদের মধ্যে ছিল না, তাহলে—'

অরিন্দম অস্ফুটে বলে উঠল, 'কিন্তু সেটা তো সত্যি নয়, মিথ্যে।'

শ্বশুর দার্শনিকের মতো মন্তব্য করলেন, 'তোমাদের স্বামী স্ত্রী সম্পর্কটা যে মিথ্যে হয়ে গেছে বাবা।'

অরিন্দম চুপ। কোনো জবাব দিতে পারল না।

শ্বশুর তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, 'সামাজিক অর্থে তোমাদের বিয়েটা অনেকদিন আগেই ভেঙে গেছে। সে কথা একটু আগে তুমি নিজেই বলছিলে। এখন আইনের চোখে সেটা দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হলে অমন একটু মিথ্যাভাষণে প্রয়োজন আছে বৈকি।'

অরিন্দম মুখ নীচু করে কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে বলল, 'কিন্তু আদালতের কাছে ওই মিথ্যে স্বীকারোক্তি দিতে যদি রাজি না হই?'

শ্বশুর সন্ধানী আলোকের মতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে জামাতার মুখের ওপর কী যেন লক্ষ্য করলেন। বিচক্ষণ ব্যক্তির মতো ধীরে ধীরে বললে, 'তাহলে বুঝব ইন্দ্রাণীর ওপর তুমি প্রতিশোধ নিতে চাও।'

অরিন্দম উঠে দাঁড়াল। উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, 'যদি আমার মনে সেই প্রতিশোধস্পৃহা জেগে থাকে, তাহলে আপনি কি সেটা অন্যায় বলবেন? অস্বীকার করতে পারবেন যে আপনার মেয়ে ঘর-সংসার ফেলে আর একজনের হাত ধরে বেরিয়ে গিয়ে আমাকে একটা বিশ্রী অবস্থার মধ্যে ফেলে দিয়েছে?'

শ্বশুর বুদ্ধিমান, তাই জামাইয়ের কথায় উষ্মা প্রকাশ করলেন না। মিষ্টি হেসে শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'বোসো অরিন্দম। তোমার সঙ্গে আরও কিছু কথা আছে। হ্যাঁ, তুমি যা বলছিলে, ডির্ভোসের ব্যাপারটা ঝুলিয়ে রেখে ইন্দ্রাণীকে জব্দ করবে। সেটা অবশ্য তুমি পারো। কিন্তু একটু ভেবে দেখো, এটা ঠিক নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ করা হল না? আসলে আইনমতে ডিভোর্স মঞ্জুর না হওয়া পর্যন্ত তুমি নিজেও তো জালে বন্দি রইলে।'

কেমন অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে শ্বশুর কয়েক সেকেন্ড তাকে নিরীক্ষণ করলেন। তারপর কাঁধে একটা হাত রেখে সস্নেহে বললেন, 'তোমার বয়সও তো কম। দেখে শুনে পছন্দ করে আবার বিয়ে-থা করো। ইন্দ্রাণীর ওপর রাগ করে সমস্ত মেয়েজাতটিকে দোষী ভেব না। সংসারে ভালো মেয়ে অনেক আছে। এবার তাদেব একজনকে তুমি নিশ্চয় খুঁজে পাবে।'

সহানুভূতি মানুষকে নরম করে ফেলে। অরিন্দমও নরম হল। কিন্তু তার মুখে কথা জোগাল না।

শ্বশুর বললেন, 'আর কেলেঙ্কারির কথা বলছ? আমাদের অবস্থা একবার চিন্তা করো। আত্মীয়স্বজন, পড়াপড়শি সকলেই একটা গণ্ডগোল সন্দেহ করছে। এখনও সমস্ত ঘটনা হয়তো জানতে পারেনি। কিন্তু শিগগির পারবে। তারপর সমাজে, পাঁচজনের সামনে দাঁড়িয়ে আমরা কী কৈফিয়ত দেব বলতে পারো? তার চেয়ে যদি চুপি চুপি বিয়েটা সেরে দুজনে আমেরিকা চলে যায় সেই ভালো।'

শ্বশুর তার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে কতক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর হঠাৎ খুব কাছে এসে তার হাত দুটি ধরে বললেন, 'নিয়তির পরিহাস, তাই না অরিন্দম? ইন্দ্রাণীকে দেব বলে একদিন তোমার কাছে প্রার্থী হয়েছিলাম। আজ আবার তেমনি এসে দাঁড়িয়েছি, তবে এবার অন্য কথা বলতে। মেয়েটাকে যদি তুমি মুক্তি দাও, এই বিশ্রী পরিস্থিতি কাটিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে আমাদের সাহায্য করো—'

অরিন্দম মাথা নীচু করে বলল, 'ঠিক আছে। আমি রাজি। যা বলবেন, তাই করব।'

শ্বশুর খুশি হয়ে বললেন, 'বাঁচালে বাবা। আমি জানতাম তুমি কখনও ফিরিয়ে দিতে পারবে না। এই ডিভোর্সের মামলা যে উকিলকে দিয়েছি, তোমার সঙ্গে

অফিসে তিনি যোগাযোগ করবেন। প্রয়োজন হলে অফিসে কিংবা তোমার বাড়িতে যাবেন।'

অরিন্দম বাধা দিয়ে বলল, 'না-না। অফিসে কিংবা বাড়িতে নয়। বরং তার ঠিকানা দিন। আমি যোগাযোগ করে নেব।'

শ্বশুর বোধহয় আপত্তির কারণটা বুঝতে পারলেন। ডিভোর্সের মতো একটা ব্যক্তিগত বিষয় অফিসে কিংবা বাড়িতে বসে আলোচনা করতে অরিন্দম অনিচ্ছুক। তাই ড্রয়ার থেকে একটা কার্ড বের করে তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন 'এটা রেখে দাও। কাল-পরশু যখন হোক একবার টেলিফোনে কথা বোলো। ইতিমধ্যে আমি সব জানিয়ে রাখব।'

দিন দুই-তিন পরে সেই উকিলের টেলিফোন পেয়ে অরিন্দম তার চেম্বারে দেখা করল। শ্বশুর যেমন বলেছিলেন সব ব্যবস্থা তেমনি তৈরি ছিল। কাগজপত্রে সই-সাবুদ করবার পর উকিল বলল, 'কালই মামলা রুজু করে দিচ্ছি। তবে এখন আর কিছু করবার নেই। হাকিম ছ-মাস পরে একটা শুনানির দিন ধার্য করবেন। সেদিন একবার দুজনকেই কোর্টে যেতে হবে।'

'ছ-মাস বাদে?' অরিন্দম প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ, মশায়।' উকিলের হেসে বলল, 'জানি, আপনারা দু-পক্ষই খুব ছটফট করছেন। কিন্তু কী করব? অগ্নিসাক্ষী করে সাত পাকের বিয়ে। ফস করে কি এক কথায় নাকচ হয়?'

প্রায় দু-মাস কেটে গেছে। অরিন্দম আর কেসের খোঁজখবর রাখেনি। সম্ভবত শুনানির তারিখ ইতিমধ্যে ঠিক হয়ে গেছে। আদালতের সমন আসতে দেরি হবে। মামলার দু-চারদিন আগে তার শ্বশুর কিংবা উকিল টেলিফোনে যোগাযোগ করে তাকে কোর্টে হাজিরা দিতে বলবে।

পাঁচ

পরদিন লাইট হাউসের কাছে পৌঁছতে একটু দেরি হয়ে গেল। তাকে দেখে বিনয় এগিয়ে এল। বলল, 'ঝাড়া দশ মিনিট তোর জন্যে দাঁড়িয়ে আছি। সেই লেট করে এলি তো?'

অরিন্দম অপ্রস্তুতের একশেষ।

আশেপাশে কাউকে লক্ষ্য না করে সে সন্দিগ্ধ সুরে জিজ্ঞাসা করল, 'কই, কাউকে দেখছি না তো? আসেনি?'

'এসেছে।' বিনয় বাঁকা চোখে অন্য দিকে তাকিয়ে হাসল। বলল, 'একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে।'

'দূরে কেন?'

'বলেছি না তোকে? পথেঘাটে আমার সঙ্গে ঘোরাঘুরি করতে খুব আনইজি ফিল করে। মিলির ইচ্ছে নয়, বিয়ের আগে আত্মীয়স্বজন কিংবা জানাশুনো কেউ পূর্বরাগের ব্যাপারটা টের পায়।'

'তার কারণ?'

'কেমন করে বলব?' বিনয় গলা নামিয়ে বলল, 'ঘরপোড়া গরু, তাই সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়। বিয়ের ব্যাপারটা তো এখনও সেটলড্ হয়নি।'

অরিন্দম জিজ্ঞাসা করল, 'ওর মা-বাবা ব্যাপারটা জানে না?'

'উহুঁ। মেয়েটা ভীষণ চাপা, কাউকে বলেছে বলে মনে হয় না।

আমার কথা ওকে বলেছিস্?

'হ্যাঁ। তোর সঙ্গে আলাপ করতে রাজি হয়েছে। তারপর সেই ব্যাপারটাও ওকে জানিয়ে রেখেছি।'

'কী ব্যাপার?'

'বারে! এরই মধ্যে ভুলে গেলি? গতকাল কথা হল না, তোর কোনো ক্লায়েন্টকে ধরে কলকাতার বাইরে একটা নিরিবিলি জায়গায় আমাদের যাওয়ার ব্যবস্থা করবি। অবশ্য তুইও সঙ্গে যাবি।'

অরিন্দম হেসে বলল, 'সে ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তার জন্য চিন্তা নেই। কিন্তু আমি সঙ্গে গেলে তোর গার্ল-ফ্রেন্ড যেতে রাজি?'

বিনয় হেসে জবাব দিল, 'সে কথা ওর মুখ থেকেই শুনবি।'

মিলির সঙ্গে অরিন্দমের পরিচয় হল। ভিতরে কোথায় যেন দাঁড়িয়ে শো-কেসের ছবি দেখছিল। বিনয় গিয়ে ডেকে আনল। হাত তুলে নমস্কার করার, ফাঁকে অরিন্দম ভালো করে দেখল ওকে। বয়স সাতাশ-আটাশ, ছিপছিপে গড়ন নয়, বরং স্বাস্থ্যবতী। ডিমালো মুখ........সামনে থেকে মনে হল গুরু নিতম্বিনী। লম্বায় সাধারণ বাঙালি মেয়ের চেয়ে ঈষৎ দীর্ঘাঙ্গী। মিলি অনূঢ়া হলেও ইতিপূর্বে একবার মা হয়েছিল, তার চেহারার দিকে তাকিয়ে অরিন্দমের যেন সেই কথাটা মনে পড়ে গেল।

বিনয় বলল, 'ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। এখান থেকে সোজা গঙ্গার ধারে চলে যাব, আউটরাম ঘাটে কিংবা আরও দক্ষিণে। তুই সঙ্গে চল্।'

অরিন্দম জিভ কেটে বলল, 'তাই কখনও হয়? আমার অনেক কাজ। সাড়ে পাঁচটায় একজন ক্লায়েন্টের সঙ্গে দেখা করতে হবে, উপায় নেই।' মিলিকে বলল, 'মাপ করবেন, অন্য একদিন নিশ্চয় যাব। বিনয় আজ শুধু আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে চেয়েছিল।'

মিলি মৃদু হাসল। বলল, 'শুনেছি কলকাতার বাইরে কোথায় যেন যাওয়ার একটা ব্যবস্থা করেছেন। সেদিন কিন্তু অবশ্য যাবেন।'

বিনয় মন্তব্য করল, 'কি রে, এবার এড়াতে পারবি?'

অরিন্দম পাশ কাটিয়ে যেতে চেষ্টা করল, 'অচ্ছা, সে হবে'খন।

যাওয়ার আগে মিলি আবার হাত তুলে নমস্কার করল। হেসে বলল, 'চলি, শিগগির নিশ্চয় দেখা হচ্ছে।'

অপেক্ষমান ট্যাক্সি ড্রাইভারের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই বিনয় কৈফিয়তের ভঙ্গিতে বলল, 'এই তো যাচ্ছি, কথা হয়ে গেছে।'

মিলি রাস্তা পেরিয়ে ট্যাক্সির কাছে পৌছে গেল। আড়চোখে সেদিকে একবার তাকিয়ে বিনয় তার কানের কাছে ফিসফিস করল, 'কি রে, কেমন লাগল ওকে?'

'ভালোই।' অরিন্দম ছোট্ট জবাব দিল।

'তুই বড় নার্ভাস। ইচ্ছে করলে আমাদের সঙ্গে যেতে পারতিস্। মিছিমিছি কাজকর্মের অজুহাত দিতে গেলি।'

'না-না। সত্যি কাজ আছে।' অরিন্দম বোঝাতে চাইল।

বিনয় মুচকি হাসল, বলল, 'শোন্, দিন কুড়ি বাদেই আবার আসছি। বাইরে যাওয়ার সেই প্রোগ্রামটা কিন্তু পাকা করে রাখিস্।'

অরিন্দম হেসে জবাব দিল, 'অবশ্য। সে কথা আর বলতে।'

বিনয়কে হঠাৎ সামান্য চিন্তিত দেখাল। মুখ নীচু করে বলল, 'মিলি প্রায় আলটিমেটাম দিয়ে বসে আছে। ওকে আর ঝুলিয়ে রাখা যাবে না। সামনের বারে এসে একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে। সুতরাং নিরিবিলি কোথাও যাওয়া দরকার।'

অরিন্দম বলল, 'তার জন্য চিন্তা নেই। আমি সব ব্যবস্থা করে রাখব।'

বিনয় তেমনি চিন্তিত মুখে বলল, 'কিন্তু মুশকিল কী জানিস্? বাড়িতে ওই ঘটনাগুলো বলতে, মানে সাহস পাচ্ছি না। বিশেষ করে মিলির শর্ত দুটো—'

অরিন্দম জবাব দিল, 'এসব কথা এখন থাক, পরে হবে। তুই বরং গাড়িতে ওঠ্।'

ট্যাক্সিটা চলে যাবার পর অরিন্দম আরও দু-এক মিনিট, সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। একবার ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকাল। সে বেশ বুঝতে পারছিল বিনয় রীতিমতো দোটানায় আছে। মিলির সঙ্গে পরিচয় এবং সেই মেয়ের অতীত জীবনের কলঙ্কের কথা বাড়িতে বলার মতো মানসিক প্রস্তুতি অথবা গঠন তার নেই। আবার নিজের দুর্বলতার কথাও মিলির কাছে অকপটে স্বীকার করবার মতো মনের জোর সে অর্জন করেনি। শেষ পর্যন্ত বিনয় যে কী করবে অরিন্দম তা ভেবে পেল না। অথচ আজ প্রথম আলাপে মিলিকে তার ভালো লেগেছে। চেহারা, চোখের দৃষ্টিতে ব্যক্তিত্বের সুস্পষ্ট প্রকাশ। বিয়ের আগে বিনয়ের মা-বাবা এবং পরিবারের লোকেদের কাছে তার জীবনের কোনো কথা সে গোপন রাখতে ইচ্ছুক নয়। এমনকি বিয়ের পরে তার যা কর্তব্য বলে মনে করে, সেখানেও সে কম্প্রোমাইজ করতে চায়নি। আসলে একবার ঠকেছে বলেই দ্বিতীয়বার সে এত সতর্ক, পুনরায় ভুলের মাশুল গুনে দিতে গররাজি।

বিনয় এল ঠিক দশ দিন পরে। সেটা বৃহস্পতিবার। টিফিনের কিছুক্ষণ আগে একটা অডিট রিপোর্টের পাতায় অরিন্দম চোখ বুলোচ্ছিল। আশ্বিনের মাঝামাঝি হতে চলেছে। পুজোর আর পক্ষকালের মতো বাকি। এরই মধ্যে একটা ছুটি-ছুটি ভাব।

দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে বিনয় হাসল।

তাকে দেকে অরিন্দম উষ্ণ অভ্যর্থনা করল, 'আয়, আয়। আমি ভেবেছিলাম তুই সামনের হপ্তায় আসবি।'

কাঁধের ব্যাগটা চেয়ারের কোনে ঝুলিয়ে দিয়ে বিনয় জবাব দিল, 'আসতেই হল। উপায় ছিল না।'

'তার মানে?'

চেয়ারের উপর গা এলিয়ে দিয়ে বিনয় বলল, 'হঠাৎ মিলির জরুরি তলব পেলাম।'

'জরুরি তলব? ব্যাপার কী?' অরিন্দম ভ্রূ কোঁচকাল।

'সবটা এখনও জানি না। তবে লিখেছে আগামী রবিবারে সে গুরুজীর আশ্রমে রওনা হবে। তার আগেই আমার সঙ্গে নাকি কথা বলা দরকার।' বিনয় জবাব দিল।

'হঠাৎ গুরুজির আশ্রমে যাবার প্রয়োজন হল? গতবার তোকে কিছু বলেনি?' অরিন্দম শুধোল।

'না', বিনয়কে সামান্য চিন্তিত দেখাল। কয়েক সেকেন্ড পরে সে বলল, 'আসল ব্যাপারটা কী জানিস্? মিলির অবচেতন মনে একটা অপরাধবোধ লুকিয়ে আছে।'

'অপরাধবোধ?'

'হ্যাঁ, মনোবিজ্ঞানের কথায় যাকে বলতে পারি labyrinth of guilt complex.

'ওর কুমারী অবস্থায় মা হবার পর থেকেই এটা মনের গভীরে সৃষ্টি হয়েছে। বিনয় একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'মানুষ যখন কোনো অন্যায় কাজ করে তখন তার মনে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এটা সেই নিউটনের তৃতীয় সূত্রের মতো। আসলে এ প্রতিক্রিয়াটা হল অপরাধবোধ।'

'কিন্তু মিলি তো কোনো অন্যায় কাজ করেনি। একজন পুরুষকে শুধু সরল মনে বিশ্বাস করেছিল। পরে সেই লোকটা তাকে ঠকিয়ে পালিয়ে যায়।'

'সেটা ঠিক। কিন্তু তার গর্ভে যে সন্তান এসেছিল, মিলির ধারণা, সেই ছেলের প্রতি সঠিক কর্তব্য সে পালন করেনি। একটা কথা নিশ্চয় মানবি—জন্মদাতা এবং জননীর মধ্যে যদি অবৈধ সংসর্গ হয়ে থাকে, তার জন্য গর্ভজাত সন্তানকে নিশ্চয় দোষী করা চলে না। অথচ জন্মাবার ছ-মাস পরে সেই ছেলেকে তার মা-বাবার পরিচয় থেকে বঞ্চিত করে একটা অনাথ-আশ্রমে রেখে মিলিকে চলে আসতে হয়েছিল।'

'কিন্তু এছাড়া তো তাব কোনো উপায় ছিল না। সমাজ বলে যখন একটা কিছু আছে এবং তাকে মেনে চলতে হয়। তাছাড়া কুমারী মেয়ের মাতৃত্বের চেয়ে বড় কলঙ্ক এদেশে আর কী হতে পারে?'

'তোর কথা কে অস্বীকার করছে?' বিনয় ধীরে ধীরে বলল, 'নিরুপায় হয়ে মিলি তার পেটের সন্তানকে শিশু আশ্রমে দিতে বাধ্য হয়েছিল, সে কথা ঠিক। কিন্তু ছেলেটা তো নির্দোষ। স্নেহমমতা-বঞ্চিত এই অনাথ জীবন নিশ্চয় তার হওয়ার কথা নয়। গুরুজির আশ্রম থেকে ফিরে আসার পর থেকেই মিলির মনে এই প্রশ্নটা জেগেছে। শুধু নিজেকে কলঙ্কের হাত থেকে বাঁচাতে, সমাজে পাঁচজনের চোখে ভালো সেজে থাকতে সে গর্ভের ছেলেকে অনাথ-আশ্রমে পরিত্যাগ করে পালিয়ে আসে। ক্রমে ক্রমে এই অপরাধবোধ তার মনে শেকড় গেড়ে বসেছে। যতদিন না এর একটা বিহিত হচ্ছে, ততদিন মিলির মনে স্বস্তি নেই।'

অরিন্দম শুধোল, 'কিন্তু তুই কী ঠিক করলি? বাড়িতে সব বলেছিস্?'

'না', বিনয় পরিষ্কার জবাব দিল। কয়েক সেকেন্ড পরে বলল,—'জানিয়ে কোনো লাভ নেই। বাবা রিটায়ার করেছেন। মায়ের এখন ধর্মে বাতিক। সংসারের দায়িত্ব সব বৌদির। তবু এক বন্ধুর নাম করে এই বিয়ের ব্যাপারটা তার কাছে গল্প করেছিলাম। তাও কলঙ্কের কথা ভাঙিনি। শুধু বলেছি মেয়েটার আগের পক্ষের

একটা ছেলে আছে। শুনে বৌদি চোখ দুটো প্রায় কপালে তুলে বলল—'ওমা! এ তাহলে ফল সুদ্ধু গাছ ঘরে আনা হল।' একটা হতাশ ভঙ্গি করে বিনয় ফের বলল,—'বুঝতেই পারছিস্ বাড়ির লোকেরা কেমন কনজারভেটিভ। আর যে মেয়ের এমন একটা অতীত আছে, জেনেশুনে সেই বাড়ির লোক তার সঙ্গে ঘটাপটা করে ছেলের বিয়ে দিতে রাজি হবে এমন কথা নিশ্চয় চিন্তা করা যায় না।'

'তাহলে উপায়?' অরিন্দম প্রশ্ন করল।

বিনয় অভ্যেস মতো মাথার চুলে একবার হাত বুলিয়ে বলল, 'তুই সেই প্রোগ্রামটা ফাইন্যাল করে রেখেছিস্?'

'হ্যাঁ, মোটামুটি ঠিক। আর জায়গাটাও খুব সুন্দর বলে শুনলাম। বেশ নিরিবিলি, কলকাতা থেকে অবশ্য একটু দূরে।' অরিন্দম মুখ উজ্জ্বল করে তাকাল।

বিনয় শুধোল, 'কত দূরে?'

'খুব বেশি নয়। এখান থেকে গাড়িতে কোলাঘাট যাব। রূপনারায়ণে আমাদের জন্য লঞ্চ অপেক্ষা করবে। কোনাকুনি নদী পেরিয়ে একটু দক্ষিণে গেলেই একটা রাইস মিলের গেস্টহাউস আছে। ঠিক নদীর ওপরে, আবার মিল থেকে বেশ খানিকটা দূরে।'

'চমৎকার হবে,' বিনয় খুশি হয়ে বলল, 'তবে সন্ধের মধ্যেই ফিরতে পারব তো? দেরি হলে মিলি আবার ভীষণ ছটফট করবে।'

অরিন্দম বলল, 'মনে হয় পারব। এই ধর্ গাড়িতে কোলাঘাট পৌঁছোতে বড়জোর দেড় ঘণ্টা লাগবে। তারপর লঞ্চ তো নদীতে অপেক্ষা করছে। গেস্ট-হাউসে গিয়ে উঠতে খুব বেশি হলে আরও আধঘণ্টা লাগতে পারে। যদি বিকেল চারটে নাগাদ ওখান থেকে বেবিয়ে পড়ি, তাহলে সন্ধের মুখে কলকাতা পৌঁছে যাব।'

বিনয় প্রশ্ন করল, 'দুপুরের খাওয়া? সঙ্গে কিছু নিয়ে নেব?'

'নাথিং।' অরিন্দম এক কথায় তাকে নিরস্ত করল। বলল, 'ওখানে লাঞ্চ রেডি থাকবে। তুই শুধু কবে যাবি সেটা ঠিক করে বল্। কাল, আই মিন টুমরো?'

'টুমরো?' বিনয় চোখ ঘুরিয়ে এক মুহূর্ত চিন্তা করে বলল, 'অসম্ভব। এখনও তো মিলির সঙ্গে কথা হয়নি।'

'তাহলে পরশু?' অরিন্দম শুধোল।

'ইয়েস। পরশু যেতে পারি, তার মানে স্যাটারডে।' বিনয় উত্তর দিল। বন্ধুকে শুধোল, 'তোর কোনো অসুবিধে নেই?'

'না। আমি ম্যানেজ করে নেব। তুই বরং চটপট মিলিকে খবরটা দিয়ে আয়। তাহলে শনিবার কিন্তু ফাইন্যাল।' মুচকি হেসে অরিন্দম টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে বলল, 'দাঁড়া, ক্লায়েন্টকে প্রোগ্রামটা কনফার্ম করি।'

ডায়াল করতেই লাইন পাওয়া গেল। কথাবার্তা আগেই বলা ছিল। অরিন্দম শুধু প্রোগ্রামটা বলে দিল। সকাল আটটায় কলকাতা থেকে তারা বেরিয়ে পড়বে। নটা নাগাদ কোলাঘাটে পৌঁছোবার কথা। ফেরিঘাটে লঞ্চ যেন অপেক্ষা করে।

লাইনের অন্য প্রান্ত থেকে খবর এল, তার জন্য চিন্তা নেই। ফেরিঘাটে গাড়ি পৌঁছলেই মিলের লোক এসে রিসিভ করবে। আপনারা মানে হাজব্যান্ড-ওয়াইফ এবং আর যাঁরা আসছেন তাঁদের জন্য ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ এবং বিকেলের টী পর্যন্ত সার্ভ করতে বলা আছে। ভালো লাগলে রাত্তিরটাও কাটিয়ে আসতে পারেন। ডিনারের ব্যবস্থা গেস্ট-হাউসেই হবে।'

অরিন্দম তাড়াতাড়ি বলল, 'না-না। ডিনারের কোনো প্রয়োজন নেই। আমরা বিকেল চারটে নাগাদ বেরিয়ে পড়ব। মানে সন্ধের মুখে কলকাতা পৌঁছোতেই হবে।'

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে অরিন্দম ভ্রূ কোঁচকাল। কপালে অস্পষ্ট চিন্তার রেখা।

বিনয় জিজ্ঞাসা করল, 'কি রে, মনে হচ্ছে গাড্ডায় পড়ে গেলি?'

'না, মানে একটা ছোট্ট ব্যাপার, বুঝলি? অথচ কেমন করে ওটা সল্‌ভ হবে ভেবে পাচ্ছি না।'

'আবার কী হল?' বিনয় ওর মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে আন্দাজ করবার চেষ্টা করে।

অরিন্দম বলল, 'এরকম একটা পরিস্থিতি দাঁড়াবে জানতাম। কিন্তু এখন কী করা যায় বল তো?'

'কী হয়েছে তাই তো জানলাম না।' বিনয় কাঁধ ঝাঁকিয়ে ঈষৎ নাটকীয় ভঙ্গি করল।

অরিন্দম বলল, 'ব্যাপারটা আর কিছু নয়। মানে হেড-অফিস থেকে জানিয়ে দিয়েছে আমরা স্বামী-স্ত্রী তার দু-একজন বন্ধু-বান্ধব মিলে ওখানে যাচ্ছি। অথচ তিনজন মানে তুই, আমি আর মিলি ছাড়া তো আর কাউকে সঙ্গে পাচ্ছি না।'

'আই সী।' বিনয় ব্যাপারটা ভালো করে বুঝবার জন্য বোধহয় ভাবতে শুরু করল।

অরিন্দম বলল, 'আসলে এটা শোভন-অশোভনের প্রশ্ন। আফটার অল মিলি ইজ অ্যান আনম্যারেড গার্ল। একজন অবিবাহিতা মেয়েকে নিয়ে দুজনে হঠাৎ নিরিবিলি একটা গেস্ট-হাউসে গিয়ে উঠলে পাঁচজনে অন্যরকম সন্দেহ করবে।'

'তা ঠিক।' বিনয় মাথা চুলকে বলল। 'তবে প্রবলেমটা বোধহয় সলভ করা যায়।'

'কেমন করে?' অরিন্দম জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

বিনয় বলল, 'ধর, যদি মিলিকেই বউ সাজিয়ে নিয়ে যাই?'

'গ্র্যান্ড আইডিয়া।' অরিন্দম তারিখ করে বলল, 'মিলিকে তোর ওয়াইফ বলে

চালিয়ে দিস্। কোনো দোষের হবে না। তবে মিলি কি শাঁখা-সিঁদুর পরে বউ সাজতে রাজি হবে?'

'কেন? সাজতে আপত্তি কীসের?' বিনয় পালটা প্রশ্ন করল। নিজেই বলল, 'এই তো মাস দুই আগে ওদের অফিস ক্লাবে মিলি একজন বিবাহিতা মহিলার রোলে অভিনয় করেছে। এটা ড্রামা না হলেও সামান্য একটু অ্যাকটিং বৈ তো কিছু নয়। আর আজকালকার মেয়েরা তো শাঁখা সিঁদুর প্রায় বাতিল করে দিয়েছে। সিঁথিতে একটু সিঁদুর ছুঁইয়ে রাখে, এই পর্যন্ত। আর হাতে একটা স্টিলের নোয়া, ব্যস্! তাবপর রিস্টওয়াচ আর বালা।' মুচকি হেসে বিনয় ফের বলল,—'তবে হ্যাঁ, মিলিকে কিন্তু তোর বউ বলে পরিচয় দিস্।'

'পাগল নাকি?' অরিন্দম যেন তিন পা পিছিয়ে এল। বলল, 'মেয়েদের কী মনে করিস্ তুই? খানিকটা তরল পদার্থ? ইচ্ছেমতো যে কোনো পাত্রে ঢাললেই হল, তাই না?'

বিনয় কোনো কথা না বলে মৃদু হাসছিল। এসব কথা বলতে গেলে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়বে—অরিন্দম নিজেই মন্তব্য করল। তারপর হেসে বলল, 'শেষকালে মিলি হয়তো প্রোগ্রাম ক্যানসেল করে দিতে বলবে, বুঝলি?'

'চুপ কর্ দিকি।' বিনয় তাকে প্রায় ধমক দিল। বলল, 'বড্ড ফালতু বকিস্ তুই। মিলিকে যা বলার আমি বলব। আড়চোখে বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে সে রহস্য করে হাসল। বলল, 'বউ সাজতে মিলি যদি রাজি থাকে, তখন? তুই আবার পিছিয়ে যাবি না তো?'

'না।' অরিন্দম পরিহাসের সুরে বলল, 'তবে তুমি যেন আবার বন্ধুর বৌয়ের পেছনে বেশি ছোঁক ছোঁক কোরো না, বুঝলে?'

বিনয় চলে যাবার পর অরিন্দম খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। ব্যাপারটা যেন কেমন মজার হয়ে উঠেছে। মিলি কি সত্যি তাদের সঙ্গে ওই ভাবে যেতে রাজি হবে? আর বিনয় যা বলছিল, তাই কি সম্ভব? মিলি কখনও তার বউ সাজতে সম্মত হবে না। বিনয় অবশ্য জোর গলায় বলে গেছে--মিলিকে সে রাজি করাবে। দেখা যাক!

কিন্তু একটা কথা অরিন্দমের মনে ক্রমেই চিন্তার ঝড় তুলছিল। শেষ পর্যন্ত মিলির সঙ্গে বিনয়ের সম্পর্কের কী পরিণাম দাঁড়াবে? একটু আগে বিনয় যা বলছিল, তাতে মনে হল না যে মিলির শর্ত দুটো তার কাছে গ্রহণযোগ্য। তাহলে? আর মিলি যে ওই দুটি শর্ত সম্পূর্ণ অথবা আংশিক প্রত্যাহার করে নিতে পারে, এমন একটা সম্ভাবনা আছে বলেও সে মনে করে না। তাহলে এর অবশ্যম্ভাবী পরিণাম ছাড়াছাড়ি অথবা চিরবিচ্ছেদ। অরিন্দমের হঠাৎ মনে হল পরশু দিনের এই প্রোগ্রামটায় তার অংশ নেওয়া বোধহয় ঠিক হল না। শেষ পর্যন্ত দুজনের ভুল বোঝাবুঝির মধ্যে সে নিজেও হয়তো জড়িয়ে পড়তে পারে। কিন্তু এখন

আর পিছিয়ে যাবার উপায় নেই। সুতরাং দুজনের মধ্যে যা ঘটতে চলেছে তার নীরব সাক্ষী তাকেই থাকতে হবে।

পরদিন দুপুরে বিনয় এল। তখন প্রায় সাড়ে তিনটে বাজে। অরিন্দমের একজন ক্লায়েন্টের অফিসে যাওয়ার কথা। দরজা ঠেলে বিনয়কে ঢুকতে দেখে সে আবার বসে পড়ল।

বিনয়ের আজ পুরো সাহেবি পোশাক।

গলার টাইয়ের ফাঁসটা আলগা করে চেয়ারে গা এলিয়ে দিল বিনয়। বলল, 'কোথাও বেরোচ্ছিলি বুঝি?'

'হ্যাঁ, এই কাছেই। খৈরু প্লেসে আমাদের এক ক্লায়েন্টের অফিসে। সেখানে অডিটের কাজ চলছে।' একটু থামল অরিন্দম। বন্ধুর পোশাকের ওপর দ্রুত দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'ধড়াচূড়া পরে গিয়েছিলি কোথায়?'

'একটা ইন্টারভ্যু দিতে।'

'হঠাৎ ইন্টারভ্যু কই, কাল তো বলিস নি?'

'বলার মতো কিছু ব্যাপার নয়', বিনয় মুচকি হাসল।

অরিন্দম প্রশ্ন করল, 'চাকরিটা কোথায়?'

'দিল্লির কাছে, ফরিদাবাদে।'

'অতদূর চলে যাবি?'

'হ্যাঁ। বোকারোতে আর ভালো লাগছে না। কিছুদিন আগে কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত করেছিলাম। তারাই কল করেছিল।'

'ইন্টারভ্যু কেমন হল?'

'ভালোই।'

'চাকরিটা হয়ে যাবে মনে হয়?'

'হতে পারে। গলার টাইটা আঙুলে জড়িয়ে বিনয় কী যেন চিন্তা করছিল।

অরিন্দম হঠাৎ প্রশ্ন করল, 'তোর কী ব্যাপার বল দিকি? হঠাৎ ফরিদাবাদে চাকরির জন্য দরখাস্ত ছাড়লি, তারপর ইন্টারভ্যু দিয়ে এলি?'

বিনয় সোজা হয়ে বসল। বলল, 'ও কিছু নয়। খেয়াল চাপতে দরখাস্ত করেছিলাম। তবে এখন ভাবছি পেলে চলেই যাব।'

দুজনেই কয়েক সেকেন্ড চুপ।

তারপর বিনয় বলল, 'হ্যাঁ, শোন্, কালকের প্রোগ্রাম কিন্তু ফাইন্যাল।'

'মিলিকে বলেছিস্? যেতে রাজি?' অরিন্দম জিজ্ঞেস করে।

'কেন, তোর সন্দেহ আছে নাকি?' বিনয়ের ঠোঁটের কোনে হাসি। বাঁ চোখটা সামান্য ছোট করে বলল, 'শুধু রাজি নয়, ফেরিঘাটে পৌঁছে তোর বউ হতেও আপত্তি করেনি।'

'কী বলছিস্ যা-তা?' অরিন্দম প্রায় প্রতিবাদের ঝড় তুলল, 'কয়েক ঘণ্টার

জন্য দেখছি মেয়েটাকে আমার বউ বানিয়ে ছাড়বি?'

বিনয় বলল, 'মিলিকে বোঝাতে হল, এ ছাড়া কোনো উপায় নেই। ফেরিঘাটে যারা রিসিভ করতে আসবে, তারা জানে অরিন্দম সেন এবং তার মিসেস সারাদিন গেস্ট হাউসে কাটিয়ে বিকেলবেলা ফিরে যাবে। সঙ্গে দু-একজন বন্ধু-বান্ধব আসবে। গাড়ি থেকে নেমে সামান্য একটু অভিনয়, কেউ যাতে না সন্দেহ করতে পারে।'

'তুই বলতেই মিলি রাজি হয়ে গেল?' অরিন্দম সন্ধিগ্ধ চোখে তাকাল।

'তাই কখনও হয়?' বিনয় চোখ নাচিয়ে খানিকটা কৃতিত্বের দাবি করল। বলল, 'প্রথম তো মুখের ওপর বলেই দিল, কারও বউ সেজে কোথাও যেতে পারবে না। রাস্তাঘাটে অমনি সিঁথিতে সিঁদুর পরে হাঁটাহাঁটি করলেই হল? হঠাৎ যদি কারও সঙ্গে দেখা হয়ে যায়? তাহলে কেলেঙ্কারির কিছু বাকি থাকবে?'

'নিশ্চয়। সে কথা একশো বার।' অরিন্দম মিলিকেই সমর্থন করল।

বিনয় বলল, 'শেষে তোর নাম করে বোঝাতেই খানিকটা নরম হল।'

'আমার নাম করে?' অরিন্দম অবাক হয়।

'হ্যাঁ, বললাম, পাকেচক্রে ব্যাপারটা এমনি দাঁড়িয়ে গেছে। নইলে অরিন্দমের কোনো দোষ নেই। অথচ এখন ওর প্রেস্টিজ রাখতে হলে এরকম একটা কিছু করতেই হবে। তাছাড়া ব্যাপারটা তো নিছক অভিনয়। ফেরিঘাটে নেমে স্বামী-স্ত্রীর মতো পাশে দাঁড়াবে। মাথায় একটু কাপড় টেনে দিলে বিয়ে-করা ছাড়া আর কিছু ভাবতেই পারবে না।'

বেয়ারা এসে টি-পটে চা, দুধ, চিনি রেখে আলমারি থেকে কাপ বের করল। ধুয়ে এনে দুজনকে চা দিল।

বিনয় একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'এখানে চা-টা ভালো। চমৎকার টেস্ট।'

চায়ে চুমুক দিয়ে অরিন্দম আড়চোখে বন্ধুর মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে নিল। কয়েক সেকেন্ড পরে হঠাৎ বলে উঠল, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

'কী ব্যাপার? তোকে যেন খুব সিরিয়াস মনে হচ্ছে।'

অরিন্দম ঈষৎ গম্ভীর গলায় বলল, 'শেষ পর্যন্ত কী ঠিক করলি?'

'ও, বুঝতে পেরেছি।' বিনয় ইচ্ছে করেই হালকা মেজাজে কথা কইল। 'তুই বোধহয় মিলির সঙ্গে আমার কী আলোচনা হবে, তাই জানতে চাইছিস্?'

'না-না, ঠিক তা নয়।' অরিন্দম নিজেকে শুধরে নিতে চেষ্টা করল। বলল, 'ছি-ছি! এটা তোদের দুজনের, মানে প্রাইভেট ব্যাপার। আমি কখনও তার মধ্যে নাক গলাতে পারি?'

বিনয় বলল, 'সবই তো জানিস্। তোর কাছে গোপন করার কোনো মানে হয় না। তাছাড়া নদী পেরিয়ে সেই গেস্ট-হাউসে তুইতো সঙ্গেই যাবি।'

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বিনয় যেন এবার ঈষৎ গম্ভীর। চোখ দুটি চিন্তায়

ক্ষুদ্র দেখাল। গালে হাত রেখে অনেকক্ষণ পরে বলল, 'তোকে বলেছিলাম না, এবার একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে।'

'হ্যাঁ, তুই বলেছিলি ওকে আর ঝুলিয়ে রাখা যাবে না।'

'ঠিক তাই। মিলি এই কারণেই আমাকে চিঠি দিয়েছিল। গুরুজির আশ্রমে রওনা হবার আগে আমার মুখ থেকে একটা ফাইনাল কথা শুনতে চায়।'

'হঠাৎ গুরুজির আশ্রমে যাচ্ছে কেন? কিছু জিজ্ঞাসা করেছিলি?'

'হ্যাঁ।' বিনয় অন্যমনস্কের মতো জবাব দিল। বলল—'আসলে গুরুজির আশ্রম ওর গন্তব্যস্থল নয়। ওখান থেকে মিলি সেই অনাথ-আশ্রমে, মানে ওর ছেলের কাছে যাবে।'

'হঠাৎ? তাছাড়া গুরুজি তো সেখানে যাওয়া পছন্দ করেন না।'

'কিন্তু না গিয়ে মিলি কি থাকতে পারবে?'

'কেন?'

সিগারেটে শেষ টান দিয়ে দগ্ধ অংশটুকু অ্যাশ-ট্রের মধ্যে গুঁজে দিয়ে বিনয় বলল, 'কেন আবার? এ হল মেয়েদের স্বাভাবিক অপত্য স্নেহের টান। দিন সাতেক আগে মিলি সেই অনাথ-আশ্রম থেকে একটা চিঠি পেয়েছে।'

'চিঠি? সেখান থেকে ওকে আবার কে চিঠি লিখল?' অরিন্দম প্রশ্ন করল।

বিনয় বলল, 'অনাথ-আশ্রমের কর্তা-ব্যক্তিরা নিশ্চয় লেখেননি। আর তাঁদের সঙ্গে মিলির কোনো যোগাযোগও নেই। তবে কয়েকবার ওই আশ্রমে যাতায়াত করে মিলি সেখানকার একটা আয়া-গোছের মেয়ের সঙ্গে আলাপ করে নিয়েছে। ছেলেটাকে একটু নজরে রাখবে বলে তাকে বছরে থোক কিছু টাকা দেবে বলে কবুল করে এসেছে। মিলির অনুরোধে সেই মেয়েটা ফি-মাসে ওকে একখানা চিঠি দেয়। তাতে ওর ছেলের খবর থাকে। সে কেমন আছে, কত বড় হয়েছে, সারাদিন কী করে, মিলিকে প্রায় সমস্ত কথা মেয়েটা বিস্তারিত ভাবে জানায়।'

'এবার যে চিঠিটা এসেছে তাতে কি কোনো নতুন খবর আছে?'

'হ্যাঁ, বিনয় মুখ গম্ভীর করে বলল, 'দিন কুড়ি পঁচিশ আগে ছেলেটা নাকি শক্ত অসুখে পড়েছিল। টাইফয়েড কিংবা এমনি কিছু হবে। অনেক ভুগে এখন অবশ্য মোটামুটি সেরে উঠেছে। কিন্তু খুব রোগা আর দুর্বল, বিছানায় শুয়ে থাকে। চিঠিটা পাবার পর থেকে ছেলেটাকে একবার চোখে দেখার জন্য মিলি অস্থির হয়ে পড়েছে। হয়তো এতদিন চলেও যেত। শুধু একটা কারণে যেতে পারেনি।'

'কী কারণ?'

'এবার সেখানে গিয়ে মিলি সত্য প্রকাশ করবে। ওই ছেলেটা যে তার আশ্রমের কর্তা-ব্যক্তিদের কাছে সে কথা আব গোপন রাখবে না।'

'বলিস্ কী? কিন্তু গুরুজি তো ওকে সেখানে যেতে নিষেধ করেছেন।'

বিনয় বাঁকা হেসে জবাব দিল, 'সেজন্যই তো অনাথ-আশ্রমে যাওয়ার আগে

গুরুজির সঙ্গে দেখা করবে। সাক্ষাতে তাঁর অনুমতি চাইবে।'

'গুরুজি যদি নিষেধ করেন?'

'মিলি হয়তো সেই নিষেধ অমান্যও করতে পারে। কারণ ছেলেটাকে আর একটা দিনও সে অনাথ-আশ্রমে ফেলে রাখতে রাজি নয়। তাই কলকাতা থেকে যাওয়ার আগে আমার কাছে পরিষ্কার জবাব চায়।'

'কী জবাব?'

'তার শর্ত স্বীকার করে তাকে বিয়ে করতে আমি রাজি কি না?'

'কিন্তু তুই তো এখনও বাড়িতে কিছু ফাঁস করিস্‌নি। আর এসব কথা জানালে বাড়ির লোক যে বিয়ে ↄ রাজি হবে না তাও বলেছিস্‌।'

বিনয় মাথার চুলে একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'মিলির প্রথম শর্ত আমার পক্ষে মেনে নেওয়া অসম্ভব।'

'সে কথা মিলিকে বলেছিস্‌?'

'না।'

'তাহলে? মিলি তো তোর কাছে একটা জবাব চায়।'

'কিন্তু কী জবাব দেব? আর আমার কী দোষ বলতে পারিস্‌? আজ বছর দুই হল ওর সঙ্গে পরিচয়। কিন্তু মিলির কলঙ্কের কথা আমি ছ-মাস আগেও জানতাম না। বিনয়কে কিঞ্চিৎ উত্তেজিত দেখাল। অভ্যেসমতো মাথার চুলে হাত বুলিয়ে সে বলল, 'তবু তো এখন আমি ব্যাপারটা জেনেছি। কিন্তু এতবড় একটা ঘটনা ওর আত্মীয়-স্বজন এমন কি মিলির মামা পর্যন্ত আজও জানে না।'

অরিন্দম বলল, 'এ সব লজ্জার কথা। বেশি জানাজানি না হওয়াই ভালো। আর মানুষের জীবনে অনেক গোপন কাহিনি থাকে। প্রয়োজন না হলে নিজের দুর্বলতার কথা কেউ কি মুখ ফুটে বলে?'

বিনয় বলল, 'তুই কী বলতে চাস্‌?'

অরিন্দম বলল, 'আমার ধারণা বিয়ের প্রস্তাব করবার আগে মিলি তার গোপন কথা নিশ্চয় তোর কাছে ফাঁস করেনি।'

'হ্যাঁ, বিনয় স্বীকার করল। বলল, 'এসব ঘটনা আগে জানাবার সত্যি হয়তো প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু আমার অবস্থাটা একবার ভেবে দ্যাখ্‌। বাড়ির লোককে এসব কথা বলা মানেই একটা বিশ্রী পরিস্থিতির সৃষ্টি। মা-বাবা কেউ বিয়েতে রাজি হবে না। তার মানেই মিলিকে পরিষ্কার জবাব দিতে হয়, তোমার শর্ত দুটো আমার পক্ষে মেনে নেওয়া অসম্ভব।'

অরিন্দম জিজ্ঞাসা করল, 'তাহলে ওকে তুই কী বলবি?'

'কাল অনেক রাত্তির পর্যন্ত ভেবে সেটা আমি ঠিক করেছি। আজ যে চাকরির ইনটারভ্যু দিতে গিয়েছিলাম, সেটা ওই একই কারণে।' বিনয় রহস্য করে হাসল।

অরিন্দম শুধলো, 'মিলিকে যা জবাব দিবি তার সঙ্গে তোর ওই চাকরির কী

সম্পর্ক?'

'আছে।' বিনয় বলল, 'একটু আগে তোকে বলেছি না মিলির প্রথম শর্তটা মেনে নেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। তবে দ্বিতীয় শর্তটা সামান্য রদ-বদল করে গ্রহণ করা চলে।'

'তার মানে বিয়ের পর ওই ছেলেকে মিলি তার নিজের কাছে এনে রাখবে?'

'না, তা ঠিক নয়।' বিনয় ব্যাখ্যা করল, 'ছেলেটার বয়স প্রায় পাঁচ বছর হল। ওকে এখন একটা ভালো স্কুলে আমি ভর্তি করে দিতে চাই। ইচ্ছে করলে ছুটিছাটায় মিলি ওকে নিজের কাছে এনে রাখতে পারে। তাতে আমার আপত্তি নেই। এটাও বোকারোতে সম্ভব হত না। কারণ মিলিকে তো ওখানে অনেকে চেনে। তাই এই দ্বিতীয় শর্তটা স্বীকার করে নিতে হলে আমাকে আরও দূরে—এই যেমন ধর্ ফরিদাবাদে গিয়ে থাকতে হবে।'

অরিন্দম এতক্ষণে বিনয়ের নতুন চাকরি খোঁজার রহস্য বুঝতে পারল। সে বলল, 'কিন্তু ধর মিলি যদি তার প্রথম শর্তটা তুলে নিতে না রাজি হয়?'

'তাহলে আর কী করবার আছে? আমার অবস্থাও তো ভেবে দেখতে হবে। শর্ত দুটো নিয়ে যদি সে অন্যায় জিদ করে তাহলে আমি নিরুপায়।' ম্লান হেসে ফের বলল,—'ইন দ্যাট কেস টু-মরো উইল বি আওয়ার লাস্ট জার্নি টুগেদার।'

কয়েক সেকেন্ড দুজনেই চুপ করে রইল।

সিগারেটে একটা টান দিয়ে বিনয় বলল, 'তাহলে কাল কোথায় আমরা মিট করছি? মিলিকে সেটা জানিয়ে দিতে হবে।'

অরিন্দম সামান্য চিন্তা করে বলল, 'কাল সকাল আটটায় চলে আয়। গাড়ি নিয়ে মেট্রোর কাছে দাঁড়িয়ে থাকব।'

'ঠিক আছে। দেন ইট ইজ ফাইন্যাল।' বিনয় উঠে দাঁড়াল।

অরিন্দম বলল, 'মিলিকে টেলিফোন করবি না?'

'এখন নয়।' বিনয় মাথা নাড়ল, 'বেলা চারটের পর মিলি টেলিফোন করতে বলেছে। ইউ নিড নট ওরি। আমি ঠিক জানিয়ে দেব।'

ছয়

বিনয় চলে যাবার কিছুক্ষণ পরেই টেলিফোনটা ঝনঝন করে বেজে উঠল।

রিসিভার তুলে অরিন্দম শুধলো, 'হ্যালো, কে বলছেন?'

অপর প্রান্ত থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, 'আমি সতীন্দ্র বিশ্বাস। ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট থেকে কথা বলছি। আপনি মিঃ সেন?'

'হ্যাঁ, অরিন্দম জবাব দিল।

'চিনতে পারছেন?'

অচেনা গলা। তবু ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিটের নাম শুনেই তার সন্দেহ হল। নিশ্চয় সেই ল-ইয়ার ভদ্রলোক। ইন্দ্রাণীর সঙ্গে তার ডিভোর্সের মামলা যে রুজু করেছে।

অরিন্দম বলল, 'আপনি তো উকিলবাবু, আমাদের কেসটা ফাইল করেছেন, তাই না?'

'হ্যাঁ। তাহলে তো চিনতে পেরেছেন।'

অরিন্দম জিজ্ঞাসা করল, 'কেসের তারিখ পড়েছে বুঝি?'

'না।' ভদ্রলোক কেমন ঠান্ডা গলায় জবাব দিল, 'আপনাদের মামলা খাবিজ হয়ে যাবে।'

'কেন?' অরিন্দম প্রশ্ন করল, 'কারণটা বলবেন?'

'নিশ্চয় বলব, কিন্তু টেলিফোনে তো বলা সম্ভব নয়।'

'তাহলে?'

'আজ সন্ধেয় কি আপনি বাড়িতে থাকছেন?'

'হ্যাঁ, থাকতে পারি।' অরিন্দম ছোট্ট উত্তর দিল।

ভদ্রলোক তেমনি ঠান্ডা গলায় বলল, 'তাহলে রাত আটটা নাগাদ আপনার ওখানে আসছি। কাইন্ডলি অপেক্ষা করবেন।'

ভদ্রলোক লাইনটা ছেড়ে দেবার পর অরিন্দম গালে হাত রেখে আকাশ-পাতাল চিন্তা শুরু করল। হঠাৎ উকিলবাবু তার সঙ্গে বাড়িতে দেখা করতে আসছে কেন? ভদ্রলোক কেমন নিস্পৃহ গলায় বলল, মামলা নাকি খারিজ হয়ে যাবে। অথচ এই তো মাস দুই আগে উকিলবাবুর চেম্বারে গিয়ে সে কাগজপত্রে সইসাবুদ করে এল। এমন কি তার শ্বশুর যা বলেছিলেন, অর্থাৎ গত এক বৎসর তাদের স্বামী-স্ত্রীর

মধ্যে কোনো দাম্পত্য সম্পর্ক ছিল না, তেমন কথাও সে হলফনামায় কবুল করে এসেছে। তাহলে মামলা খারিজ হবার প্রশ্ন উঠছে কেন?

উকিল ভদ্রলোক এসে পৌঁছোল রাত সাড়ে আটটা নাগাদ। ঘরে ঢুকেই বলল, 'একটু দেরি হয়ে গেল মিঃ সেন। সন্ধের মুখে উলুবেড়িয়া থেকে একজন ক্লায়েন্ট এসে হাজির। তার সঙ্গে মামলার দুটো কথা বলতে গিয়ে দেরি।'

অরিন্দম জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, ব্যাপারটা কী হল বলুন তো? কেস খারিজ হয়ে যাবে কেন?'

সতীন্দ্রবাবু ভারি গলায় জবাব দিল, 'ইতিমধ্যে যে একটা ঘটনা হয়ে গেছে মিঃ সেন।'

'—ঘটনা?'

'—হ্যাঁ, ইট ইজ এ স্যাড কেস। আর সেই কথা আপনাকে জানাতে শেষ পর্যন্ত আমাকে আসতে হল।'

অরিন্দম খুব ব্যগ্র হয়ে শুধলো, 'কী হয়েছে বলুন না?'

উকিলবাবু ঠান্ডা গলায় ধীরে ধীরে বলল, 'আপনার স্ত্রী, মানে ইন্দ্রাণী দেবী পরশু রাত্তিরে বেশি মাত্রায় স্লিপিং পিল খেয়ে সুইসাইড করেছেন।'

'সুইসাইড?'

'ইয়েস, শি ওয়াজ ক্যারিং। আর এর মূলে দ্যাট স্কাউন্ড্রেল হীরক সোম।'

অরিন্দম দুঃখের সঙ্গে বলল, 'শেষ পর্যন্ত ইন্দ্রাণী আত্মহত্যা করল?'

উকিলবাবু বলল, 'মনে হয় উনি খুব আঘাত পেয়েছিলেন। ঠিক এরকম একটা পরিস্থিতির জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। তাই লোকলজ্জা এড়াতে নিজেই সকলের কাছে মুক্তি নিয়ে চলে গেলেন।'

ইতিমধ্যে কাজের ছেলেটি এসে টেবিলের ওপর দু-কাপ চা রেখে গেল। উকিলবাবুর হাতে একটা পেয়ালা তুলে দিয়ে অরিন্দম বলল, 'কিন্তু আমি জানতাম ডিভোর্সের পর ওদের রেজেস্ট্রি করে বিয়ে হবে। তাই ডিভোর্সের ব্যাপারটা যাতে তাড়াতাড়ি নিস্পত্তি হয়, সেজন্য আপনারা যা বলেছেন তাতেই সইসাবুদ করে দিয়েছি।'

উকিলবাবু বলল, 'না-না। আপনার দিক থেকে সহযোগিতার কোনো অভাব ছিল না। কিন্তু ব্যাপারটা যে অন্যরকম দাঁড়িয়ে গেল। দেহের পরিবর্তনের কথা ইন্দ্রাণী দেবী অবশ্য জানতেন। তবে মা-বাবা কিংবা অন্য কারো কাছে তা বলেননি। হীরক নাকি তাকে বলতে নিষেধ করেছিল। তারপর হঠাৎ কাউকে কিছু না বলে দ্যাট স্কাউন্ড্রেল একদিন পলাতক।'

'পলাতক?'

'ইয়েস। হি ফ্লু ব্যাক টু আমেরিকা।'

অরিন্দম খুব অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ইন্দ্রাণীকে ফেলে হীরক একাই আমেরিকা চলে গেল?'

'ঠিক তাই।' উকিলবাবু যেন একটা জ্যামিতিক স্বতঃসিদ্ধের কথা বোঝাল, এরকমই হয়। ইন্দ্রাণী দেবী ঠিক মানুষ চিনতে পাবেননি। আর সেই ভুলের মাশুল তাঁকে দিতে হল। অবশ্য মিঃ গুপ্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার করে ফেলতে চেয়েছিলেন। মানে জানাশুনো একটা নার্সিং হোমে ছোটখাট একটা অপারেশন। প্রথমে ইন্দ্রাণী দেবী নাকি রাজিও ছিলেন। শেষে মনে হয় শি কুড নট কাম টু এ কমপ্রোমাইজ।'

উকিলবাবু উঠে দাঁড়াল। বলল, 'এটা একটা পুলিশ কেস এবং নিশ্চয় আপনাকেও টানাটানি করত। তবে মিঃ গুপ্ত হ্যাজ ইনফ্লুয়েন্স। তাছাড়া কোর্টের কাছে দুজনেই স্বীকার করেছেন যে গত এক বৎসর আপনাদের মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক ছিল না। তাই আপনার কাছে আর পুলিশ আসেনি।'

অরিন্দম জিজ্ঞাসা করল, 'ইন্দ্রাণীর বাবা বোধহয় খুব দুঃখ পেয়েছেন?'

'অবশ্য। ওঁরা দুজনেই প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছেন। শুনেছি আজ রাত্তিরের ট্রেনে স্বামী-স্ত্রী বৃন্দাবন চলে যাবেন।'

হঠাৎ তার মুখের দিকে তাকিয়ে উকিলবাবুর কী যেন মনে পড়ল। বলল, 'ও ইয়েস, মিঃ গুপ্ত আপনাকে একটা চিঠি দিয়েছেন।' পকেট থেকে একটা বন্ধ খাম বের করে উকিলবাবু তার দিকে এগিয়ে দিল।

চিঠিখানা হাতে নিয়ে অরিন্দম বলল, 'ডিভোর্সের কেসটা— ?'

'মাথা নেই, তার আবার মাথাব্যথা?' এত দুঃখেও উকিলবাবু হাসল। বলল, 'কার সঙ্গে আর ডিভোর্স করবেন? সে তো চলে গেল।'

ঘরের দরজা বন্ধ করে অরিন্দম শ্বশুরের চিঠিখানা খুলল। ছোট্ট চিঠি,

বাবা অরিন্দম,

এই পৃথিবী ছাড়িয়ে অনেক উপরে আর এক আদালত থেকে ডিভোর্সের ডিক্রি নিয়ে ইন্দ্রাণী চলে গেল। আমরা অনেক চেষ্টা করেছিলাম ওকে বোঝাবার। প্রথমে রাজিও ছিল, কিন্তু মেয়েদের মন ঝাড়লণ্ঠনের কাচের মতো। তাতে রামধনুর রং দেখা যায়, কিন্তু একবার ভেঙে গেলে আর জোড়া লাগে না।

একটা ইতর লোকের অসৎ আচরণের জন্য ইন্দ্রাণী বোধহয় জীবনের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল। তাই আর কমপ্রোমাইজ করতে রাজি হল না।

হ্যাঁ, একটা কথা—ইন্দ্রাণী তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে গেছে। মৃত্যুর আগে ওর মাকে তাই বলেছিল।

আমাদের জন্য তুমিও অনেক দুঃখ পেলে। আশীর্বাদ করি, আবার বিয়ে-থা করে জীবনে সুখী হও।

ইতি

হতভাগ্য—

আটটা বাজবার মিনিট পাঁচ আগেই বিনয় এসে হাজির। তার পরনে পাতলুন, গায়ে গিলে করা ধবধবে সাদা আদ্দির পাঞ্জাবি। পায়ে চটি, কাঁধে একটি সুদৃশ্য ঝোলা, তাতে নিশ্চয় কয়েক প্যাকেট সিগারেট, দেশলাই, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আছে। অরিন্দম পৌনে আটটা নাগাদ গাড়ি নিয়ে পৌঁছে গেছে। সকালে ভিড়ভাড় কম। পথে-ঘাটে লোকজন এখনও তেমন বেরোয়নি। বিনয়কে দেখে সে জিজ্ঞাসা করল, 'কই রে, তোর গার্ল-ফ্রেন্ড তো এল না?'

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে বিনয় ধূমপানের আয়োজন করল। হেসে বলল, 'তুই বোধহয় কখনও মেয়েদের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করিস্‌নি?'

'তার মানে?'

অরিন্দমকে একটা সিগারেট এগিয়ে দিয়ে বিনয় জবাব দিল, 'মানে অতি সহজ। তোর জানা উচিত ছিল মেয়েরা কখনও টাইম রাখতে পারে না। কিংবা ইচ্ছে করে রাখে না। আসলে মেয়েরা নিজেদের মূল্যবান ভাবে। টাইমে এলে তো চিপ হয়ে গেল।'

অরিন্দম তবু বলল, 'কিন্তু ধর্‌ শেষ পর্যন্ত মিলি যদি মত পালটায়। মানে বিবাহিতা সেজে যেতে রাজি না হয়।'

বিনয় সিগারেট মুখ থেকে সরিয়ে জিভের সাহায্যে চুকচুক করে একটা আপসোসের ধ্বনি তুলল। বলল, 'বেচারা! মিলি বউ সাজবে না ভেবে একেবারে মুষড়ে পড়েছে।'

'কী যা-তা বকছিস্‌? দু-দিন বাদে তাকে বিয়ে করবি।' অরিন্দম রাগ করে বলল, 'ওকে আমার স্ত্রী সাজিয়ে নিয়ে যাওয়াই তোর অন্যায় হচ্ছে।'

'কী করব বল্‌?' বিনয় কেমন নাটকীয় ভঙ্গিতে জবাব দিল, 'দেয়ার ইজ নো ওয়ে আউট। কোনো মেয়ে তোর বউ না সাজলে এমন সুন্দর একটা প্লেজার-ট্রিপ মাঠে মারা যেত। তাছাড়া মিলি তো আপত্তি করেনি। ও ব্যাপারটা বুঝেছে।'

চৌরঙ্গি রোড পেরিয়ে মিলিকে আসতে দেখা গেল। বিনয় বলল, 'ওই দ্যাখ্‌, এসে গেছে। এখন দুর্ভাবনা ঘুচল তো?'

কাছে এসে মিলি এক পলক হাতঘড়ির দিকে তাকাল। বলল, 'একটু দেরি হয়ে গেল। মিনিবাসটা রাস্তার মধ্যে হঠাৎ খারাপ। তাই ওটা ছেড়ে দিয়ে আবার অন্য একটা ধরে এসেছি।'

মিলির দিকে এক নজর তাকিয়ে অরিন্দম কী যেন খুঁটিয়ে লক্ষ করছিল। না, বেশবাস তো ঠিক সধবা মেয়ের মতো। এমন কি বাঁ হাতে একটা লোহা পরে এসেছে। আভরণ বলতে হাতে বালা, কানে দুল। আজকাল পথেঘাটে সোনার হার কেউ পরে না। তাই গলায় একটা পুঁথির মালা। তাতেই দিব্যি সুন্দর লাগছে। কিন্তু সিঁথিতে এয়োতির চিহ্ন? অরিন্দম ভ্রূ কুঁচকে রইল।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে বিনয় ঠোঁট টিপে হাসছিল। কয়েক সেকেন্ড পরে সে বলল, 'তোর দুশ্চিন্তা দেখছি এখনও যায়নি।'

'তার মানে?' অরিন্দম ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করল।

'চিন্তা ছাড়।' বিনয় হেসে জবাব দিল, 'যেটা খুঁজছিস্, ফেরিঘাটে পৌঁছে ঠিক দেখতে পাবি। তাছাড়া পাঁচজনের সামনে মিলি কখনও তোকে অপদস্থ করবে না।'

কথাটি অর্থবহ, এর মধ্যে যে একটি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রয়েছে তা বুঝতে পেরে মিলি প্রশ্ন করল, 'ওমা! আমি কেন অরিন্দমবাবুকে অপদস্থ করতে যাব?'

বিনয় বলল, 'এতক্ষণ ও খুব চিন্তায় ছিল। শেষ পর্যন্ত যদি তুমি না আসো—'

'বারে! আসব না কেন?'

'না, মানে অরিন্দম বলছিল তুমি যদি বিবাহিতা সাজতে রাজি না হও। এখন আবার দেখছে সিঁথিতে সিঁদুর নেই।'

কথার অর্থ বুঝতে পেরে মিলি আলতো হাসল। বলল, 'মিনিবাসে এলাম তো। তাই সিঁদুর পরে উঠতে লজ্জা করছিল। যদি হঠাৎ কারও সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। তবে ফেরিঘাটে পৌঁছবার আগে ঠিক পরে নেব। ও নিয়ে ভাববেন না।'

গাড়ি ছুটে চলল। এখনও সওয়া আটটা বাজেনি। পথঘাট বেশ ফাঁকা। ব্রেবোর্ন রোড ধরে গাড়ি ফ্লাই-ওভারে উঠে হাওড়া পোলের দিকে এগোল। পিছনের সিটে তিনজনে বসেছিল। অরিন্দম প্রথমে সামনে ড্রাইভারের পাশের সিটটা দখল করতে চাইল। কিন্তু বিনয় তাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে এল। বলল, 'পাগল নাকি? গাড়িটা এখন তোর, ড্রাইভারের পাশে কেন বসতে যাবি?'

জানলার ধারে মিলি, মাঝখানে বিনয় আর একপাশে অরিন্দম। সিগারেট না খেয়ে বিনয় থাকতে পারে না। আড়চোখে মিলির দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি যদি পারমিশন দাও ম্যাম, তাহলে একটা ধরাই।'

মিলি খুব গম্ভীর করে জবাব দিল. 'এই তো ঘণ্টাখানেক রাস্তা। এটুকু পথ সিগারেট না খেলে চলছে না?'

'প্লিজ', বিনয় প্রায় মিনতি করল, 'এক ঘণ্টা ধোঁয়া না পেটে গেলে আমার খুব আনইজি লাগবে।'

'দিন দিন তুমি একটা চেন-স্মোকার হয়ে উঠছ।' মিলি মন্তব্য করল।

নিজে একটা সিগারেট নিয়ে বিনয় প্যাকেটটা অরিন্দমের দিকে এগিয়ে দিল। কিন্তু অরিন্দম তাকে প্রত্যাখ্যান করল। বলল, 'থাক এখন, পরে হবে।'

বিনয় হাসল। মিলিকে বলল, 'দেখছ, তুমি পারমিশন দিতে চাইলে না, তাই অরিন্দম সিগারেট রিফিউজ করল।'

মিলি আড়চোখে একবার অরিন্দমকে দেখে নিয়ে বলল, 'না-না। আমার কোনো আপত্তি নেই। আপনারা ফ্রিলি স্মোক করুন।'

অরিন্দম হেসে জবাব দিল, 'আপনি ব্যস্ত হবেন না। বিনয় আজ খুব মুডে আছে, তাই যা খুশি বলছে। আসলে আমি ক্যাজুয়েল স্মোকার। সিগারেট খাই, আবার না খেলেও অসুবিধা নেই।'

বিনয় কোনো মন্তব্য না করে সিগারেট ধরাল। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে জানাল, 'গাড়িটা বরং থামাতে বল্। আমি একটা সাইডে বসি। তুই মাঝখানে আয়। তাহলে ধোঁয়াটা বাইর চলে যাবে, মিলির অসুবিধে হবে না।'

অরিন্দম সঙ্কোচের সঙ্গে বলল, 'আমি মাঝখানে বসব?'

'হোয়াট নট?' বিনয় যেন পালটা প্রশ্ন করল। তারপর ওর কানের কাছে মুখ নামিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল, 'এখন ওর পাশে তোর বসার অধিকার। বরং আমি একজন ট্রেসপাসার, বুঝলি?'

অরিন্দম দাঁত চেপে ফিসফিস করে জবাব দিল, 'চুপ কর্। কী যা-তা বকছিস্।'

গাড়ি বেগে ছুটছিল। অরিন্দম আর ড্রাইভারকে থামাতে বলল না। আন্দুল পেরিয়ে গাড়ি এখন মুক্ত প্রকৃতির মধ্য দিয়ে চলেছে। দুপাশে মাঠ কোথাও কাছ দিয়ে গেছে রেলের লাইন। যাত্রীবোঝাই লোকাল ট্রেন। শিকারী জন্তুর লক্ষ্যবস্তুর দিকে তাক করাব মতো পরবর্তী স্টেশনের পথে দ্রুতগতিতে ধাবমান।

আশ্বিনের মাঝামাঝি। কলকাতার বাইরে এলে বোঝা যায় এটা শরৎকাল। খালবিল জলে টইটম্বুর। মাঠে অজস্র সাদা কাশফুল। বিগ্রহের অঙ্গে চামরের হাওয়ার মতো প্রকৃতির বুকে দুলছে। আকাশে জলহীন মেঘ মহাসমুদ্রের মধ্যিখানে নিঃসঙ্গ এক নাবিকেব মতো অজানা কোনো দেশের উদ্দেশে পাড়ি দিয়েছে।

ফেরিঘাটে পৌঁছে অরিন্দম ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল প্রায় পৌনে দশটা বাজে। হাইওয়ে থেকে নেমে বাঁ দিকে খানিকটা যেতে হল। গাড়ি গিয়ে থামতেই দুজন লোক তাদের দিকে এগিয়ে এল। একজন প্যান্ট-শার্ট পরা। প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স। কাঁচা-পাকা একমাথা চুল। অন্যজন আরো সাধারণ। পরনে ধুতি, গায়ে রংচটা একটা হাফহাতা জামা। সম্ভবত কোনো অধস্তন কর্মচারী। প্যান্ট-শার্ট পরা লোকটি জিজ্ঞাসা করল, 'অরিন্দমবাবু কার নাম?'

'আমার।' অরিন্দম গাড়ি থেকে নেমে জবাব দিল।

লোকটি হাত তুলে নমস্কার জানাল। বলল, 'গতকাল সকালে খবর পেলাম, আপনারা স্বামী-স্ত্রী এবং আরও কেউ সঙ্গে আসছেন। গেস্ট-হাউসে থাকবেন, বিকেলের দিকে হয়তো ফিরে যেতে পারেন।'

অরিন্দম বলল, 'আমরা তিনজনে এসেছি। পূরণমলজি তাহলে খবর পাঠাতে ভুল করেননি।'

'আরি বাস! কী যে বলেন'—লোকটি জিভ কেটে যেন ক্ষমা প্রার্থনা করে নিল। বলল, 'এতকাল তো এদের সঙ্গে আছি। পূরণমলজির কখনও ভুলচুক হতে দেখিনি।'

ইতিমধ্যে বিনয় আর মিলি গাড়ি থেকে নেমেছে। লোকটি এক পলক মিলির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ইনি তো আপনার মিসেস?'

'হ্যাঁ, মানে'—অরিন্দম ঢোক গিলে বলল, 'আর এ হল আমার বন্ধু বিনয়, বিনয় বসু।'

মিলি অকস্মাৎ তার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। বেশ অন্তরঙ্গ সুরে বলল, 'এখানে সময় নষ্ট করে কোনো লাভ আছে? চলো, ওপারে যাই—'

লোকটি তাড়াতাড়ি বলল, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়। লঞ্চ তো ঘাটে রেডি আছে। আর এখানে চা-খাবার সব অতি বাজে। আপনারা মুখে দিতে পারবেন না। বরং গেস্ট-হাউসে চলুন, ওখানে সব তৈরি রেখেছে।'

মিলির দিকে এতক্ষণ সে ভালো করে তাকায়নি। কেমন লজ্জা করছিল। হঠাৎ ওর সিঁথির দিকে নজর পড়তেই অরিন্দম শুধু আশ্বস্ত নয়, বেশ আশ্চর্য হল। কখন এক ফাঁকে মিলি সীমন্তে একটু সিঁদুর ছুঁইয়ে নিয়েছে, সে টেরও পায়নি। এখন তাকে বউ ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। এজন্যই মিলি বোধহয় এই নিয়ে তাকে ভাবনা করতে নিষেধ করেছিল।

লঞ্চে ওঠার আগে বিনয় তাকে চিমটি কেটে বলল, 'অমন আড়ষ্টভাবে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? দু-একটা কথা বলতে হবে তো। স্বামী-স্ত্রী এক ঘরে থাকে, এক বিছানায় শোয়, এক সাথে ওঠে, বসে। তাদের মধ্যে সহজ সম্পর্ক না হলে লোকে সন্দেহ করবে।'

অরিন্দম জবাব দিল, 'মানে আমার কেমন অস্বস্তি লাগছে, বুঝলি?'

'ইডিয়ট।' বিনয় দাঁত চেপে অনুচ্চ কণ্ঠে তাকে গালাগালি দিল। বলল, 'মনে রাখবি, এখানে তোরা হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ। বউকে নিয়ে বেড়াতে এসেছিস। তার সঙ্গে একটু হাসি-ঠাট্টা, ফস্টি-নস্টি না করলে এই লোকগুলো মিলির সঙ্গে তোর সত্যিকার সম্পর্কটা ধরে ফেলবে।'

অরিন্দম বলল, 'কিন্তু আমার যে ঠিক হচ্ছে না। জিভে কেমন আটকে যাচ্ছে।'

'আরে হবে, হবে। নইলে এখন উপায় নেই।' বিনয় স্পষ্ট জানায়, 'তোকে দেখছি মিলির সঙ্গে দু-একবার রিহার্সাল দিলে ভালো হত।'

সেই তুলনায় মিলি কিন্তু অনেক সহজ, সাবলীল। অরিন্দমের আনাড়িপনাটুকু সে তার কুশলী অভিনয় নৈপুণ্যে যতটা সম্ভব ঢেকে দিতে চেষ্টা করছিল। জেটি থেকে লঞ্চে ওঠার আগে সে অনায়াসে অরিন্দমের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'ওগো, আমাকে ধরো। নইলে পড়ে যেতে পারি।'

পিছন থেকে বিনয় তাকে সতর্ক করল, 'এই, বৌদির হাতটা ধরে লঞ্চে তোল, আবার পা ফস্কে একটু এদিক-ওদিক হলে একেবারে জলের তলায়। আর চিহ্নটি পাওয়া যাবে না।'

গেস্ট-হাউসের সেই লোকটি জানাল, 'না, তেমন কোনো ভয় নেই। তবে

সাবধান হলে ভালো।'

ছোট লঞ্চ। যাত্রী শুধু তারা কজন। মিলি আর অরিন্দম লঞ্চের ছাদে পাশাপাশি বসল। খানিকটা পিছনে বিনয়। আশ্বিনের ভরা নদী। দূরে পাঁচ-সাতটা ইলিশের নৌকো ইতস্তত ভেসে বেড়াচ্ছে। মাথার ওপর নীল আকাশ, তীর ছেড়ে লঞ্চ মাঝনদীতে এসে কোনাকুনি যেতে শুরু করল। একটা আয়তক্ষেত্রের কর্ণ বরাবর প্রায় মিনিট দশ-বারো গিয়ে ফের একটা ছোট জেটিতে ভিড়ল।

এদিকটা বেশ নির্জন। বর্ষার জল হাওয়ায় গাছপালা প্রবর্ধমান জীবনের লাবণ্যে সতেজে বেড়ে উঠেছে। ঘন বনের ভিতর থেকে কী একটা পাখি কুক্ কুক্ করে একটানা ডেকে চলেছে। দূরে মোহানার দিকে রূপনারায়ণের ধোঁয়া ধোঁয়া রেখা। নদীর জলে শরতের রুপোলি রোদ্দুর পড়ে অনেকখানি জায়গা কেমন উজ্জ্বল চকচকে দেখাচ্ছে।

জেটি ছেড়ে তিনজনে পাড়ে এসে উঠল। মিলি হঠাৎ খুশির সুরে বলে উঠল, 'বাঃ! কী সুন্দর জায়গাটা!' বিনয়কে লক্ষ্য করে শুধলো, 'কী, আপনার ভালো লাগছে না?'

'বিউটিফুল লাগছে', বিনয় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে মিলিকে বলল, 'তবে বৌদি, এর জন্য ধন্যবাদ আপনার হাজব্যান্ডের পাওনা। বরং তাকে একটা থ্যাংকস দিন।' মুচকি হেসে মন্তব্য করল, 'এ অভাজন শুধু নিমন্ত্রিত অতিথি। কৃতজ্ঞতা ছাড়া তার কিছু বলার নেই।'

গেস্ট-হাউসটা কাছেই—ঠিক নদীর ওপরে। পাড় থেকে সামান্য উঁচুতে। পুরনো আমলের বাড়ি। তিনখানা লিভিং রুম, এ ছাড়া লাউঞ্জ, ডাইনিং স্পেস, সব যেমন থাকে। বাইরে ছোট্ট একটু বাগান। সেখানে দাঁড়ালে রূপনারায়ণের বিস্তীর্ণ অংশ চোখে পড়ে।

তাদের একটা ঘরে বিশ্রাম করতে বলে সেই লোকটি চলে গেল। সম্ভবত প্রাতরাশের আয়োজন করতে। মিলি এগিয়ে এসে বলল, 'সত্যি অরিন্দমবাবু, জায়গাটা ভারি সুন্দর। এত বিউটিফুল ট্রিপ হবে, আমি কিন্তু আগে ভাবতে পারিনি।'

'উঁহু। এখানে ওই অরিন্দমবাবু বলা চলবে না। বিনয় চাপা গলায় কথা কইল, 'সকলের সামনে কখন মুখ ফস্কে বেরিয়ে যাবে, তারপর কী কেলেঙ্কারি হবে বুঝতে পারছ?'

ঠিক তখুনি সেই লোকটি ফের এসে ঘরে ঢুকল। বলল, 'ব্রেক ফাস্ট রেডি। মুখ-হাত ধুয়ে চলে আসুন। আমি লাউঞ্জে অপেক্ষা করছি।'

সে বেরিয়ে যেতেই অরিন্দম বিরক্তির সঙ্গে বলল, 'লোকটাকে তাড়াতাড়ি বিদেয় করে দিতে হবে। এখানে আমাদের সঙ্গে ওর থাকার প্রয়োজন কী?'

বিনয় অনুত্তেজিত কণ্ঠে জানাল, 'মিথ্যে ওর ওপর রাগ করছিস্। গেস্টকে

অ্যাটেন্ড করতে নিশ্চয় ওকে বলা আছে। তাই এত খিদমদগারি করছে।'

একরাশ ব্রেকফাস্ট, টোস্ট, জ্যাম-জেলি, ডিমের ওমলেট, সন্দেশ, গরম চা। অরিন্দম আর বিনয় দুজনেরই খিদে পেয়েছিল। পেটে খাবার পড়তেই উভয়ের খুশির মেজাজ ফিরে এল। মিলি ডিম খেল না, সে আরও এক কাপ চা চেয়ে নিল।

বাইরে লাউঞ্জে এসে তিনজনে বসল। সামনে কুলকুল ধ্বনি তুলে রূপনারায়ণ বয়ে চলেছে। বাগানে রঙ্গন ফুলের অনেক গাছ। নদীতে একটা পালতোলা নৌকো বিচিত্র চিত্রপটের সৃষ্টি করে উজানে ভেসে যাচ্ছে।

গেস্ট-হাউসের সেই লোকটি ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতেই অরিন্দম বলল, 'আপনাকে মিছিমিছি আর কষ্ট দেব না, বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম করুন। বরং বিকেলের দিকে একবার আসবেন। লঞ্চে করে আমাদের ওপারে ছেড়ে দিলেই যথেষ্ট হবে।'

'বিলক্ষণ। সে আবার বলতে হয়।' লোকটি রীতিমতো বিনয় দেখাল, 'পুরণমলজী লিখে পাঠিয়েছেন, আপনাদের যেন কোনো অসুবিধে না হয়।'

'না-না। অসুবিধে কীসের? আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে বিশ্রাম করুন অরিন্দম বলল, 'কলকাতায় ফিরে আপনার আতিথেয়তার কথা পূরণমলজিকে নিশ্চয় বলব।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও লোকটি এবার যেতে রাজি হল। বলল, 'বেশ তাহলে এখন আপনারা গল্পগুজব করুন। আমি কিন্তু একটা নাগাদ একবার আসছি। লাঞ্চের সময় আমাকে এখানে হাজির থাকতেই হবে।'

অগত্যা তাই সই। লোকটা চলে যেতেই বিনয় হেসে উঠল। বলল, 'ওর কিন্তু যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না। তুই একরকম তাড়িয়ে দিলি।'

'বেশ করেছি।' অরিন্দম নিজেকে সমর্থন করল। ঈষৎ গম্ভীর মুখে বলল, 'লোকটাকে আমি স্ট্যান্ড করতে পারছিলাম না। কেমন পিটপিট করে মুখের দিকে তাকাচ্ছিল।'

বিনয় আবার হেসে উঠল। বলল, 'তোর বিরক্তি অবশ্য অন্য কারণে এসব ব্যাপারে তুই নার্ভাস কি না, তাই এমন আনইজি লাগছে। নইলে এখানে এসে অবধি তোর বউয়ের সঙ্গে একটাও কথা বলিস নি। ব্যাপারটা আমার চোখেই কেমন দৃষ্টিকটু ঠেকছে।'

'মিলি আড়চোখে একবার বিনয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার দিক থেকে কোনো ত্রুটি আছে?'

'নো ম্যাম্। অভিনয়ে এতটুকু খুঁত নেই। তাছাড়া অরিন্দমের সঙ্গে তোমার বেশ ভালো ম্যাচ হয়েছে।' বিনয় কথার ফাঁকে সামান্য টিপ্পনি কাটল, 'সম্ভবত সেজন্যই লোকটা এখনও সন্দেহ করতে পারেনি। নইলে এরা সব চালু মাল। গেস্টহাউসে মেয়েমানুষের কারবার অনেক দেখেছে। এক নজর তাকিয়ে ঠিক ধরে ফেলত।'

অরিন্দম বলল, 'চল্, নদীর ধারে একটু বেড়িয়ে আসি।'

তিনজনে হাঁটতে লাগল। গেস্ট-হাউসের পাশ দিয়ে হাত দেড়েক চওড়া একটা বাঁধানো রাস্তা বহুদূরে চলে গেছে। কাছেই অনেক নারিকেল গাছ। বাড়িঘর দু-একটা চোখে পড়ে। কয়েকজন সাধারণ গ্রাম্য মানুষ এই পথ ধরে হেঁটে যাচ্ছে।

মিলি খুশিতে ডগমগ। তাদের পিছনে রেখে ছেলেমানুষের মতো খানিকটা এগিয়ে জোরে পা ফেলে হাঁটতে লাগল সে। পিছন থেকে বিনয় পরিহাস করল, 'সাবধান, বনের বাঘ এসে যদি রাস্তা আগলে সামনে দাঁড়ায়, তাহলে আমরা কিন্তু ফেলে পালাব।'

মুখ ফিরিয়ে সহাস্যে মিলি জবাব দিল, 'সে জানি। তোমার মতো বীরপুরুষের কাছে এর বেশি আশা করি না।'

অরিন্দম জিজ্ঞাসা করল, 'হ্যারে, মিলির সঙ্গে কখন কথা বলবি?'

'হ্যাঁ, কথা তো বলতেই হবে। সেজন্যই যখন আসা।' বিনয় কেমন একটা নেতিবাচক ভঙ্গি করল। কয়েক সেকেন্ড পরে নিজেই বলল, 'দুপুরে খাওয়ার পর ভাবছি শুরু করব।'

বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে অরিন্দম বুঝতে পারছিল, এই আলোচনার ব্যাপারে সে কতখানি অনাগ্রহী। কিংবা এই কথাবার্তার ফলাফল যা হবে তা যেন আগেই তার জানা হয়ে গেছে।

গেস্ট-হাউসে ফিরতেই বাবুর্চি ড্রিংকসের কথা জিজ্ঞাসা করল। বিনয় খোঁজ করল, 'হুইস্কি আছে?'

বাবুর্চি ঘাড় হেলিয়ে সায় দিল।

অরিন্দম বলল, 'সাতসকালে হুইস্কি? বরং দুটো বিয়ার দিতে বলি?' মিলির দিকে তাকাতেই সে জবাব দিল, 'আমার জন্য শুধু কোল্ড ড্রিংকস।'

মিনিট চার-পাঁচ পরেই টেবিলে বিয়ারের বোতল, পট্যাটো চিপস্, দুটি বিয়ার গ্লাস বাবুর্চি এনে রাখল। মিলির জন্য কোল্ড ড্রিংকস। বিয়ার বোতলের ছিপি খুলে গ্লাস পরিপূর্ণ করে সে পানীয় ঢেলে দিল। তারপর কোল্ড ড্রিংকসের বোতলের মুখে একটা স্ট্র রেখে মিলির দিকে সেটা এগিয়ে দিল।

বিনয় বলল, 'এদের অ্যারেঞ্জমেন্ট বেশ ভালো। বোধহয় প্রায়ই গেস্ট আসে।'

জিজ্ঞাসা করতে বাবুর্চি জবাব দিল, 'চার-পাঁচটা কোম্পানি থেকে গেস্ট পাঠায়। তারপর ডিরেক্টরদের আসা-যাওয়া লেগে আছে। তাছাড়া গত মাসে একটা ফিল্ম কোম্পানি এসে এখানে শুটিং করে গেছে। তিন দিন ধরে তারা এই গেস্ট-হাউসে ছিল।'

'ওমা, তাই নাকি?' কোল্ড ড্রিংকসের বোতলটা মুখ থেকে সরিয়ে মিলি জিজ্ঞাসা করল।

বাবুর্চি উৎসাহের সঙ্গে জানাল, 'আজ্ঞে হাঁ মেমসাব, এই লাউঞ্জেই তো হিরো

আর হিরোইনের একটা গানের মিন তুলেছে।'

'তা জায়গাটা শুটিং স্পট নিশ্চয় হতে পারে।' মিলি স্বীকার করল, বিনয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই ধরো, নায়ক-নায়িকা হঠাৎ একদিন এখানে ছুটি কাটাতে এল।'

বিয়ার গ্লাস থেকে মুখ তুলে বিনয় মুচকি হেসে বলল, 'যেমন ধরো আমরা এসেছি।'

মিলি আর কথা বাড়াল না। কোল্ড ড্রিংকস শেষ হতেই সে লাউঞ্জ থেকে উঠে ঘরের ভিতর চলে গেল।

অরিন্দম ধীরে ধীরে সিপ করছিল। বিনয় একপাত্র শেষ করে বোতল থেকে বাকি পানীয়টুকু ঢেলে নিল। গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে সে বলল, 'লাঞ্চের সময় ওই লোকটা কিন্তু আবার আসবে।'

'হুঁ, তাই তো বলে গেল।' অরিন্দম মুখ না তুলে জবাব দিল।

বিনয় বলল, 'ডিনার টেবিলে বসে মিলির সঙ্গে দুটো হাসি-ঠাট্টা করবি। ওকে এড়িয়ে যাবার মতলব করিস্ নে। তাহলে ওই কেয়ার-টেকার লোকটা এবার নির্ঘাত সন্দেহ করবে।'

অরিন্দম কোনো কথা না বলে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

বিনয় ফের বলল, 'সত্যি, মিলির সামনে তুই এমন একটা ভাব দেখাচ্ছিস্ যেন ও তোর নিজের বউ নয়, পরস্ত্রী।'

অরিন্দম এবার পরিহাসের সুরে জবাব দিল, 'শিগগির একদিন পরস্ত্রী হবে।'

'কিন্তু সেই একদিনটা তো আজ নয়।' বিনয় বোঝাতে চেষ্টা করল। ফের চাপা গলায় বলে, 'ওই লোকটা যখন জানে তোরা স্বামী-স্ত্রী তখন ওর সামনে দাম্পত্য প্রেমের একটু অভিনয় করলে সম্পর্কটা সহজ মনে হয়।'

অরিন্দম ঈষৎ ভারি গলায় বলল, 'কিন্তু হুট করে কি একটা মেয়ের সঙ্গে স্ত্রীর মতো কথাবার্তা বলা যায়? মানে কদিন আগেও তো মিলির সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না।'

'বুঝতে পেরেছি।' বিনয় একটা হতাশ ভঙ্গি করে জানাল, 'তোকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না।'

দুপুরে খাবার টেবিলে আয়োজনের বহর দেখে সকলের চোখ ছানাবড়া। তিন রকমের মাছ, মুরগির মাংস, ধবধবে সাদা সুগন্ধি ভাত। এ ছাড়া ভাজাভুজি, চাটনি, দই মিষ্টি ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইতিমধ্যে সেই লোকটি এসে হাজির। টেবিলের পাশে একটা চেয়ারে সে বসল। সকলকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'ভালো করে খাবেন কিন্তু। আর প্রিপারেশান কেমন হয়েছে বলবেন। তবে আমাদের এই বাবুর্চির হাতের রান্নার সকলেই সুখ্যাতি করে।'

এক টুকরো ইলিশ মাছ মুখে দিয়ে মিলি বলল, 'চমৎকার টেস্ট তো।'

লোকটি একগাল হেসে জবাব দিল, 'টেস্ট হবে না? রূপনারায়ণের টাটকা ইলিশ, সকালে নদীর ঘাটে কিনেছি।'

অরিন্দম বলল, 'নদীর ইলিশ, তাই বলুন। কলকাতায় আমরা এমন মাছ পাই না।'

মিলি তাকে সতর্ক করল, 'তাই বলে তুমি যেন আবার বেশি খেও না।'

'এ ভারি অন্যায় বৌদি।' বিনয় টিপ্পনী কাটল, 'টাটকা ইলিশ পেয়ে বেচারা যদি দু-চার টুকরো বেশি খায়, তাও আপনি বারণ করবেন?'

'বারণ না করে উপায় আছে?' মিলি উদ্বিগ্ন গৃহিণীর মতো জবাব দিল, 'জানেন, ওর ব্লাড-প্রেসার আর কোলেস্টোরেল দুই-ই বেশি।'

গেস্ট হাউসের সেই লোকটি বলল, 'তাহলে আর জোর করা ঠিক নয়। শরীর বুঝে আহার, কী বলুন ম্যাডাম?'

'না-না। তুমি মিছিমিছি ভয় পাচ্ছ। দু-এক টুকরো মাছ বেশি খেলে কিচ্ছু হবে না।' অরিন্দম আনাড়ির মতো কারও দিকে না তাকিয়ে কথাগুলো প্রায় শূন্যে নিক্ষেপ করল।

আহার শেষ হলে লোকটি জানাল, আপনারা এখন বিশ্রাম করুন। চারটে নাগাদ ফের আসছি। চা-টা খেয়ে রওনা হবেন।' এক মুহূর্ত থেকে বোধহয় তার ওপর ন্যস্ত দায়িত্বের কথা চিন্তা করে বলল, 'আপনাদের লঞ্চে তুলে দিলে আমার ছুটি।'

লোকটি চলে যাবার পর বিনয় অরিন্দমের কাছে এগিয়ে এল। ভুরু কুঁচকে চিন্তিতমুখে বলল, 'বেলা দেড়টা বাজে। মিলির সঙ্গে এবার বোঝাপড়া করতে হয়।'

'অবশ্য।' অরিন্দম সায় দিল। 'এর জন্যই যখন এতদূরে এলি তাছাড়া মিলি তোর কাছ থেকে একটা জবাব চায়।'

বিনয়ের মুখখানা ম্লান, ঈষৎ শুকনো দেখাল। অনেকক্ষণ পরে সে প্রায় স্বগতোক্তির মতো কথা কইল, 'আমার যা বলার আছে, তা বোধহয় মিলি অ্যাকসেপ্ট করবে না, বুঝলি?'

'হ্যাঁ। তুই আগেই সবজান্তা হয়ে বসে আছিস। এত নার্ভাস কেন বল দিকি? বি অপটিমিস্ট'। অরিন্দম আশাবাদীর মতো উজ্জ্বল চোখে তাকাল। পরে বলল, 'একটু ভালো করে ওকে বোঝাতে হবে। আমার ধারণা, মিলি তোকে ভালোবাসে।'

'না।' বিনয় স্পষ্ট জবাব দিল, 'তুই এখনও তাহলে ওকে চিনতে পারিস্‌নি। আসলে মিলি তার ছেলেকেই একমাত্র ভালোবাসে। শেষের কথাগুলি বিনয়ের মুখ থেকে অনুচ্চ কণ্ঠে প্রায় বিড়বিড় করে উচ্চারিত হল।

অরিন্দম বলল, 'আমি লাউঞ্জেই রেস্ট নিচ্ছি। তোরা ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে কথাবার্তা বল্‌।'

বিনয় চারপাশে সতর্ক নজর বুলিয়ে ঈষৎ সাবধানী গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'সেই বাবুর্চিটা কোথায়?'

'একটু আগে দেখলাম রান্নাঘরের দরজা বন্ধ করে কোথায় যেন চলে গেল।' অরিন্দম উত্তর দিল।

বিনয় বলল, 'তুই এখানেই থাকিস। এদিক-সেদিক যেন চলে যাস নে।'

'কেন, গেলে অসুবিধে কিসের?' অরিন্দম মুচকি হেসে বলল, 'দরজা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে মিলির সঙ্গে ভালো করে প্রেম করবার চান্স পাবি।'

'আজ্ঞে না। তার প্রয়োজন নেই।' বিনয় নীরস জবাব দিল। মুখখানা ঈষৎ বিকৃত করে বলল, 'তুমি ডুব দিয়ে কোথায় রইলে। আর তোমার বউকে নিয়ে আমি একটা ঘরে রয়েছি। তারপর ওই বাবুর্চী ব্যাটা টের পেলে খবরটা কেয়ার-টেকার মারফত তোমার সেই পূরণমলজীর কানে পৌঁছতে বেশি বিলম্ব হবে না।'

অরিন্দম লাউঞ্জে একটা সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে আধশোয়া অবস্থায় পড়ে রইল। চোখ বন্ধ করে একটু ঘুমোতে চেষ্টা করল। কিন্তু ঘুম এলো না। প্রায় আধঘণ্টা এভাবে কাটিয়ে সে বাগানে নামল। কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াল। তারপর ঘড়ির দিকে এক পলক তাকিয়ে বাগানের গেট খুলে রূপনারায়ণের পাড়ে এসে দাঁড়াল। নদীতে সেই এক দৃশ্য। ওপাশে বাড়িঘর, গাছপালা। কোণাকুণি তাকালে কোলাঘাট শহরের খানিকটা অংশ চোখে পড়ে।

নদীর ধারে অরিন্দম উদ্দেশ্যহীনভাবে বেড়াচ্ছিল। একবার সামনে খানিকটা এগিয়ে গেল। আবার পিছন ফিরে উল্টোদিকে হাঁটতে শুরু করল। এমনি এলোমেলো যেতে যেতে হঠাৎ তার ইন্দ্রাণীর কথা মনে হলো। ইন্দ্রাণী অরিন্দমের স্ত্রী। এই নির্জন নদীতীরে, মুক্ত প্রকৃতির মাঝখানে দাঁড়িয়ে প্রয়াত পত্নীর জন্য অকস্মাৎ সে বেদনা অনুভব করল। আহা, বেচারা! জীবনে একটা মস্ত ভুল করেছিল। আর সেই ভুলের মাশুল দিতে তাকে সুইসাইড করতে হয়েছে। অবশ্য হীরকের সঙ্গে ঘর ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার পর স্ত্রীর জন্য তার মনে বিন্দুমাত্র সহানুভূতি ছিল না। যাওয়ার আগে ইন্দ্রাণী চিঠিতে পরিষ্কার লিখে গিয়েছিল, বিয়ের আগেই হীরককে সে ভালোবাসত এবং তা সত্ত্বেও অরিন্দমের সঙ্গে বিয়েতে কেন যে সে রাজি হয়েছিল তার কারণ ইন্দ্রাণী খুঁজে পায়নি। এমন চিঠির পর নিশ্চয় কোনো স্বামীর মনে স্ত্রীর প্রতি প্রসন্ন মনোভাব সৃষ্ট হতে পারে না। কিন্তু আশ্চর্য! ইন্দ্রাণীর মৃত্যু-সংবাদ শোনার পর তার মনের সেই কঠিন ভাবটা কখন যে অন্তর্হিত হয়েছে তা সে নিজেই বুঝতে পারে না। কিন্তু আশ্চর্য! বরং প্রবঞ্চিতা স্ত্রীর জন্য এক গভীর মমতা ধীরে ধীরে তার মনকে পরিপূর্ণ করল। হীরক তাকে সম্পূর্ণ ঠকিয়ে গোপনে বিদেশে পালিয়ে গেছে। এবং যাওয়ার আগে ইন্দ্রাণীকে এক দূরপনেয় কলঙ্কের গ্লানি মাখিয়ে দিয়েছে। এই কলঙ্কের হাত থেকে মুক্তির একটা

উপায় নিশ্চয় হতে পারত। কিন্তু ইন্দ্রাণী বোধহয় আর বেঁচে থাকার কোনো অর্থ খুঁজে পায়নি। এক অবাঞ্ছিত মাতৃত্বকে গোপনে নির্মূল করা কিংবা এক অবৈধ সন্তানের মা হয়ে বেঁচে থাকা, সম্ভবত দুটিই তার কাছে অসহনীয় মনে হয়েছিল।

মানুষ বোধহয় দুটি জগৎ নিয়ে বেঁচে থাকে। একটি বাস্তব জগৎ—যে জগতে সে চলে ফেরে। পুত্র-কন্যা-কলত্র নিয়ে বাস করে। আর একটি জগৎ তার কল্পনার সৃষ্টি। যে জগৎ সে একাকী রচনা করে। সেখানে প্রবেশের চাবিকাঠিটি একান্তই তার। সেই জগতে বিচরণে অধিকার কাউকে সে দেয় না, দিতে পারে না। অরিন্দম হঠাৎ সেই কল্পনার জগতের মধ্যে প্রবেশ করল। তার ভাবতে ইচ্ছে হল, ইন্দ্রাণী যদি অনুতপ্ত চিত্তে তার কাছে আশ্রয় চাইত? এক অবৈধ সন্তানের হাত ধরে তার সামনে এসে দাঁড়াত? তাহলে অরিন্দম কি তাকে স্ত্রী মর্যাদায় ফের নিজের কাছে টেনে নিতে পারত? কিংবা সেই সমাজ—অস্বীকৃত শিশু-সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে ইন্দ্রাণীকে তার সামনে থেকে দূর হয়ে যেতে বলত? কিন্তু আশ্চর্য! এই নদীতীরে দাঁড়িয়ে এসব কথা কেন তার মনে আসছে? আসলে কখন একসময় নিজের অজান্তে বিনয়ের সমস্যার সঙ্গে তার জীবনের একটা মিল সে আবিষ্কার করে বসে আছে। অরিন্দমের মনে হল বিনয়ের জীবনেও তো সেই একই জটিলতা। মিলির অবৈধ সন্তানকে সে কিছুতেই স্বীকার করে নিতে পারছে না। অথচ ওই ছেলেটাকে গ্রহণ করতে পারলেই দুজনের এই টানাপোড়েন কত সহজে মিটে যায়। আসলে মিলির ওই দুটো শর্তের একটাই উত্তর, তার অবৈধ সন্তানের সামাজিক স্বীকৃতি।

অরিন্দম হঠাৎ তাকিয়ে দেখল বিনয় বাগানের ভিতর একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখখানা ঠিক গম্ভীর নয়, কিন্তু ম্লান, নিরুৎসাহ। একটা দুঃসংবাদ শুনলে মানুষকে যেমন অবসন্ন দেখায়, বিনয়কে তেমনি ক্লান্ত মনে হল। আর বিলম্ব না করে রাস্তা পেরিয়ে সে তাড়াতাড়ি বাগানে ঢুকল। দ্রুতপায়ে হেঁটে বিনয়ের কাছে গিয়ে বলল, 'কী ব্যাপার? চুপচাপ দাঁড়িয়ে কেন?'

'এমনি', বিনয় আলগোছে জবাব দিল। জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, 'চল, এবার কলকাতা ফেরা যাক।'

সে কথার জবাব না দিয়ে অরিন্দম শুধোল, 'মিলির সঙ্গে তোর কথা হয়ে গেল?'

'হ্যাঁ।'

'কী বলল সে?'

'যা বলবে আশা করেছিলাম', বিনয় এক মুহূর্ত থেমে ধীরে ধীরে জানাল, 'মিলি তার শর্ত দুটো একটুও রদ-বদল করতে রাজি নয়।'

'তার মানে?'

'মানে অতি সহজ। প্রথম শর্ত যা ছিল তাই থাকবে। অর্থাৎ বিয়ের আগে

মিলির অতীত জীবনের সমস্ত কথা আমার মা-বাবাকে জানাতে হবে।'

'তারপর?'

'মিলির দ্বিতীয় শর্ত, বিয়ের পরে ওই ছেলে আমাদের সংসারে দুজনের কাছে থাকবে।'

'তুই ওকে বুঝিয়ে বলেছিলি?'

'যথেষ্ট।' বিনয় ঠোঁট উলটে ঈষৎ বিরক্তি প্রকাশ করল। বলল, 'আমার পক্ষে যতদূর সম্ভব তা ওকে বুঝিযেছি। আচ্ছা তুই বল্, মুখে আমরা যত বড়াই করি, কিন্তু ভাবী স্ত্রী আর একজনেব সন্তানের মা হয়েছিল, এমন একটা কথা মা-বাবা আত্মীয-স্বজনের কাছে কখনও ঢাক-ঢোল পিটিয়ে বলা যায়? তাও আবার বিয়ের আগে?'

বিনয় বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। অরিন্দম তার গায়ে হাত রেখে বলল 'চুপ, চুপ। একটু আস্তে, লোকে শুনতে পেলে?'

বিনয বাঁকা হেসে জবাব দিল, 'তাহলেই বোঝ্, এতেই তোর লোকলজ্জা। আর আমাকে এমন একটা সংবাদ মা-বাবা, দাদা-বৌদি, সকলের কাছে মুখ ফুটে বলতে হবে। কোনো ভদ্র পরিবার কি এমন একটা পরিস্থিতির সঙ্গে চট করে মানিয়ে নিতে পারে? হাজাব হোক, সমাজ বলে তো একটা বস্তু আছে। তাই মিলিকে বলেছিলাম তোমার শর্তটা এখন মুলতুবি থাক। ধীরে সুস্থে পরে এসব কথা জানালেই হবে। তখন কেউ কিছু বললেই বা কী যায আসে? বরং বিয়েটা এখন শান্তিতে হয়ে যাক। তারপর তো আমি ফরিদাবাদে চাকরি নিয়ে চলে যাচ্ছি। আর ওই ছেলেকে শিশু-আশ্রম থেকে এনে কোনো ভালো স্কুলে ভর্তি করে দেব। ছুটিছাটায় সে নিশ্চয় এসে তার মায়ের কাছে থাকবে।'

অরিন্দম জিজ্ঞাসা করল, 'মিলির এতে সায় নেই?'

'একটুও না। তার ইচ্ছে ছেলে কাছে থেকে মানুষ হোক।' বিনয় জবাব দিল, 'মিলির ধারণা ছেলে-মেয়ে মা-বাবার স্নেহ-মমতা না পেলে ঠিক সত্যিকারের মানুষ হতে পারে না।'

অরিন্দম শুধলো, 'মিলি কোথায়?'

'ঘরের মধ্যে, বোধহয় বিছানায শুয়ে আছে।'

'নিশ্চয় মন খারাপ, মানে বেশ মুষড়ে পড়েছে?'

'কী জানি', বিনয় বলল, 'মিলি খুব চাপা মেয়ে। চট করে ভাঙবে না। তুই ঘরের মধ্যে গেলে তোর সঙ্গে দিব্যি কথা বলবে। একটু আগে এত কাণ্ড হয়ে গেল, দেখে বুঝতেও পারবি না।'

দুজনেই কয়েক সেকেন্ড চুপ করে রইল, তারপব বিনয় বলল,—'আমি জানতাম মিলি তার দুটো শর্তের এক চুল হেরফের করতে চাইবে না। তেমন মেয়েই নয়,—একবার যা বলবে কিছুতেই তার নড়চড় হবে না।'

বন্ধুর এই বিফলতার বেদনা অরিন্দমকেও স্পর্শ করল। ভ্রূ কুঁচকে ঈষৎ দুঃখের সঙ্গে বলল, —'তাহলে, ওকে নিয়ে এতদূরে এলি কেন? মিছিমিছি—'

'একেবারে মিছিমিছি বলে উড়িয়ে দিতে পারি না।' বিনয় ম্লান হেসে জবাব দিল। কথার জের টেনে ফের জানাল,—'তোকে সেদিন বলেছিলাম, দিস উইল বি মাই লাস্ট জার্নি উইথ হার। এমন একটা দিন বোধহয় চিরকাল মনে থাকবে। ব্রাউনিঙের সেই কবিতাটা মনে আছে?—

'দি লাস্ট রাইড টুগেদার।'

একমুহূর্ত তার মুখের দিকে তাকাল বিনয়, তারপর প্রবহমান নদীর স্রোত, ওপারের ঝাপসা গাছপালা এবং অসীম নীলাকাশের শূন্যতার উদ্দেশে গাঢ়স্বরে আবৃত্তি করল—

I said—Then, dearest, since it's so,
Since now at length my fate I know,
Since nothing all my love avails,
Since all my life seemed meant for, fails,
Since this was written and needs must be-
My whole heart rises up to bless
Your name in pride and thankfulness!
Take back the hope you gave, I claim
Only a memory of the same,—

অরিন্দম তবু বলল,—'আমার মনে হয় মিলিকে তুই ঠিক বোঝাতে পারিস্‌নি। যদি বলিস্‌ তো আমি একবার চেষ্টা করে দেখি।'

'কোনো লাভ নেই।' হতাশ চিকিৎসকের মতো বিনয় কথা কটি উচ্চারণ করল। বলল,—'আসলে আমার দুজনেই একটা পয়েন্ট অফ নো রিটার্নে পৌঁছে গেছি। সেখান থেকে এক পা সরবার পথ নেই। সুতরাং দি চ্যাপটার ইজ ক্লোজড়,—বোঝাপড়া শেষ হয়ে গেছে।'

সাত

বিনয়কে বাগানে রেখে অরিন্দম এগিয়ে গেল। যাবার আগে একটা সিঙ্গাপুরী রঙ্গন ফুলের গুচ্ছ গাছ থেকে ছিঁড়ে নিল। লাউঞ্জ পেরিয়ে ধীরে ধীরে সে ভিতরে ঢুকল। ঘরের দরজা ভেজানো ছিল। তাই কপাটে ছোট্ট একটু টোকা দিয়ে তার উপস্থিতি জানাল। ভিতর থেকে মিলি বলল, 'আসুন, কোনো অসুবিধে নেই।'

অরিন্দম ঘরে পা দিয়ে দেখল আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মিলি চুল-টুল ঠিক করে নিচ্ছে। জামাকাপড় পরে রেডি...যাওয়ার জন্য তৈরি। আয়নায় তার প্রতিবিম্ব লক্ষ্য করে মিলি বলল, 'আমি তো প্রস্তুত। লঞ্চ কি এখুনি পাওয়া যাবে?'

ব্যাপারটা অরিন্দমের কাছে বোধগম্য হল, মিলি কিংবা বিনয় কেউ আর এই গেস্ট-হাউসে এক মুহূর্ত থাকতে রাজি নয়। দুজনেই কলকাতা ফিরে যেতে চায়। শেষ পর্যন্ত যখন উভয়ের এক নৌকাভে ওঠা হল না, তখন মিছিমিছি আর নির্জন নদীতীরে কালহরণ করে লাভ নেই।

ঘড়ির দিকে এক পলক তাকিয়ে অরিন্দম বলল, 'সাড়ে তিনটে বাজল। কিন্তু সেই কোয়ারটেকার লোকটা তো এখনও এল না। চা-টা না খাইয়ে আমাদের ছাড়তে রাজি হবে কি?'

তার হাতের পুষ্পস্তবকের দিকে তাকিয়ে মিলি বলল, 'চমৎকার ফুল। বাগান থেকে তুললেন?'

'হ্যাঁ অরিন্দম স্বীকার করল। পরক্ষণেই ফুলের গুচ্ছ তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'নিন, এগুলো আপনার জন্যে এনেছি।'

ভ্রূ কুঁচকে এক মুহূর্ত মিলি কী চিন্তা করল। বলল, 'দেখুন, আপনার বন্ধুর ধারণা আমাদের আজকের এই পাতানো সম্পর্কটা এখানকার লোক, মানে ওই কেয়ারটেকার ঠিক বিশ্বাস করেনি।'

'হ্যাঁ', বিনয় তাই বলছিল।

'এর কারণ তো বুঝতেই পারছেন। মানে আপনার ব্যবহার ঠিক স্বাভাবিক হয়নি।' মিলি আড়চোখে এক পলক তাকে নিরীক্ষণ করে জানাল, 'তাই বলছিলাম এই ফুলগুলো বরং ওই কেয়ার-টেকারের সামনে আমাকে দেবেন। তাহলে অন্তত ওর সন্দেহটা দানা বাঁধতে পারবে না।'

'বেশ, তাই হবে।' অরিন্দম ফুলগুলি নিজের কাছে রাখল। তার একবার ইচ্ছা

হল বিনয়ের কথা মিলিকে জিজ্ঞাসা করে। একটু আগে ঘরে বসে দুজনের একটা ব্যর্থ আলোচনা হয়েছে। আচ্ছা, অরিন্দম যদি জানতে চায়, ব্যাপারটা কি তাহলে এখানেই শেষ হয়ে গেল? বিনয় যখন খানিকটা মেনে নিয়েছে, তখন মিলিরও উচিত একটু এগিয়ে আসা। নইলে মিলি তার জিদে অটল অনড় হয়ে থাকবে আর বিনয় ওর কঠিন প্রস্তাব সম্পূর্ণ মেনে নিতে পারল না বলে দুজনের দীর্ঘ দু-বছরের পরিচয়ের এখানেই ইতি পড়বে?

কিন্তু মিলির মুখের দিকে তাকিয়ে অরিন্দম আশ্চর্য হল। ওকে দেখে কে বলবে অল্পক্ষণ আগে এখানেই একজোড়া নারী পুরুষের হৃদয়ঘটিত শেষ বোঝাপড়া বিয়োগান্ত পরিণতিতে সমাপ্ত হয়েছে। অরিন্দম আশা করেছিল, মিলির মুখ শুকনো, চোখে হয়তো জল দেখবে। কিন্তু তার পরিবর্তে মিলি এমন স্বচ্ছন্দ আর স্বাভাবিক, যেন এই নির্জন গেস্ট-হাউসে বেড়ানো শেষ হয়ে গেল বলেই এখন তাড়তাড়ি বাড়ি ফিরতে চাইছে।

হঠাৎ দরজার বাইরে কেয়ারটেকারের গলা শোনা যেতেই মিলি ব্যস্ত হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি বলল, 'যান, আপনি বরং ওর সঙ্গে কথা বলুন। একটু পরেই আমি যাচ্ছি।' ঈষৎ হেসে ফের তাকে সাবধান করল, 'ওর কাছে যেন আবার ভুল করে 'আপনি' বলে বসবেন না। তাহলে যা বোঝার, ও কিন্তু ঠিক বুঝে নেবে।'

বেলা চারটে বাজতেই ওরা বেরিয়ে পড়ল। এবার বিনয় সামনে অরিন্দম আর মিলি পিছনে। সকলের শেষে গেস্ট-হাউসের কেয়ারটেকারও চলেছে তাদের লঞ্চে তুলে দিতে। রূপনারায়ণের কূলে কূলে পথ। পিছনে গেস্ট-হাউসের বাগানে সিঙ্গাপুরী রঙ্গনের গাছটাকে সিঁদুরে রঙের লাল ফুলে বিজ্ঞাপনের মেয়ের মতো বিচিত্র লাগছে। একবার মুখ ফিরিয়ে মিলি সেদিকে তাকাতেই অরিন্দম হাতের ফুলগুলি তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এগুলো রাখো।'

মিষ্টি হেসে ফুলগুলি নিয়ে একটি ছোট্ট গুচ্ছ ভেঙে মিলি খোঁপায় পরল।

কেয়ারটেকার পিছন থেকে বলল, 'বাঃ! বিউটিফুল দেখাচ্ছে।'

বিনয় কোনো মন্তব্য করেনি। শুধু আড়চোখে একবার মিলির মুখের ওপর নজর বুলিয়ে নিল।

সকলে লঞ্চে উঠতেই কেয়ারটেকার বলল, 'আমি আর এই অবেলায় ওপারে গেলাম না।'

অরিন্দম জবাব দিল, 'না-না। মিছিমিছি আপনি কেন যাবেন? আমরা দিব্যি যেতে পারব।'

জেটিতে দাঁড়িয়ে কেয়ারটেকার মিলিকে বলল, 'আবার আসবেন ম্যাডাম। আর যদি কোন দোষ-ত্রুটি হয়ে থাকে তো নিজগুণে ক্ষমা করবেন।'

'ত্রুটি কোথায়?' মিলি উত্তর দিল। 'ছি-ছি! এমন কথা ভাবাও অন্যায়। আপনার

আতিথেয়তাই আমাদের বহুকাল মনে থাকবে।' মিষ্টি হেসে অরিন্দমকে বলল, 'ওগো, তুমি ওঁকে ধন্যবাদ দাও। সারাদিন আমাদের জন্য এত খাটলেন।'

'নিশ্চয়।' অরিন্দম প্রায় পুনরাবৃত্তি করল। 'অনেক ধন্যবাদ।' পূরণমলজিকে আপনার কথা বলব। সত্যি যথেষ্ট করেছেন।'

ভুস করে একটা শুশুক জলের ওপর ভেসে উঠে আবার ডুব দিল। কারও মুখে কথা নেই। মিলি চুপচাপ বসে। বিনয় একটা সিগারেট ধরিয়ে আপনমনে কিছু ভাবছে। আর অরিন্দম? সে আকাশ, নদীর জল এবং বিকেলের মুক্ত প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে পরিস্থিতিটা ভালো করে তলিয়ে দেখার চেষ্টা করতে লাগল।

গাড়ি ছাড়ল। চারপাশে এখনও অবশ্য অন্ধকার ছড়ায়নি। বিনয় আর মিলি গাড়ির পিছনের সিটে দুধারে বসে, অরিন্দম মধ্যিখানে। মাঝে মাঝে দুজনের সঙ্গে সে কথা বলার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কারও কাছ থেকেই তেমন সাড়া না পেয়ে চুপ করে গেল। অরিন্দম স্পষ্ট বুঝতে পারল, গেস্ট-হাউসের সেই ঘরে আজ দুপুরে যে আলোচনা নিষ্ফল হয়েছে তা বোধহয় আর কোনোদিন ফলবতী হবে না।

হাওড়া স্টেশনের কাছে পৌঁছতেই বিনয় হঠাৎ বলল, 'গাড়ি থামাতে বল, এখানেই নামব।'

'এখানে কী দরকার?' অরিন্দমের জিজ্ঞাসা।

'না, মানে শ্রীরামপুরে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজন ছিল। ভাবছি ওটা সেরে যাই।'

'এই রাত্তিরবেলা শ্রীরামপুরে যাবি?'

'রাত্তির কোথায়?' বিনয় হাসল। বলল, 'এই তো সবে সন্ধে। নটার আগেই ফিরে আসব।'

গাড়ি থেকে নেমে বিনয় উলটোদিকে মিলির সামনে এসে দাঁড়াল। অরিন্দম ভাবল এবার বোধহয় একটা মর্মস্পর্শী দৃশ্য তার চোখের সামনে ঘটবে। কিন্তু তেমন গুরুতর কিছু হল না। বিদায় নিতে গিয়ে বিনয়ের কণ্ঠস্বর ঈষৎ বিষণ্ন শোনাল। কেমন ধরা গলায় সে বলল,—'গুড নাইট। চললাম মিলি।'

চোখ তুলে এক পলক মিলি মানুষটাকে দেখে নিল। ভাবলেশহীন মুখে অনুচ্চ কণ্ঠে বলল, 'এসো। গুড নাইট।'

'আমাকে ভুল বুঝো না' বিনয় ফিসফাস করে বলল, 'চলি তাহলে, গুড-বাই।'

মিলি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রইল। বোধহয় সোজাসুজি বিনয়ের মুখের দিকে তাকাতে পারল না।

গাড়ি স্টার্ট নিতেই অরিন্দমের পক্ষে নিজেকে সংযত রাখা কঠিন হল। জানলা দিয়ে চুপচাপ বাইরে তাকিয়েছিল। অরিন্দম মৃদুকণ্ঠে বলল, 'একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি?'

'হ্যাঁ নিশ্চয়। স্বচ্ছন্দে।' মিলি ছোট্ট উত্তর দিল।

অরিন্দম বলল, 'আচ্ছা, বিনয়ের সঙ্গে একটা আপসে আসা কি কিছুতেই সম্ভব হল না?'

'আপনি তো সবই জানেন, তাহলে? মিলি যেন প্রশ্নটা তাকেই ফিরিয়ে দিল।

'জানি, সবই জানি', অরিন্দম স্বগতোক্তির মতো করেই বলল, 'আপনার ওই দুটো শর্তের কথা, তারপর বিনয় যা আপনাকে বলেছিল, কিছুই আমাকে গোপন করেনি।'

'তাহলে নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন কেন শেষ পর্যন্ত আমরা এক রেখায় এসে মিলতে পারলাম না।'

'না, বুঝতে পারিনি বলেই প্রশ্নটা আপনার কাছে রাখছি।' অরিন্দম এক মুহূর্ত থামল। মুখ নামিয়ে বলল, 'আমার মনে হয় প্রথম শর্তটা তুলে নিলেই ভালো করতেন। বিনয়ের পক্ষে ওটা রক্ষা করা খুবই শক্ত। আর ওই একটা কারণেই তো আপনাদের বিয়েটা ভেস্তে গেল।'

'কী বলছেন আপনি?' মিলি বড়ো বড়ো চোখ করে অরিন্দমের দিকে তাকাল। ওদের পরিবারের কাছে আমার অতীত জীবনের সমস্ত কথা গোপন রাখব? তাহলে একটা মস্ত অপরাধ হত না?'

'অপরাধ?'

'তাছাড়া কী বলুন? মিলি বিষণ্ণ হাসল। 'জীবনে আপনি বোধহয় কোনো অন্যায় কাজ করেননি। তাই একটা অপরাধীর কী মানসিক যন্ত্রণা তা কোনোদিন উপলব্ধি করতে পাবেন না।' মিলি চুপ করে গেল। কয়েক মুহূর্ত পরে নিজেকে শুরু করল, 'আমার অতীতের কথা বিনয় কী বলেছে জানি না। তবে স্বীকার করছি, একটা অন্ধ আকর্ষণে সেই লোকটার সঙ্গে আমি গোপনে মেলামেশা শুরু করি। বাড়ির কেউ তা জানত না। অবশ্য মা-বাবা ওকে চিনতেন। আর হ্যাঁ, দু-একবার কাজের অছিলায় যে বাড়িতেও এসেছে। কিন্তু মেয়ে যে ওই লোকটার সঙ্গে তলে তলে রীতিমতো প্রেম জমিয়ে ফেলেছে এ সংবাদ তাঁরা ঘুণাক্ষরেও পাননি। ইতিমধ্যে আমাদের সংসর্গ ঘটল। একাধিক বার ওর কাছে আত্মদান করেছি। তার বিষময় ফল কিছুদিনের মধ্যেই ধরা পড়ল। প্রথমে মা এবং পরে বাবাও জানলেন যে আমি অন্তঃসত্ত্বা, মা হতে চলেছি।'

অরিন্দম চুপ, কোনো কথা বলেনি। বাকিটুকু শোনার জন্য সাগ্রহে তাকাল।

মিলি বলল, 'আপনি নিশ্চয় শুনেছেন সেই লোকটা বদলি হয়ে দিল্লি চলে গিয়েছিল। অবশ্যই আমাকে না জানিয়ে। সে এক নিদারুণ মানসিক অবস্থা। তবু ওকে খুঁজে বের করে মেয়েকে তার হাতে সমর্পণ করবার জন্য বাবা শেষ চেষ্টা করতে দিল্লি ছুটলেন। তারপর বাবা যেদিন সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে ফিরে এলেন, সেদিন তাঁর মুখের দিকে মা এবং আমি কেউ তাকাতে পারিনি। উদাস স্থিরদৃষ্টি, মাথার

চুলগুলো ক'রাত্তিরেই সাদা। একটা হাসিখুশি সুস্থ মানুষ কত তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে যেতে পারে তা এই জানলাম। অথচ ওই মানুষটা কোনো অপরাধ করেননি। তবু আমার অন্যায়ের বোঝা ওঁকে ঘাড়ে পেতে নিতে হয়েছে। একটা ঢোঁক গিলে জিভটাকে ফের সচল করে মিলি বলল, 'সেই প্রথম বুঝতে পারলাম আত্মসুখের জন্য গোপনতার আশ্রয় নেওয়া কত বড়ো অপরাধ। আজ না হোক, একদিন সেই অন্যায় দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে আমাকেই আঘাত করবে। ধরুন আজ যদি আমরা অতীতের কথা গোপন করে বিনয়দের বাড়ির বউ হই, তাহলে হয়তো এখনই তাই নিয়ে দুশ্চিন্তার কারণ নেই। কিন্তু চিরকাল কি কোনো কথা গোপন থাকে? তারপর যেদিন সবাই আমার এই কলঙ্কের কাহিনি জানতে পারবে, বলুন, সেদিন কি ওরা আমাকে আর আগের মতো সম্মানের চোখে দেখবে?'

'কিন্তু বিনয় যে বলছিল তখন কেউ কিছু বললেই বা কী যায় আসে?'

'ওটা মুখের কথা। তাছাড়া দিনে দিনে ঘরবাড়ি যেমন পুরনো হয়, মনও তেমনি বদলায়।' মিলি হাসল, বলল, 'দুবছর বাদে এত বড়ো কথাটা আপনার বন্ধুর মুখ দিয়ে বেরোবে, তার কি কোনো নিশ্চয়তা আছে?'

বলার ঢঙে শুধু খোঁচা নয়, একটা যুক্তি রয়েছে। তার মুখের দিকে তাকিয়ে মিলি বলল, 'প্রথম শর্তের কথা ছেড়ে দিলেও আপনার বন্ধু কিন্তু আমার দ্বিতীয় শর্তটাও মেনে নিতে পারেনি।'

'তাই কি ঠিক?' অরিন্দম সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল। বলল, 'বিনয় তো আপনার ছেলেকে শিশু-আশ্রম থেকে এনে একটা ভালো স্কুলে ভর্তি করতে চেয়েছিল। এমন ছুটিছাটায় তার মায়ের কাছে এসে থাকবে, এ কথাও সে বলেছে।'

মিলি অপ্রসন্ন মুখে জবাব দিল, 'ওটা কিন্তু আমার দ্বিতীয় শর্তকে এড়িয়ে যাওয়ার কৌশল। আমি চেয়েছি বিয়ের পর ছেলে আমাদের সঙ্গে থাকবে। এতদিন বেচারা স্নেহ-মমতার ছিটেফোঁটা পায়নি। বরং এখন মায়ের কাছে মানুষ হলে তার মানসিক অপুষ্টি অনেকখানি দূর হবে। আর ভালো স্কুলে পড়ানোর কথা বলছেন? আচ্ছা, সেটা কি আমি নিজেই পারি না? যখন চাকরি করি তখন নিশ্চয় একটা ছেলেকে স্কুলের হস্টেলে রেখে পড়াতে পারব। তাহলে এর মধ্যে আপনার বন্ধুর এমন কী বদান্যতা দেখালেন? আসলে আমার ছেলেকে গ্রহণ করা দূরে থাক, তাকে একটা উচ্ছিষ্ট, অবৈধ সন্তান ছাড়া কোনোদিন অন্য কিছু সে ভাবতে পারবে না।'

অরিন্দম শুনল, কিন্তু কী জবাব দেবে ভেবে পেল না।

মিলি বলল, 'জানেন, ছেলেটাকে শিশু-আশ্রম দিয়ে আসার পর মা-বাবা দুজনেই কিন্তু আমার বিয়ে দিতে চাইলেন।'

'বিয়ে?' অরিন্দম অস্ফুটে শুধোল।

'হ্যাঁ। ওঁরা দুজনেই বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে ওই ছেলে একটা দুঃস্বপ্ন, ওকে

মন থেকে মুছে ফেলতে পারলেই নিষ্কৃতি। তাছাড়া আত্মীয় বন্ধু কেউ যখন ব্যাপারটা টের পায়নি, তখন একটা ভালো ছেলে দেখে তার হাতে আমাকে সম্প্রদান করতে বাধা কীসের? আর তাহলে তাঁরাও নিশ্চিন্ত হন। নইলে আমার নিরাপত্তা কোথায়? চিরকাল তো মা-বাবা আগলে রাখবে না। জীবনভোর একটা মেয়ে কি একলা কাটিয়ে যেতে পারে?'

'কিন্তু আপনার ছেলে?'

মিলি ম্লান হাসল। নিজের কলঙ্কিত জীবনের কথা এভাবে বলতে গিয়ে বোধহয় তার কষ্ট হচ্ছিল। বিষণ্ণ নয়নে অন্য দিকে তাকিয়ে ফের শুরু করল, 'বাবা বললেন, 'ও যেমন অনাথ-আশ্রমে মানুষ হচ্ছে হোক। তারপর যা হয় একটা হিল্লে ওরাই করে দেবে। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা চলবে না।' মুখখানা গম্ভীর করে মিলি বলল, 'কী বিচিত্র মানসিকতা একবার চিন্তা করে দেখুন। নিজের মেয়ের জন্য ওঁদের দুর্ভাবনার অন্ত নেই। অথচ আমার ছেলেটা শিশু-আশ্রমে মানুষ হবে। তাকে মন থেকে মুছে ফেলতে পারলেই ভালো। তার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখতে পারব না।'

অরিন্দম জিজ্ঞাসা করল, 'তারপর?'

মিলি আগের মতো ম্লান হেসে বলল, 'মাকে পরিষ্কার জানিয়ে দিলাম, ছেলেটাকে মন থেকে মুছে ফেলে আর একজনকে বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। মা চোখ পাকিয়ে বলল, তাহলে কী করবি? ওই অবৈধ সন্তানকে নিয়ে বাকি জীবন একঘরে হয়ে কাটাবি? মা বোধহয় একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। কাছে এসে দাঁত চিপে চাপা গলায় কথা কইল, পেটের কাঁটা পরিষ্কার হয়ে গেছে, ব্যস! আমরা যা বলছি তোর ভালোর জন্য। ওই ছেলেটা পাপ। আমি সেখানে থাকলে আঁতুড়ঘরেই ওকে নুন খাইয়ে মেরে ফেলতাম। আমি চিৎকার করে বললাম, মা! আমি যদি ওর মতো তোমার পেটে আসতাম তাহলে আমাকেও কি অমনিভাবে মেরে ফেলতে? মা এগিয়ে এসে ঠাস করে আমার গালে এক চড় কষিয়ে দিল। বলল, কালামুখী, তুই নিজে যা করেছিস্, আমাকেও তাই ভাবিস্ নাকি? জেনে রাখ্, হাজার প্রলোভনেও আমি কখনও তোর মতো বিপথে পা বাড়াতাম না।'

অরিন্দম মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছিল। অসহায়া এক নারীর বিচিত্র জীবনকাহিনি। সন্তানের জন্য কী গভীর ভালোবাসা! তা সে বৈধ কিংবা অবৈধ যাই হোক। দীর্ঘ দশ মাস দশ দিন তাকেই পরম স্নেহে জঠরে ধারণ করেছে। আর শুনতে শুনতে মিলির জন্য তার ভারি কষ্ট হল। বেচারি! অন্য কোনো মেয়ে হলে হয়তো মা-বাবার প্রস্তাবে রাজি হয়ে যেত। এতদিন ঘর-সংসারে পেতে দিব্যি স্বামী-সোহাগী হয়ে প্রজাপতির মতো উড়ে বেড়াত।

মিলি নিজেই বলল, 'একটা কথা ভেবে দেখুন। আপনার বন্ধুর কথার সঙ্গে

আমার মা-বাবার প্রস্তাবের তেমন অমিল নেই। ছেলেটাকে কেউ স্বীকার করতে রাজি নয়। আমার মা ওকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল। আর বাবার ইচ্ছে ছিল অনাথ-আশ্রমে মানুষ হয়ে ও নিজের পায়ে নিজেই দাঁড়াতে শিখুক। আপনার বন্ধু অবশ্য অতটা নির্দয় হতে পারেনি। কিন্তু তারও সেই একই কথা। শুধু ছেলেটা অনাথ-আশ্রমে মানুষ হবে না। তার জন্য একটা ভালো স্কুলে পড়াশুনোর ব্যবস্থা করে দেবে। কিন্তু মায়ের আদর, স্নেহ-ভালোবাসা এসব তার ভাগ্যে কোনোদিন জুটবে না। চিরকাল বঞ্চিত হয়ে থাকবে। অবশ্য ছুটিছাটায় ছেলেকে কাছে এনে রাখলে তার নাকি আপত্তি নেই। কিন্তু সেটাও তা মুখের কথা। সমাজে বাস করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত তাই যে বজায় থাকত, তার কি কোনো গ্যারান্টি ছিল?'

আশ্চর্য! মিলির বলার মধ্যে কোথায় যেন একটা অপ্রতিরোধ্য যুক্তি রয়েছে। তাই বন্ধুর হয়ে অরিন্দম কোনো কথা বলতে পারল না।

আগেবতাড়িতা নয়, বেশ যুক্তিসিদ্ধ ভঙ্গিতে মিলি তার বক্তব্য রাখছিল। এবার মিষ্টি হেসে বলল, 'একটা কথা চিন্তা করে দেখেছেন? ছেলেটাকে যদি ত্যাগ করি, ওকে মন থেকে মুছে ফেলি তাহলে ওই লোকটার সঙ্গে আমার কী তফাত রইল? আমার সর্বনাশ করে কাপুরুষের মতো দিল্লি পালিয়ে গিয়ে সে নিজেকে বাঁচিয়েছে। আর আমি? দেহঘটিত কারণে বন্দি হয়ে গেলাম বলেই ঠিক তখুনি এই অবস্থাকে অস্বীকার করতে পারিনি। নেহাত ডাক্তারের অস্ত্রোপচারের আর সময় ছিল না বলেই ছেলেটাকে জন্ম দিতে হল। তারপর মাত্র ছ-মাস ওকে কাছে পেয়েছি। এদিকে আশ্রমে মা-বাবার ঘনঘন চিঠি যেতে লাগল। তাই একদিন গুরুজির পরামর্শ মতো ওকে শিশু-আশ্রমে পাঠিয়ে দিয়ে কলকাতায় চলে এলাম। সে কী কষ্ট, পুরুষ মানুষ হয়ে আপনি তা বুঝবেন না। তারপর কলকাতার এসে কলঙ্কের কথা সম্পূর্ণ গোপন করে দিব্যি ভালো মানুষটি সেজে সকলের সঙ্গে মিশে গেলাম। কেউ টের পায়নি। আর এখন যদি ওকে শিশু-আশ্রমের খাতায় চিরকালের মতো সঁপে দিয়ে আত্মসুখের জন্য বিয়ে করে সংসারী হই, তাহলে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হল কোথায় বলুন?' কেমন অদ্ভুত হেসে মিলি মন্তব্য করল, 'জন্মদাতা আর জননীর মধ্যে কোনো পার্থক্যই থাকল না।'

অরিন্দম শুধোল, 'কিন্তু এখন কী করবেন? বিনয় বলছিল, রবিবারে আপনি গুরুজির কাছে যাবেন। তারপর শিশু-আশ্রমে গিয়ে ওই ছেলের সত্যিকার পরিচয় সকলকে জানবেন।'

'হ্যাঁ, তাই ঠিক করেছি।' মিলি উত্তর দিল।

'কিন্তু বিনয় তো আপনার শর্ত দুটো মেনে নেয়নি। অথচ যাওয়ার আগে তার কাছ থেকে একটা জবাব আশা করেছিলেন। তাহলে এই অবস্থায় শিশু-আশ্রমে গিয়ে নিজেকে ওই ছেলের মা বলে পরিচয় দেওয়া কি উচিত হবে?'

'আপনি কি ভেবেছেন যে আপনার বন্ধুর জবাবের ওপর ভরসা করেই আমি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম?' মিলি তার মুখের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে চোখ নামিয়ে নিল। কযেক মূহূর্ত পরে বলল, 'তবে মনে আশা ছিল, হয়তো আপনার বন্ধু সমস্ত কিছু জেনে আমাকে এই সঙ্কট থেকে উদ্ধার করবে। কিন্তু তা যখন হল না, তখন যা করবার আমাকেই করতে হবে।'

অরিন্দম তবু বলল, 'অন্তত আর কিছুদিন তো অপেক্ষা করতে পারতেন।'

'না।' মিলি বেশ জোর দিয়েই বলল, 'নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে আজ আমি সম্পূর্ণ পরাস্ত। জানেন, আমার সেই ছেলের কী অবস্থা? শিশু-আশ্রমে যে মেয়েটি ওকে দেখাশুনো করে, তার কাছ থেকে গত সপ্তাহে একটা চিঠি পেয়েছি। লিখেছে, খোকা নাকি দিন কুড়ি-পঁচিশ আগে একটা শক্ত অসুখে পড়েছিল। হয়তো টাইফয়েড কিংবা এমনি কোনো কঠিন রোগ। অনেকদিন ভুগে অবশ্য সেরে উঠেছে। তবে এখন বড্ড রোগা, অসুখের পর শরীরে আর জোর নেই। সারাক্ষণ বিছানায় শুয়ে থাকে, আর'—কী যেন বলতে গিয়ে মিলি চুপ করে গেল।

'আর কী?' অরিন্দম সাগ্রহে তাকাল।

মিলি হঠাৎ ভিজে গলায় বলল, 'অসুখের সময় জ্বরের ঘোরে খোকা মা-মা বলে ডেকে উঠত। বলুন, এর পরেও কি আমি চুপ করে থাকব? আত্মসুখের জন্য ওর কথা ভুলে গিয়ে নিজেকে আলাদা করে আপনার বন্ধুর প্রস্তাবে রাজি হতে পারি?'

অরিন্দম নির্বাক। কোনো কথা বলতে পারল না।

নিজেকে সামলে নিয়ে মিলি এবার বলল, 'ছেলেটার কাছে আমি অপরাধী। চার-পাঁচ বছর হল ওকে স্নেহ-ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত করে অনাথ পরিচয় দিয়ে একটা শিশু-আশ্রমে ফেলে রেখেছি। কিন্তু জন্মের জন্য সত্যি ওর কোনো দোষ নেই। এই পৃথিবীতে আমরা ওকে এনেছি। যদি কোনো অপরাধ থাকে তা ওর জন্মদাতা এবং জননীর।'

অরিন্দম সমস্ত কিছু তলিয়ে চিন্তা করছিল। তার হঠাৎ স্ত্রীর কথা মনে হল। শেষ মুহূর্তে ইন্দ্রাণী বোধহয় নিজেকে অপরাধী ভেবেছিল। তাই স্লিপিং পিল খেয়ে সুসাইড করল। বেঁচে থাকার কোনে অবলম্বন খুঁজে পেলে নিশ্চয় আত্মহত্যা করত না।

এসপ্ল্যানেড এসে গেল। জিরাফের মতো মনুমেন্ট গলা বাড়িয়ে রয়েছে। পশ্চিমের আলো-ঝলমল চৌরঙ্গি। কী একটা প্রসাধনদ্রব্যের বিজ্ঞাপন হোর্ডিঙে। বিজলি বাতির কৌশলে সেটা জ্বলছে নিবছে। পথের দুপাশে মার্কারি ল্যাম্পের স্নিগ্ধ আলো। রেডিও স্টেশনকে ডান দিকে রেখে গাড়ি রাজভবনের পাশ দিয়ে কার্জন পার্কের কাছে এল। কাছেই কয়েকটা মিনিবাস দাঁড়িয়ে। সেদিকে তাকিয়ে মিলি বলল, 'গাড়ি রাখুন। এখানেই নামব।'

গাড়ি থেকে নামার আগে ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে আয়না চিরুনি বের করে চুল-টুল সে ঠিক করে নেবে ভাবল। দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব দেখেই মিলি হঠাৎ চমকে উঠে বলল, 'কী সর্বনাশ! সিঁথির সিঁদুরটা তুলতে ভুলেই গেছি। এইভাবে বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলে যা কেলেঙ্কারি হত।'

অরিন্দম একদৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে কী চিন্তা করছিল। মিলি কেমন অদ্ভুত হেসে বলল, 'আমার এই কপাল। দেখুন না সকালবেলা সিঁথিতে সিঁদুর পরে কেমন বউ সাজলাম। আবার সন্ধে না হতেই ডির্ভোস হয়ে গেল।

'ডিভোর্স?' অস্ফুটে কথাটা বলতে গিয়ে অরিন্দমের ঈষৎ ভাবান্তর হল।

মিলি জিজ্ঞাসা করল, 'অত কী চিন্তা করছেন?'

কিন্তু ততক্ষণে অরিন্দমের সব ভাবনা শেষ। অনেক পথ-ঘাট, মাঠ-প্রান্তর, খাল-বিল, নালা-নদী পেরিয়ে সে এবার ঠিক খেয়াঘাটে পৌঁছেছে। পড়ন্ত বেলায় রূপনারায়ণ পেরোবার পর থেকে অরিন্দম হৃদয়কে নানা প্রশ্নে খুঁচিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলেছিল। কিন্তু এখন তার সব প্রশ্নের জবাব শুধু একটাই,—এক বিন্দুতে এসে মিলিত হয়েছে।

মিলি সাগ্রহে তার মুখের দিকে তাকিয়ে।

তখন অরিন্দম ভাবছিল, এমন একটি মুহূর্তের কথা সে কি আজ সকালেও চিন্তা করতে পারত? মনের সব ভাযা হঠাৎ যেন এক বাঙ্ময় শতদলে বিকশিত হয়ে উঠছে।

নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়ে সে পরিষ্কার কথা কইল, 'যদি বলি ডিভোর্স হয়নি, সিঁথির সিঁদুর অমনি থাকবে?'

'তার মানে?' মিলি ভ্রূ কোঁচকাল।

অরিন্দম বলল, 'অনেক ভেবে দেখলাম তোমার এই শর্ত দুটো আমি মেনে নিতে পারি।'

'কী পাগলের মতো বকছেন?' মিলি তাকে নিরস্ত করতে চাইল।

অরিন্দম ঈষৎ হাসল। বলল, 'ঈশ্বর মিলিয়ে দিয়েছেন তাই, নইলে বলতাম তোমার মতো একটি মেয়ের জন্য আরও বহুকাল আমি অপেক্ষা করে থাকতে পারি মিলি।'

'কী যা-তা বলছেন। বাড়িতে আপনার স্ত্রী রয়েছেন না?'

মিলি ভ্রূ কোঁচকাল,—মুচকি হেসে মন্তব্য করল, 'তিনি রাগ করে বাপের বাড়ি গিয়েছেন বলেই এইসব আজেবাজে চিন্তা আপনার মাথায় আসছে?'

অরিন্দম বিষণ্ণ সুরে জবাব দিল, 'তুমি বোধহয় জানো না মিলি, আমার স্ত্রী বেঁচে নেই।'

'বেঁচে নেই?'

'না, দু-রাত্তির আগে বাপের বাড়িতে স্লিপিং পিল খেয়ে সে আত্মহত্যা করেছে।'

'আত্মহত্যা?'

'হ্যাঁ। তুমি নিশ্চয় এর কারণ জানতে চাইবে?' মিলির মুখের ওপর দ্রুত নজর বুলিয়ে নিয়ে অরিন্দম ধীরে ধীরে বলল, 'কয়েক মাস আগে ইন্দ্রাণী মানে আমার স্ত্রী তার পরিচিত এক ভদ্রলোকের সঙ্গে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল।'

'ভদ্রলোকটি কে?' মিলি প্রশ্ন করল।

'আগে চিনতাম না। কোনোদিন নামও শুনিনি। তবে পেশা ডাক্তারি। ইউনাইটেড স্টেটসে থাকেন। ছুটি কাটাতে নাকি এদেশে আসা। যাই হোক, কিছুদিন পর দুজনে আবার কলকাতায় ফিরে এল। মিলি তার বাপের বাড়িতে উঠল। এই গোঁজামিলের অঙ্কটাকে মিলিয়ে দিতে ইন্দ্রাণীর বাবা একদিন তাঁর অফিসে ডেকে পাঠালেন। বললেন, আমি রাজি থাকলে ছ-মাসের মধ্যে ডিভোর্সের ডিক্রি হতে পারে। আর তাহলেই সমস্যার সমাধান। ওরা দুজনে বিয়ে করে স্টেটসে চলে যাবে। ডিভোর্সের মামলা রুজু হল। কিন্তু ডিক্রি পাবার আগেই ধরা পড়ল ইন্দ্রাণী গর্ভবতী। মুশকিল হল, ইতিমধ্যে সেই ভদ্রলোক আবার কাউকে কিছুই না জানিয়ে স্টেটসে ফিরে গেছেন।'

'কিন্তু এ তো বিশ্বাসঘাতকতা, ট্রেচারি।' মিলি তার স্ত্রীর পক্ষে সাওয়াল করল।

অরিন্দম দুঃখ করে বলল, 'এসব ঘটনার এ রকম পরিণতি হয়। তবে ইন্দ্রাণীর বাবা চেষ্টা করেছিলেন, কোনো নার্সিংহোমে ভর্তি করে একটা ছোটখাট অপারেশান। কিন্তু ইন্দ্রাণীকে তো চিনি। ভীষণ জেদি, ভাঙবে তবু মচকাবে না। বোধহয় একটা অবৈধ সন্তানের মা হয়েছে বলেই অভিমানে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেল।'

মিলি চুপ করে শুনছিল। একটি কথাও আর বলেনি।

অরিন্দম কয়েক সেকেন্ড তার মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে বলল, 'আমি জানতাম ওই শর্ত দুটো বিনয় মেনে নিতে পারবে না। শুধু এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করবে। ওর সঙ্গে নানা কথায় আমার তাই মনে হয়েছে। আসলে ভুল করে একবার বিপথে পা বাড়িয়ে একটা মেয়ে যে কী সঙ্কটে পড়ে, বিনয় তা বুঝবে না। আর অবৈধ সংসর্গের ফলে দেহঘটিত পরিবর্তন হলে সেই মেয়েটির যে কী অসহায় অবস্থা হয় তা উপলব্ধি করার মতো ওর অভিজ্ঞতা হয়নি।' এক মুহূর্ত থেমে কী যেন চিন্তা করল সে। তারপর বলল, 'আমার কী মনে হয় জানো মিলি! ইন্দ্রাণী বোধহয় বাঁচতে চেয়েছিল। শুধু এই কলঙ্কের পর পৃথিবীতে ওর ঠাঁই হবে না ভেবেই সমস্ত লজ্জা, দুঃখ মনের মধ্যে রেখেই স্লিপিং পিল খেয়ে সুইসাইড করল।'

মিলি বলল, 'তুমি ভালো করে ভেবে দেখেছ অরিন্দম? আমার অতীত, আমার সন্তান, আর ওই শর্ত দুটো—সমস্ত কিছু মেনে নিয়ে আমাকে গ্রহণ করতে পারবে?'

অরিন্দম বলল, 'বিয়ের সময় মন্ত্র পড়তে হয়, যদিদং হৃদয়ং তব, তদস্তু হৃদয়ং মম। আমি এই মুহূর্তে তার চেয়েও অনেক বড়ো কথা শপথ করে বলছি। তারপর

ধীরে ধীরে মন্ত্র পড়ার মতো ভঙ্গিতে পরম নিষ্ঠার সঙ্গে সে উচ্চারণ করল, 'তোমার হৃদয় যেখানে, আমার হৃদয়ও সেইখানে। তোমার অন্তর, আমারও অন্তর। তোমার সন্তান, আমাদের সন্তান।'

মিলি বড়ো বড়ো চোখ মেলে তাকিয়ে। তার যেন বিশ্বাস হয় না। এতদিন প্রতীক্ষার পর সত্যের মতো সুন্দর, বিভাবসুর মতো উজ্জ্বল, ধর্মের মতো স্থির, শ্রীকৃষ্ণের মতো প্রেমময় এ কোন পুরুষের সে দেখা পেয়েছে?

আর অরিন্দম? তার অন্তরে এক আনন্দ, শিহরণ। মিষ্টি সুরের রাগিণীর মতো বিচিত্র অনুভূতি। কেবল মনে হচ্ছিল, মোহানার দিকে রূপনারায়ণের ধোঁয়া ধোঁয়া রেখা এখন স্পষ্ট, পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।